রামপ্রসাদ : জীবনী ও রচনাসমগ্র

জীবনী রচনা ও সম্পাদনা
ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

গ্রন্থমেলা ॥ এ/১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

॥ প্রকাশক ॥
শ্রীধর্মদাস সামন্ত
গ্রন্থমেলা
এ।১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২
প্রথম প্রকাশ—জুলাই, ১৯৫৭

॥ মুদ্রণ ॥
'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ' অংশ এ্যানামস্ প্রিণ্টার্সের পক্ষে শ্রী বি. নন্দী
১১৫, অরবিন্দ সরণী, কলি-৬

অবশিষ্ট অংশ প্রসাদ প্রিণ্টার্সের পক্ষে শ্রীমধু ঘোষ
৪১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলি-৬

মাতামহ শক্তিসাধক

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ' সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনী ও রচনার সামগ্রিক আলোচনা। জীবনী রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থে অবলম্বিত পদ্ধতিটি নতুন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রদত্ত বিবরণ অবলম্বন ক'রে কিছু কিছু দলিলপত্র ও সাক্ষিসাবুদ ঘেঁটে, কিছুটা বা অলৌকিকতায় আস্থা স্থাপন করে গতানুগতিক জীবনীরচনার যে ধারা প্রচলিত আছে, এ গ্রন্থে সে ধারাটি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয়েছে।

এই প্রচলিত ধারার প্রধান অবলম্বন জনশ্রুতি। জনশ্রুতির খেই ধরে সমসাময়িক ঘটনা ও ব্যক্তির সঙ্গে কবির জীবনকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টায় যিনি যতটা সার্থক হয়েছেন, তাঁর রচনাই তত সুনাম অর্জন করেছে। এ প্রথায় সুনাম অর্জনের চেষ্টা বর্তমান গ্রন্থে করা হয় নি।

এ প্রথায় যাঁরা বিশ্বাসী নন অর্থাৎ যাঁরা রামপ্রসাদের প্রকৃত জীবনী উদ্ধারে আগ্রহী, তাঁদের অধিকাংশই এ বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসর হন নি। তথ্য প্রমাণের অভাব বোধ ক'রে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ পরিশ্রমসাধ্য তৃতীয় কোন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নি। বর্তমান গ্রন্থে তৃতীয় পথ ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, পরিশ্রমও করতে হয়েছে বিস্তর। ফল কিছু মিলেছে কি না সে বিচারের ভার সুধী পাঠকের ওপর।

বর্তমান গ্রন্থে জীবনী রচনা অপেক্ষা জীবনী আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে বললে আরও পরিষ্কার করে বিষয়টি বলা হয়। এই আবিষ্কারের জন্য অবলম্বিত বিষয় দুটি হল—(১) দেশের সাধারণ ইতিহাস, (২) রামপ্রসাদ রচনা।

শুধু সমসাময়িক কাহিনীর মধ্যে নিবদ্ধ না থেকে দেশের দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রামপ্রসাদ জীবনীকে স্থাপন করা হয়েছে। হিউয়েন সিয়াঙের সময় থেকে আরম্ভ করে যে সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের ধারা বঙ্গভূমিতে প্রবহমান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবের মধ্য দিয়ে নানা ভাঙ্গা গড়ায় যে প্রবাহ সর্বদা বাঙালি মননে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জোয়ার ভাঁটার সৃষ্টি করে এসেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে তা শেষবারের মত মোড় ফিরেছে সম্পূর্ণ অভিনব ভাবে। সেই অভিনব ধারারই সৃষ্টিধর্মী গতিশীলতার প্রকাশ ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই নবচেতনার প্রথম রূপকার কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। জীর্ণক্ষত পুরাতন ধারা লুপ্ত হয়ে কিভাবে নতুন ধারাস্নান ঘটলো রামপ্রসাদ জীবনী আবিষ্কারে প্রধানতঃ এই ইতিহাসটি তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং কোন অধ্যাত্ম ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষের অলৌকিক মহিমার কীর্তন চিরাচরিত পদ্ধতিতে এ গ্রন্থে করা হয়নি।

ইতিহাসের ফলাফল দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রধানভাবে জীবনীরচনায় অবলম্বন করতে হয়েছে কবির রচনাগুলিকে। রামপ্রসাদ রচনার প্রেরণা, রচনার কালক্রম,

রচনায় কবির অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে হয়েছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে রামপ্রসাদের জীবন ও তাঁর সমসাময়িক কাল কি ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে গ্রন্থপাঠে তা অবগত হওয়া যাবে।

সঙ্গীত রচয়িতা ও সাধকরূপেই রামপ্রসাদ সাধারণ জনসমক্ষে পরিচিত। তিনি যে 'কালীকীর্তনে'র রচয়িতা ছিলেন, তার খবর অনেকে রাখেন না। আবার তিনি যে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন, এ সংবাদটি অনেকের কাছে যেমন অভিনব, তেমনি বিস্ময়কর। এই বিস্ময়ের সূত্রধরেই সম্ভবতঃ 'পদাবলী'র রামপ্রসাদ ও 'বিদ্যাসুন্দরে'র রামপ্রসাদকে বিভিন্ন জন ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উভয় রামপ্রসাদই যে এক এবং 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থেই যে রামপ্রসাদ জীবনীর অধিকাংশ উপকরণ রয়েছে, বর্তমান গ্রন্থে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

সাধক রামপ্রসাদের পরিচয় এমন স্ুদূরপ্রসারী এবং ভক্ত ও বিশ্বাসীর মনে তা এমনই অলোকসামান্য মহিমায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে তাঁর ঈশ্বরস্পৃষ্ট সঙ্গীতগুলির সাধারণ সমালোচনার নিরিখে বিচারের কিছুটা অসুবিধা আছেই। খুব সতর্কতার সঙ্গে এই স্পর্শকাতর বিষয়টির অবতারণা করতে হয়েছে। অথচ এই সঙ্গীত রচনার পর্য্যায়বিভাগের দ্বারাই ব্যক্তি রামপ্রসাদের জীবনটিকে তুলে ধরা খুব সহজ।
রামপ্রসাদ যখন অভাবের কথা, ব্যক্তিগত নানাবিধ দুর্দশা বা সামাজিক বৈষম্যের কথা বলে মায়ের কাছে অভিযোগ করেন তখন তিনি সাধক হলেও কবি। রামপ্রসাদের প্রথম জীবনের পদ বলে এগুলি গৃহীত হতে পারে।

রামপ্রসাদের পদে তাঁর আধ্যাত্মিক মননের ক্রমোন্নতির ছাপ সুস্পষ্ট। পদে অধ্যাত্মসচেতনতা যতই পরিস্ফুট হয়েছে, পার্থিব সুখসুবিধার উল্লেখ পদ থেকে ততই অপসৃত হয়েছে। মায়ের অলৌকিক রূপের নানা পরিকল্পনায় কবি তখন বিভোর।
এর পরে আর এক জাতীয় অতৃপ্তি ও গ্লানির প্রকাশ ঘটতে আরম্ভ করে। কবির কণ্ঠে মাকে না পাওয়ার জন্য বেদনা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত। সাধক রামপ্রসাদ এই অতৃপ্তির মধ্যে দিয়ে সাধনার অনেক উচ্চ সোপানে আরূঢ়। কিন্তু সিদ্ধি তখন হয়নি। তখন পর্যন্ত প্রাপ্তির জন্য আকুলতা, অপ্রাপ্তির জন্য ক্রন্দন। সাধক ও কবির মেশা-মেশি রূপ তখন।
একেবারে শেষ স্তরের পদে সাধকরূপই সুস্পষ্ট। এখানে শুধু মায়েরই জয়গান। মায়ের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা। মায়ের রূপ উদার সমন্বয়বাদী। কিভাবে সার্থকরূপে সহজে মাকে পাওয়া যায়, তারই নির্দেশ পদগুলিতে।

এই পদগুলি পড়েই অনেকে নির্দ্বিধায় রামপ্রসাদকে একেশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, পৌত্তলিকতা বিরোধী প্রভৃতি বলে ফেলেছেন। এ প্রসঙ্গে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্যের "তন্ত্র[illegible] ([illegible] সম্পাদে পুনঃপ্রকাশিত) গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের "বাহ্যপূজা" পরিচ্ছেদটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রামপ্রসাদের পদে 'তারা আমার নিরাকারা', 'যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার', 'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি' জাতীয় কথাগুলি পূর্বোক্ত মন্তব্যের কারণ। সাধক শিবচন্দ্র

এই মন্তব্যকারীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—(১) 'বলিহারি কলিদূতের সিদ্ধান্ত!' (পৃ ৪৩৭) (২) 'তিনি সাকার ব্রহ্ম মানিতেন কি না, সাকার উপাসনা করিতেন কি না, মৃত্যুর পূর্ব রাত্রিতেও পূজা করিয়া মৃত্যুকালেও মায়ের মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া সিদ্ধ সাধক মহাত্মা তাহার জলন্ত প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। জীবনে ত গানে গানে প্রাণে প্রাণে মূর্তিমতী মায়ের নৃত্য! ইহার পরেও, রামপ্রসাদের সাকার উপাসনা ছিল না—ইহা যিনি বলিতে পারেন, রামপ্রসাদের আত্মা ছিল না, এ কথাও তাঁহার মুখেই শোভা পায়।' (পৃ ৪৫৬)

'মন! তোমার এই ভ্রম গেল না'—পদে মৃন্ময়ী মূর্তিনির্মাণের অসারতার কথা আছে। এই পদটি সম্বন্ধে সাধক শিবচন্দ্রের অভিমত হল—'উল্লিখিত গানটি যে রামপ্রসাদের অতি অপক্কাবস্থার আমরা ক্রমে তাহার পরিচয় দিতেছি। এখন প্রথমতঃ এইটুকু বুঝিবার কথা যে, যে সময়ে রামপ্রসাদের এই গান সে সময়ে তিনি জ্ঞানরাজ্যের প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যস্তরে অবতীর্ণ, শেষ স্তরে অপ্রবিষ্ট এবং সাধনা রাজ্যে নব প্রবিষ্ট মাত্র, তাই ভক্তিতত্ত্বনিরপেক্ষ কেবল জ্ঞানের সহিত সাধনাকে সম্মিলিত করিতে গিয়াই উপক্রম উপসংহার স্থির রাখিতে পারেন নাই।' (পৃ ৪৪৪)

বর্তমান গ্রন্থে রামপ্রসাদের পদের বয়ঃক্রম ও সাধনাক্রম অনুসারে স্তরভেদের কথা বলেছি এবং তাঁর সিদ্ধ স্বরূপের পরিচায়ক বলে যে পদগুলির বিবরণ দিয়েছি, সেগুলিতেই রামপ্রসাদের দেবতা ও পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে মতগুলি নিহিত বলে যাঁরা মনে করেন আমরা তাঁদের সঙ্গেও দ্বিমত নই। শেষোক্ত দলের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল, আমরা মতগুলি ব্যক্তি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের মত বলে মনে করি না, আমরা মনে করি এ মত সাধক রামপ্রসাদের সাধনার দ্বারা উপলব্ধ শাশ্বত সত্যবাণী। অনেক সাধনার স্তর অতিক্রম করে সিদ্ধাবস্থায় সাধকের এ সংজ্ঞালাভ হয়।

তবে রামপ্রসাদ উপলব্ধ 'সংজ্ঞা'র প্রভাবে যদি সাধারণ মানুষের বিচার বুদ্ধি প্রভাবিত হয়, তাহলে তাতে দোষের কিছু দেখি না। সাধনার অন্তে প্রাপ্ত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের বলে উচ্চারিত মতগুলিই সর্বজনগ্রাহ্য চিরন্তন মত এবং সাধকেরও প্রকৃত বাণী।

রামপ্রসাদ অনেক সাধনায় যা জেনেছিলেন, বিনা আয়াসে সেইটুকু জেনে যদি কেউ তৃপ্তিলাভ করতে পারেন, তাতে রামপ্রসাদের সাধনারই সার্থকতা প্রতিপাদিত হবে। রামপ্রসাদের পদে অনাড়ম্বর সারল্য ও আন্তরিকতায় বিস্ময় চমকের সঙ্গে এই সত্যগুলি প্রকাশিত হয়ে পাঠকচিত্ত জয় করেছে। এই শ্রেণীর পদের কবিতা হিসেবে এখানেই সার্থকতা এবং পরবর্তী চিন্তাধারা যে এই সত্য ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তাতেই তাঁর কালজয়ী ক্ষমতার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

কিন্তু এ আলোচনা এই পর্যন্ত। গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে। রামপ্রসাদ জীবনী আবিষ্কারে প্রধান পাথেয় ইতিহাস। এই ইতিহাস পাঠের প্রাথমিক নির্দেশ পাই প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীঅজয় বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাছে। নানাভাবে পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন অগ্রজপ্রতিম

অধ্যাপক শ্রীহিমাংশু শেখর ভট্টাচার্য, বন্ধু অধ্যাপক শ্রীশঙ্করকুমার দত্ত (বর্তমানে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রোক্টার), উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীতরুণকুমার মিত্র (বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারবিভাগের অধ্যাপক) সাধারণ গ্রন্থাগারটির দ্বার অবারিত করে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থাগারে তরুণবাবুর আন্তরিক সাহায্যে এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতায় অনেক দুরূহ কর্ম দ্রুত সম্পন্ন করতে পেরেছি। বন্ধু ডকটর অরুণকুমার মিত্র এবং ছাত্র ডক্টর শ্রীমান প্রশান্তকুমার দাশগুপ্তের কাছেও তথ্যানুসন্ধানে সাহায্য পেয়েছি। বর্তমান গ্রন্থরচনার মূল পরিকল্পনা ও প্রেরণার উৎস বন্ধু শ্রীধর্মদাস সামন্ত। বন্ধু শ্রীশম্ভু মল্লিক এবং প্রাক্তন সহকর্মী ও বন্ধু শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ নানাভাবে সহযোগিতা করে উৎসাহ দিয়েছেন। তরুণশিক্ষক অনুজপ্রতিম শ্রীমান রতিরঞ্জন সিংহ সদাহাস্যমুখে প্রুফ দেখার দুরূহ কর্তব্যসম্পাদনের সঙ্গেসঙ্গে তথ্যসংগ্রহেও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তরুণশিল্পী ও শিক্ষক শ্রীপ্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় 'ষট্‌চক্রের' ছকটি এঁকে দিয়েছেন। এঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অনেক সতর্কতাসত্ত্বেও ত্রুটিবিচ্যুতি যা থেকে গেল তার জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

৩৫, পারমার রোড
ভদ্রকালী, হুগলী।

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

॥ সূচী ॥

ভ্রম-সংশোধন

"রামপ্রসাদ-রচনাসমগ্রের" 'কালীকীর্ত্তন' গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্বিতীয় বাক্যটির স্থলে এই বাক্যটি বসবে—"১৭৭৭ শকাব্দে প্রকাশিত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল নন্দীর "শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন" গ্রন্থের সূচনায়ও এই অংশটি স্থান পায় নি"।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

সমসাময়িক তথ্য প্রমাণের অভাব

সাধকশ্রেষ্ঠ, শাক্ত পদাবলীর প্রধানতম স্রষ্টা, সাধারণ বাঙালীর জনপ্রিয়তম কবি রামপ্রসাদ সেনের জীবনী এবং রচনা সম্বন্ধে সুনিশ্চিতরূপে কিছু মন্তব্য করা এখনও সম্ভব হচ্ছে না। অথচ সকল অনুমান এবং তথ্যের ওপর নির্ভর করে দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র দুশো বছর আগে কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরের একটি গ্রাম তিনি অলঙ্কৃত করছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক, এখন কলকাতা-দিল্লীর মধ্যে যাতায়াত যত সহজে সম্ভব, কুমারহট্ট-কলকাতার যোগাযোগ তখনকার দিনে তত সহজ ছিল না।

সময়টিও তখন সরল ছিল না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সেই সঙ্গে সামাজিক পটপরিবর্তনের যুগে যখন শুধু কবিওয়ালারা সাহিত্যের 'অবক্ষয়' রক্ষা করে চলেছিল, তখন রাজপৃষ্ঠপোষকতার বাইরে কে একজন ভক্তসাধক আপনার অন্তরঙ্গ সাধনার অঙ্গ হিসেবে গানের পর গান রচনা করে চলেছিলেন, তার হিসেব কে রাখতো ?

পাশ্চাত্ত্য বণিকদের কুঠীতে রক্ষিত কুঠীর ম্যানেজার এবং এজেন্টদের ডায়েরী এবং ব্যবসাবাণিজ্যের নানা নথিপত্র দেশের সত্যকার বিবিধ চিত্রের উদ্ঘাটনে, দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনায়, বর্তমানে নানাভাবে কাজে লাগছে, কিন্তু দেশের কবিসাধকসাহিত্যিকের কোন তথ্য সেখানে নাই। ফলে কৃত্তিবাস, মুকুন্দরামের মতই মাত্র দুশো বছর আগের কবি রামপ্রসাদেরও অন্ধকার যবনিকা ঘোচে নি।

শ্রীরামপুরের মিশনরি সাহেব W. Ward এর A View of the History, Literature And Mythology of The Hindoos গ্রন্থখানি অষ্টাদশ ও গোড়াকার উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, ইতিহাস ও ধর্মের একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রথমে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। Ward সাহেব ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের সাহায্যে সামাজিক ও ধর্মীয় নানা তথ্য সংগ্রহ করে এতে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫৭৯ পৃষ্ঠায় কালিকামঙ্গলরচয়িতা 'শূদ্র' কৃষ্ণরাম এবং 'ব্রাহ্মণ' কবিবল্লভ, অন্নদামঙ্গলরচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়, পঞ্চাননগীতরচয়িতা অযোধ্যারাম, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী রচয়িতা দুর্গাপ্রসাদের উল্লেখ আছে। দেশীয় কবি শুধু এই ক'জন। কবি বা সাধকরূপে রামপ্রসাদের উল্লেখ এই সংস্করণের দুটি খণ্ডের কোথাও নাই।

১৮২২ এ লণ্ডন থেকে এই গ্রন্থের যে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে রামপ্রসাদের উল্লেখ আছে 'কালিকামঙ্গল'রচয়িতা একজন শূদ্র বলে।*

---

*"সাধক কবি রামপ্রসাদ"—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ২৩৯

রামপ্রসাদ জনপ্রিয় ছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রথম সংস্করণে তাঁর উল্লেখ হল না কেন? Ward সাহেবের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছে তাঁর অপরিচিতিটুকু বিস্ময় উদ্রেক করে।

বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ভ্রমণগ্রন্থ বিজয়রাম সেনের "তীর্থমঙ্গল"। ১৩২২ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় 'তীর্থমঙ্গল' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। লর্ড ক্লাইভের পরবর্তী গভর্ণর হ্যারি ভেরেলেস্টের (১৭৬৭- ১৭৬৯) দেওয়ান ছিলেন গোকুল চন্দ্র ঘোষাল। গোকুলচন্দ্র ঘোষালের দাদা, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুর থেকে গয়া, কাশী প্রয়াগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। চিকিৎসক হিসেবে বিজয়রাম সেন পরে স্বগ্রামের কাছে (পুটিমারীতে) কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থযাত্রার সঙ্গী হন। তীর্থ থেকে ফিরে ১১৭৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে "তীর্থমঙ্গল" গ্রন্থখানি রচনা করেন।

কবি পরে সঙ্গী হলেও পূর্ববর্তী সব বিবরণ শুনে নিয়ে যাত্রারম্ভকাল থেকেই ভ্রমণ বর্ণনা করেছেন। যাত্রাপথের উভয় পার্শ্ববর্তী বহু স্থান এবং ব্যক্তি গ্রন্থে বর্ণিত হয়ে ঐতিহাসিক মর্যাদা অর্জন করেছে। কবি নিজে একজন শাক্ত ছিলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল একজন পরম ভক্তপুরুষ ছিলেন। খিদিরপুরে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে গঙ্গার পরপারে শিবপুরে গেলেন গুরুদর্শনে। তারপর যাগযজ্ঞ করে গৃহপ্রবেশ করলেন।

বাংলাদেশে নবদ্বীপের পূর্ব পর্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী প্রায় সকল স্থানের উল্লেখ ও বর্ণনা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কুমারহট্ট, হালিসহরের উল্লেখও 'তীর্থমঙ্গলে' আছে। সাধক কবি রামপ্রসাদ ১৭৬৮ তে কুমারহট্টেই অবস্থান করছিলেন, অথচ তাঁর কোন উল্লেখ গ্রন্থে নাই। কৃষ্ণচন্দ্র একবার কুমারহট্টের ঘাটে নৌকা বেঁধে রামপ্রসাদকে দেখে এলেন না। ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য, কারণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'রামপ্রসাদ' প্রবন্ধে রামপ্রসাদের প্রথম জীবনে জমিদারী সেরেস্তায় খাতালেখা ও মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিলাভ প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখেছেন—"এই স্থলে দুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন রামপ্রসাদ খিদিরপুরস্থ ৺দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন কলিকাতাস্থ নবরঙ্গ কুলপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরিগিরি কর্ম্ম করিতেন" (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি জীবনী—ডক্টর ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, পৃঃ ৫০)

গোকুলচন্দ্র ঘোষালের বাড়ি রামপ্রসাদ খাতা লিখলে এবং তাঁর নিকট থেকে বৃত্তিলাভ করলে ঘটনাটি ঘোষাল পরিবারে সাধকরূপে রামপ্রসাদকে সুবিদিত করে রেখেছিল। তখনকার দিনের ধনী দরিদ্র সকলের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বলা চলে, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পক্ষে ভাইয়ের আশ্রিত সাধককবিটিকে এড়িয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। রামপ্রসাদের সাধক বা কবিখ্যাতি হয়তো তেমন প্রসারিত বা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নি ১৭৬৮ তে, কিন্তু তিনি যে কোনদিন গোকুলচন্দ্র ঘোষালের বাড়ি খাতা লেখেন নি, নিশ্চিতভাবে তা ধরে নেওয়া যায়।

ইয়ংবেঙ্গলের আলোকে আলোকিত, এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য, পণ্ডিত লেখক ভোলানাথ চন্দ্রের দুখণ্ডে সম্পূর্ণ "The Travels of a Hindu" গ্রন্থটি (প্রকাশিত ১৮৬৯ খৃঃ) বাঙালীর ইংরেজীতে লেখা প্রথম ভ্রমণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের কাছে সমভাবে মূল্যবান। এতে কলকাতা হতে আগ্রা পর্যন্ত জলপথে, রেলপথে, পদব্রজে ও নানাবিধ যানে ভ্রমণ বর্ণিত হয়েছে। সিপাহি বিদ্রোহকালে বাঙালির হাল সম্বন্ধে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। কেন্দুলিতে জয়দেবের সমাধির কিংবা বৃন্দাবনে লালাবাবুর কুঞ্জে "কোকো" গাছের বর্ণনা এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়। একাধারে রসসমৃদ্ধ ও তথ্য-নির্ভর বর্ণনায় সমসাময়িক বাংলার ও ভারতের নানা স্থান আচারআচরণ, বেশভূষা, ধর্মীয় ও সামাজিক নানা রীতিনীতি নিয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

ভোলনাথ চন্দ্র ১৮৪৫।৪৬ এর সময় গঙ্গাবক্ষ দিয়ে নৌকায় কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ভ্রমণকালে নদীতীরবর্তী সকল স্থানের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তৎকালীন অবস্থা ও ঐতিহ্যের বর্ণনার মাধ্যমে স্থানগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু ভোলানাথ চন্দ্রের বর্ণনায় হালিসহর বা কুমারহট্ট স্থান পায় নি। রামপ্রসাদখ্যাত কুমারহট্ট বিখ্যাত ভ্রমণকারীর নজর এড়িয়ে গেল।

লোকনাথ ঘোষের The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, & C (১৮৮১ খৃঃ) গ্রন্থটি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর নতুন সৃষ্ট রাজা-জমিদারদের কুলজীগ্রন্থ। এর প্রথম খণ্ডটিতে শাসকরাজাদের কাহিনী আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ভূস্বামী রাজাজমিদার, ধনী দেওয়ানবেনিয়ান, পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকে আলোকিত-চিত্ত নেতৃস্থানীয় বিদ্বান ব্যক্তিদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও প্রভূত পরিশ্রমের পরিচয় খণ্ড দুটির পত্রেপত্রে বিধৃত। নির্ভরযোগ্য তথ্যগ্রন্থ হিসেবে গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কৃষ্ণনগর রাজবংশের পরিচয় বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। এই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নানা কীর্তির বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর সভাস্থ পণ্ডিত ও কবিদের পরিচয়দান প্রসঙ্গে লেখক রামপ্রসাদের উল্লেখ করেছেন। "Ramprasad Sen a Sanskrit Scholar" (২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬০)—রামপ্রসাদের শুধু এই পরিচয়টুকু পাওয়া যায়।

Sir William Wilson Hunter এর Annals of Rural Bengal (১৮৭৭) এবং কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ Statistical Survey of Bengal (১৮৭৫ তে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত) গ্রন্থগুলি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের আকর গ্রন্থ। District Gazetteer গুলি Hunter সাহেবের অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই প্রথম জন্মলাভ করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৬৯ খৃঃ) প্রথম ঘোষক ও বিবরণ

দাতা Hunter সাহেব। তাঁর Annals of Rural Bengal গ্রন্থে প্রদত্ত বিবরণের বাংলা অনুবাদ বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' প্রদত্ত বিবরণকে। ব্রিটিশরাজত্ব-সূচনার থেকে ইতিহাসকে ধরে রেখেছেন উইলিয়ম হাণ্টার। তথ্যানুসন্ধানের জন্য গঙ্গাতীরবর্তী স্থানগুলি তিনি চষে ফেলেছিলেন। অবশ্য সারা বাংলাদেশই তাঁর অনুসন্ধানক্ষেত্র ছিল। কাঁচড়াপাড়া-ঘোষপাড়ার ঐতিহ্য তাঁর বিবরণে অমর হয়ে আছে। নানা ধর্মীয় শাখার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে তাঁর গ্রন্থ সমৃদ্ধ। অথচ আশ্চর্য কুমারহট্টের রামপ্রসাদকে তিনি খুঁজে পেলেন না।

তাঁর Survey of Bengal এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদদের উল্লেখ আছে এবং এই উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি রামপ্রসাদের নাম করেছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে শুধু একটি কথা বলেছেন, "a Sanskrit Scholar"।

হাণ্টারের গ্রন্থ লোকনাথ ঘোষের চারপাঁচ বছর পূর্বে রচিত। সুতরাং রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা তাঁরই অনুসন্ধানলব্ধ। রামপ্রসাদ অবশ্যই সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু সেইটিই তাঁর একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। হাণ্টারের মত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এই পরিচয়ের বেশি তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানাতে পারলেন না।

দয়ালচন্দ্র ঘোষের "প্রসাদ-প্রসঙ্গে"র প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর দয়ালচন্দ্র ঘোষকেই রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ গবেষক বলা হয়।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকার বিজ্ঞাপনে* লেখক লিখেছেন—"তিন বৎসরেরও অধিক-কালের পরিশ্রমের আজ পরিসমাপ্তি হইল"।

অর্থাৎ লেখক ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম রামপ্রসাদ অনুসন্ধানে রত হন।

প্রথমে রামপ্রসাদের সঙ্গীত শুনে আকৃষ্ট হয়ে রামপ্রসাদের অনুসন্ধানে রত হলেও তাঁর সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাচ্ছিলেন না। শেষে এক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকের কাছে তিনটি তথ্য পেলেন। (এক) রামপ্রসাদ বৈদ্য ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক, (দুই) তিনি শ্রেষ্ঠ শক্তিসাধক, (তিন) তাঁর বাড়ি কুমারহট্টে।

এর পর রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত হওয়ায় আরও তথ্য ও কিছু পদ পেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় "কালীকীর্তন" প্রকাশিত করেন। ১২৬০ বঙ্গাব্দের পৌষ অর্থাৎ ১৮৫৩ তে 'সংবাদপ্রভাকরে' রামপ্রসাদ-জীবনী প্রকাশিত হয়েছে এবং আগে ও পরের সংখ্যায় আরও পদ ও আলোচনা স্থান পেয়েছে। অথচ ঢাকায় বসে দয়ালচন্দ্র ঘোষকে ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে এতখানি অন্ধকার হাতড়াতে হয়েছিল জেনে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রসারতার দৈন্য দেখে দুঃখিত হতে হয়।

* প্রমথনাথ চৌধুরী সম্পাদিত "প্রসাদ-প্রসঙ্গ" (১৯৬৬)

'সংবাদপ্রভাকর' জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত পত্রিকা ছিল এবং ঢাকায় অবশ্যই শিক্ষিত সাধারণের কাছে তার প্রচার ছিল। অথচ দয়ালচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি কেন্দ্র ঢাকায় রামপ্রসাদকে পৌঁছে দিতে পারেন নি। রামপ্রসাদই সম্ভবতঃ এমনি গমনভীরু, প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাঁর সময়ে জীবনীকারেরা কি করে কুমারহট্টকলকাতায় তাঁর অবাধ যোগাযোগের কথা বলেন বোঝা যায় না। দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম একবারও করেন নি।

রামপ্রসাদ-আবিষ্কারে
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অবলম্বিত পদ্ধতি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২১৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন এবং জোড়াসাঁকোয় মাতুলগৃহে প্রতিপালিত হতে থাকেন। ১৮৩০ এ পিতৃবিয়োগের পর পুরোপুরি জীবিকার্জনে নামেন। প্রথম দশটি বছর সমগ্রভাবে এবং পরের আটটি বছর মোটামুটিভাবে তাঁর স্বগ্রাম কাঁচড়াপাড়ার সঙ্গে যোগ থাকে।

১৮৩১ এ ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। গুপ্ত কবির বয়স তখন উনিশ-কুড়ি বছর। এ সময় কবি পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবারের প্রভাবাধীন। রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন, কবিগানের আসর মাত করেন। ১৮৩৩ এ গুপ্তকবি রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত করেন। সম্ভবতঃ রামপ্রসাদ রচনার এই প্রথম মুদ্রণ। এই প্রথম মুদ্রণের কারণ ও পদ্ধতি লক্ষ্য করার মত।

বাইস বছর বয়সের কবি সম্পাদিতগ্রন্থের দুটি ভূমিকা দিয়েছেন—একটি গদ্যে, আকারে ছোট; অপরটি পদ্যে। পদ্য ভূমিকায় দুটি পদ পাওয়া যায়—একটি পয়ার অপরটি ত্রিপদী।*

পদ্য ভূমিকায় তিনটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। কবির রামপ্রসাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, কবির শাক্ত দুর্বলতা এবং প্রথম দিককার কবিতার নমুনা হিসেবে পদ দুটি উল্লেখযোগ্য। পরে এ মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু গুপ্ত কবির প্রথম

* ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী (১ম খণ্ড)—ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুখটি *সম্পাদিত—পৃঃ ৪৩*

পর্যায়ের পদ্য রচনা এবং জীবনের প্রথম দশ বছরের প্রভাবের জন্য এগুলির মূল্য আছে। এবার গদ্য ভূমিকাটি দেখা যাক। কালীকীর্তন সম্পাদনার কারণ প্রথমেই বলেছেন। কারণ দুটি—কালীকীর্তন রচনার অপ্রতুলতা এবং পাঠদোষে গায়কদের প্রকৃত রস উদ্ঘাটনে অসামর্থ্য। তাই "ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকাল স্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তন পুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"*

আকরস্থান কোথায় এবং মূল গ্রন্থটি কার হস্তলিখিত গুপ্ত কবি বলেন নি। তারপর তিনি তা সংশোধিত করেছেন এবং নিজেই এই সংশোধনকার্য করেছেন, না কারও সাহায্য নিয়েছেন, তাও অনুল্লিখিত।

১২৬০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার 'সংবাদপ্রভাকরে' কবি ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদজীবনী প্রকাশিত করেন। পূর্বের সংখ্যায় রামপ্রসাদের কয়েকটি পদ আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী মাঘ সংখ্যায় একখানি পত্র এবং কিছু রচনা প্রকাশিত হয়।

১২৬১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে গুপ্তকবি 'সংবাদপ্রভাকরে' প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহের জন্য সাধারণের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন। চারটি সংখ্যায় (শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ) আবেদনগুলি প্রকাশিত হয়।

১২৬২ বঙ্গাব্দে ভারতচন্দ্রের জীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় দুটি অংশ লক্ষ্য করার মত—

[১] "বঙ্গভাষাভূষিত প্রাচীন পদ্যপুঞ্জ এবং তত্তৎপ্রচক পুরাতন কবি কদম্বের জীবন-চরিত সংগ্রহপূর্ব্বক সাধারণের সুগোচর করণার্থ আমি প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাপথের পথিক হইয়া প্রতি নিয়তই উৎসাহ রথের চালনা করিতেছি, এই বিষয়ের নিমিত্ত ধন, মন, জীবন পর্যান্ত পণ করিয়াছি,—সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি।"

[২] "দশ বৎসর পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল আমি এই কার্য্যের দৃষ্টান্তদর্শক হইয়াছি অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রেই অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন-রামপ্রসাদ সেনের "জীবনবৃত্তান্ত" এবং তাঁহার প্রণীত "কালীকীতন" ও কৃষ্ণকীর্ত্তনাভিধান— ভক্তিরস-প্রধান. মধুর গান এবং অবস্থাভেদের শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর কতিপয় রসঘটিত পদাবলী ১২৬০ সালের পৌষমাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।"**

* ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী (১ম খণ্ড)—ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুখটি সম্পাদিত—পৃঃ ৪৩

** ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী গ্রন্থের "পরিশিষ্ট" পৃঃ ৩২৯।

১২৬০ সালের ১লা পৌষ প্রকাশিত রামপ্রসাদ জীবনীর উপসংহারে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন —"পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা রামপ্রসাদ পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, একাল পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, যেখানে যাহা প্রাপ্ত হই তাহাতেই এক একখানা বিড়ম্বনা দেখিতে পাই।"

গুপ্ত কবির উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি লক্ষ্য করার মত। ভারতচন্দ্রের ভূমিকায় লিখেছেন রামপ্রসাদ জীবনী দশ বছর চেষ্টার ফল। আবার "রামপ্রসাদ জীবনী"তে বলেছেন পঁচিশ বছরের চেষ্টা।

বছর নিয়ে কিছু এসে যায় না, উদ্দেশ্যটাই আসল। প্রাচীন কবিদের জীবনী ও রচনা অনুসন্ধানকালে গুপ্তকবি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রভাবাধীন। আর তিনি গোড়া রক্ষণশীল নন, রেঁণেসার আলোকে চিত্তের কিয়দংশ আলোকিত।* উদার, সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাবের অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র দেশাত্মবোধের দ্বারা চালিত হয়ে প্রাচীন রত্নরক্ষায় ও লুপ্ত রত্নোদ্ধারে রত হয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন।

গুপ্তকবির রামপ্রসাদজীবনী কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রকাশের পূর্বে রচিত। এখানে যে পঁচিশ বছরের চেষ্টার কথা বলেছেন, তা যদি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায় তা হলে এই চেষ্টার শুরু ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ ঈশ্বরগুপ্ত তখন মনোমত পড়াশুনো করছেন, খেয়ালখুসি মত জীবন কাটাচ্ছেন। তখন পিতৃবিয়োগ হয় নি, পাথুরেঘাটার সংস্পর্শে আসেন নি, বয়স ষোল-সতেরো, কিছুকাল হল বিবাহ হয়েছে।

পঁচিশ বছরের উল্লেখটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। গুপ্তকবির বাল্য নিবাস ও জন্ম কাঁচড়াপাড়া। কুমারহট্ট ও কাঁচড়াপাড়া খুব ঘনিষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ""কাঁচড়াপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমারহট্টের দক্ষিণে গোরাভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস।.....কুমারহট্টের গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচড়াপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।"**

ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদ সম্পর্কে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হেতু শাক্তধর্ম সম্পর্কে আবাল্য একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ। ১৮৩৩ এ "কালীকীর্তন" প্রকাশ করেছেন নিজের এই বিশেষ দুর্বলস্থানটুকুর দাবীতে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরিকল্পনা রচনার পূর্বেই তাই ১৮৫৩ এ "রামপ্রসাদ জীবনী" প্রকাশিত করেছেন।

সব ক্ষেত্রেই অবলম্বন তাঁর বাল্যের স্মৃতি, সেখানকার লোকজনদের কাছে বাল্যে প্রাপ্ত সংবাদ। তাঁরই হিসেব মত রামপ্রসাদের তিরোধানের তিরিশ বছর পরে তাঁর জন্ম।

---

* ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব"—পৃঃ ৭৭

** ঐ পৃঃ ৪

সুতরাং বাল্যে রামপ্রসাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত লোকদের তিনি সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

কিন্তু প্রথমেই তিনি তাঁর প্রাপ্ত সংবাদগুলি দিলেন না। সম্পাদনা করলেন 'কালীকীর্তন', ভক্তিঅর্ঘ্য জানালেন। তার পর নানা ঘটনার আবর্তে কুড়িটি বছর কেটে গেছে, অনেক স্মৃতি ঝাপ্সা হয়ে এসেছে; মনোজগতেও নানা পরিবর্তন ঘটেছে, অন্তরে লালিত বাল্যের স্মৃতি রামপ্রসাদ জীবনীতে উদ্ঘাটিত করেছেন। খোঁজখবর অবশ্যই নিয়েছেন, কিন্তু প্রধানভাবে নির্ভর করেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালার ওপর।

১২৬০ এর পৌষে "রামপ্রসাদ" প্রকাশিত হল 'সংবাদপ্রভাকরে'। প্রভাকরের মাঘ সংখ্যায় একটি পত্র প্রকাশ করলেন গুপ্তকবি। পত্র লেখকের নাম দেননি, কিন্তু পত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ। পত্র লেখক নিজেকে দাবী করেছেন, রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী বলে। তিনিই প্রথম জনশ্রুতি থেকে রামপ্রসাদের সঙ্গে নবাব সিরাজদ্দৌলার সাক্ষাৎকারের ঘটনার পরিচয় দিয়েছেন। নতুন সংবাদের মধ্যে আর একটি হল রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর। পত্রের অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হচ্ছে—

[১] "ইদানীন্তন ঐ মহাপুরুষ কেবল কতিপয় প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞ ও মর্ম্মগ্রাহি মনুষ্যের নিকট পরিচিত ছিলেন মাত্র,"

[২] "কবিরঞ্জনের দৈবশক্তি ও পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বরসের ব্যাপার যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উৎকট বর্ণনা হয় নাই, স্বরূপাখ্যান হইয়াছে, কারণ রামপ্রসাদ সেন অস্মদ গ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে আমরা অনেক জ্ঞাত আছি।"

[৩] তাঁহার মাহাত্ম্যবিষয়ক আপনার রচনা গ্রামস্থ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ও অনুসন্ধানকারী এবং বৃদ্ধ মনুষ্যেরদের সমক্ষে পাঠ করিলে তাঁহারা অম্লান বদনে ব্যক্ত করিলেন যে এরূপ লেখা পরম্পরা শ্রুতিবাক্যানুযায়ী বটে, পরন্তু তিনি যে ঐশিক শক্তি প্রভাবে গীতাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ বিরহ, শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রের শাসন দর্শন ও মর্ম্ম প্রকাশ করা কি সামান্য ক্ষমতা কর্ম্ম ?"

[৪] "শ্রুত আছি যে কবিবরের মিষ্টস্বর ছিল না তথাচ তিনি যখন গান করিতেন শ্রোতৃগণের শ্রবণে সেই স্বর মধুর স্বর বোধ হইত এবং যতক্ষণ গান করিতেন ততক্ষণ তাঁহারা চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ থাকিতেন, ঐশ্বরিক অনুকম্পা ব্যতীত এ বিষয়ে আর কি অনুমান করা যাইতে পারে ?"

[৫] "কবিরঞ্জন নবাবের (নবাব সিরাজদ্দৌলার) মনোরঞ্জনার্থে একটি খেয়াল ও একটি গজল গাইলেন,"

[৬] "ফলতঃ তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন ; ..... তেঁহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ি প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,"*

* ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি জীবনী"—পৃঃ ৮০

পত্রলেখকের বিবৃতি থেকে রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর, তাঁর বিভিন্ন সঙ্গীত সম্পর্কে জ্ঞান, একেশ্বরবাদ প্রভৃতি জানা গেল।

আসলে পত্রটি ঈশ্বরচন্দ্রের বিবৃত তথ্যের একটি সাক্ষ্য দলিল। পত্রলেখক রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী। তাঁর বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গী থেকে বোঝা গেল তথ্যসংগ্রহের জন্য জীবনী রচনাকালে গুপ্তকবি কুমারহট্ট যান নি, তাই তৎকালে জীবিত বৃদ্ধ গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগও করেন নি।

আবার বৃদ্ধ তথ্যাভিজ্ঞ গ্রামবাসীরা রামপ্রসাদের রচনায় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা গেল। রামপ্রসাদের প্রচারিত একেশ্বরবাদ কি তাঁর শাস্ত্রানভিজ্ঞতার নজির বলে গৃহীত হত? অন্ততঃ স্বগ্রামবাসী বৃদ্ধদের রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ধারণা যে বিশেষ পরিপক্ক নয়, তা বোঝা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র তাই তখনকার লোকগুলির ওপর নির্ভরতার কথাও ভাবেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নির্ভর করেছিলেন তাঁর বাল্যে শোনা তথ্যগুলির ওপর। এই তথ্যগুলি তিনি যেভাবে রামপ্রসাদজীবনীতে পরিবেশন করেছিলেন, যদি সেই ভাবেই বাল্যে শুনে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে, রামপ্রসাদ তখনই তাঁর স্বগ্রামে প্রায় বিস্মৃত ব্যক্তি, মাত্র জনশ্রুতিতে পর্যবসিত। অবশ্য ঘটনার আবর্ত ও কালের ব্যবধান গুপ্তকবির স্মৃতি-ভাণ্ডারে যে শৈথিল্য ঘটায় নি, তাও জোর করে বলা যায় না।

প্রথম জীবনীকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরিবেশিত কয়েকটি তথ্য

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই সাধককবি রামপ্রসাদের প্রথম জীবনীকার। পরবর্তী সকল জীবনীই তাঁর ওপর ভিত্তি করে রচিত। অবশ্য সকলে একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি। গুপ্তকবির লেখা ছাড়া কারোর কোন গত্যন্তর ছিল না। রামপ্রসাদের এক ছত্র হাতের লেখা পাওয়া যায় না। একটি পদ কি কোন একটি রচনা তাঁর হস্তলিখিত বলে জানা যায় না।

অনেক অনুসন্ধানে দু-একটি দলিলটলিল কেউ বা পেয়েছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। জীবনীগ্রন্থ বিপুলকায় হয়েছে কল্পিত কাহিনীর ভারে। সকলেই তাঁর গ্রামে ছুটেছেন এবং বহু কল্পিত কাহিনীর সন্ধান পেয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র যা বলেছেন, তার বাইরের কাহিনীগুলি পরবর্তী কালের সৃষ্টি। রামপ্রসাদের আত্মীয়স্বজনদের অর্থাৎ পরবর্তী বংশধরদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও সুফল মেলে নি।

সুফল যে মিলবে না তা তো জানাই। জীবিতকালের রামপ্রসাদ যে পরবর্তীকালে

এমন একজন অসাধারণ পুরুষরূপে পরিগণিত হবেন তা তাঁর সমসাময়িক কেউ ভাবেই নি।

সাধকের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বংশধরেরা গ্রামের বাসই উঠিয়ে দেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যার সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—"যে ভূমি-খণ্ডের উপর রামপ্রসাদের বাসগৃহ ছিল, তাহা দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়। বহুকাল তাহা জঙ্গলপূর্ণ ছিল: সম্প্রতি হালিসহরবাসিগণ এই মহাপুরুষের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া, সেই পবিত্র স্থানটির প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। স্থানীয় পূর্ণিমা-ব্রত সমিতির সভ্যগণের যত্নে গত দশ বৎসর হইতে মহাত্মা রামপ্রসাদের স্মরণার্থে একটি মেলা হইতেছে। ইহা প্রসাদমেলা নামে অভিহিত। প্রতি বৎসর কালীপূজার সময়ে ইহার অনুষ্ঠান হয়, এবং তদুপলক্ষে কালীদেবীর পূজা হইয়া থাকে।......হালিসহরের হিতৈষিণী সভা একটি "প্রসাদ-প্রাসাদ" নির্ম্মাণ জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।"

রামপ্রসাদের সঙ্গে স্বগ্রামের সম্পর্ক তাঁর তিরোধানের সঙ্গেই প্রায় সমাপ্ত হয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্ত যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তাঁর বাল্য কৈশোরের ঔৎসুক্যে ও ভক্তিতে, তাই শুধু খাঁটি এবং একমাত্র নির্ভরস্থল।

ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদ জীবনীর শেষের দিকে বলেছেন, "৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহারপূর্ব্বক নিত্যধামে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবেক না। প্রাচীন লোকেরা কহেন 'তিনি শ্যামা প্রতিমা বিসর্জ্জন সময়ে পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জ্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস, আমি পদব্রজে চলিলাম।'......"*

এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রামপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যুর সময় যথাক্রমে ১১২৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭২০ খৃষ্টাব্দ এবং ১১৮৮ বঙ্গাব্দের ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার বা ১৬ অক্টোবর ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ বলে নিরূপণ করেছেন (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

অন্য প্রমাণাভাবে রামপ্রসাদের জন্ম ১৭২০ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ধরে নেওয়াই সবচেয়ে সমীচীন। গুপ্তকবি কেন যে এখানে সন তারিখের উল্লেখ করলেন না তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর যেভাবে শোনা, সেইভাবে লিখেছেন। ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে অনুরূপ দেখি, কারণ তাঁর হাতে প্রামাণ্য দলিল ছিল।

এরপর ঈশ্বরগুপ্ত অনুমানের ভিত্তিতে একটি গুরুতর তথ্য পরিবেশন করেছেন। রামপ্রসাদের সাংসারিককৃচ্ছ্রতা দূরীকরণে জীবিকার্জ্জনের কথা প্রসঙ্গে গুপ্তকবি

* ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী" গ্রন্থের 'রামপ্রসাদ' থেকে এই গ্রন্থে ঈশ্বরগুপ্তের রামপ্রসাদ জীবনীর সকল উদ্ধৃতি গৃহীত।

লিখেছেন—"রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনির গৃহে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন,......"

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। গুপ্তকবি কলকাতা বা তার নিকটের কোন স্থানের কথা বলেছেন। স্পষ্ট করে কলকাতার কথা বলেন নি।

তারপর পাদটীকায় নিজেই লিখেছেন—"এই স্থলে দুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন রামপ্রসাদ খিদিরপুরস্থ ৺দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন কলিকাতাস্থ নবরঙ্গ কুলপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরিগিরি কর্ম্ম করিতেন।"

উল্লিখিত দুইজন এবং আরও কয়েকজন সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেক গবেষণা হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্ত পরিষ্কার করে লিখে গেলে কোন ঝামেলা হত না। কিন্তু তা লেখার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। সবই তো জনশ্রুতি। গোকুলচন্দ্র ঘোষালের দাবী যে টেকে না তা পূর্বে দেখানো হয়েছে। দুর্গাচরণ মিত্রের দাবীর পিছনে জনশ্রুতি ছাড়া কোন প্রমাণ নাই। এঁর দাবী বিবেচনা করতে হলে আরও অনেকের দাবী মানতে হয়।

কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সুজনতোষিণী (১৩০২, কার্ত্তিক) পত্রিকায় "কবি রামপ্রসাদ" প্রবন্ধে লিখেছেন "প্রসাদ চুঁচুড়া গ্রামে শীল বাবুদের বাড়ীতে চাকরী করিতেন।"

১৩২০ সালে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিভাষণে রামপ্রসাদের সওদাগরী বাড়ির চাকরী যাওয়ার কথা বলেন।*

ডক্টর কালীকিংকর দত্ত তাঁর "Alivardi and His Times" গ্রন্থের ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"the poet Ramaprasada Sena, formerly a clerk under the Company." ডক্টর দত্ত তাঁর এ তথ্য রামপ্রসাদ রচনাবলীর বঙ্গবাসী সংস্করণের ভূমিকায় পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

রামপ্রসাদের জীবিকার্জনের স্থান এবং মনিব ব্যক্তিটি এখনও সমস্যা হয়ে আছে। তাঁর লেখা প্রথম পদ বলে উল্লিখিত পদটিও ('দাও মা আমায় তবিলদারী' ইত্যাদি) কি এই সমস্যার মধ্যে গিয়ে পড়ে না? স্থান ও পাত্র নির্দিষ্ট না হলে পদটির নির্দিষ্ট মর্যাদাই বা দেওয়া যায় কি করে? রামপ্রসাদজীবনী রচনা করতে গিয়ে ঈশ্বরগুপ্তই এই সব সমস্যার সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সমাধান কিছুই দিয়ে যান নি, সামর্থ্য ছিল না বলে। অবশ্য এই সমস্যা সৃষ্টি করেও তিনি রামপ্রসাদকে চিরকালের জন্য বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। এজন্য দেশবাসীমাত্রেই আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

রামপ্রসাদ যে জীবিকার্জনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, তাঁর পদেই তার প্রমাণ রয়েছে।—

কাজ হারালেম কালের বশে।
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে॥

* "সাধক কবি রামপ্রসাদ" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পৃঃ ৫২

যখন তারা ধন উপার্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে ॥
এখন আমার ধন উপার্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥

রামপ্রসাদ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং "কবিরঞ্জন" উপাধি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছেন তাঁর অনুমান ও জনশ্রুতিভিত্তিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে। গুপ্তকবি লিখেছেন—"ঐ সময়ে রামপ্রসাদ সেনের প্রতি ও তাঁহার কবিতার প্রতি মহারাজের (কৃষ্ণচন্দ্রের) এতদ্রূপ প্রীতি জন্মিল যে তিনি মধ্যে মধ্যে হালিশহরে স্বয়ং আসিয়া নিজস্থাপিত কাছারী বাটীতে কিছুদিন প্রবাস করত রামপ্রসাদ সেনকে আহ্বান করিয়া প্রচুরতর প্রযত্ন পুরঃসর তাঁহার কবিতা সকল শ্রবণ করিতেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন রাজ-কৃপায় কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়া নিজ বিরচিত বিদ্যাসুন্দরের নাম "কবিরঞ্জন" রাখিলেন। ইহাতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রেব প্রতি বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন, রাজাজ্ঞায় ভারতচন্দ্র যে বিদ্যাসুন্দর প্ররচনা করেন, তাহা সমুদয় রাজপণ্ডিত কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল, একারণ তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। রামপ্রসাদ সেন দুঃখী ছিলেন এবং রচনাকল্পে কোন ব্যক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, আপনার মনে যেমন উদয় হইয়াছিল, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের এক এক স্থলে এমত সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ভারতচন্দ্রী রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যেখানে পরমার্থ প্রসঙ্গ এবং কালীনামের গন্ধ পাইয়াছিলেন সেই সেই স্থানে রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন তাহা বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম, ফলে তাঁহার পদ সর্ব্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।"

গুপ্তকবি যে তথ্যগুলি পরিবেশন করেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে এই রকম দাঁড়ায়—

[১] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। রামপ্রসাদ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের নাম দেন 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর'।

[২] রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর রচনা দেখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর আশ্রিত কবি ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ দেন এবং তারপর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়।

[৩] রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর উৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু তাঁর কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং পদাবলী উৎকৃষ্টতর রচনা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে বিদ্যাসুন্দর রচনার পূর্বে কবিরঞ্জন উপাধি দেন, না বিদ্যাসুন্দর রচনা দেখে এই উপাধি দেন তাই প্রথম সমস্যা। রচনার পরে এই উপাধি দিলে এই দীর্ঘ গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি পরিচ্ছেদ অন্তে কবিরঞ্জন ভণিতা বসিয়ে দেওয়া কবির পক্ষে সম্ভব হত না। সংশোধনের একটা সীমা আছে, তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে এ জাতীয় সংশোধন একেবারেই অসম্ভব ছিল। তখন আবার ভণিতাও রচনার অঙ্গ বলে গৃহীত হত। সুতরাং রামপ্রসাদ পুনরায় অতগুলি পদের অন্তে "কবিরঞ্জন" উপাধি বসিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার চেষ্টা করেন নি।

বিদ্যাসুন্দর রচনার ঠিক পূর্বে যদি 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেতেন এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ যদি গ্রন্থটি রচনা করতেন তাহলে গ্রন্থের মধ্যে কোন না কোন স্থলে মহারাজের উল্লেখ থাকতো। কৃতজ্ঞতাবশে রামপ্রসাদ যে নামোল্লেখে অভ্যস্ত ছিলেন, 'কালীকীর্ত্তনে' তার প্রমাণ আছে।

সুতরাং ধরা যেতে পারে 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থ 'কবিরঞ্জন' উপাধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রচিত নয়। অথচ 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার পূর্বেই উপাধিটি তিনি লাভ করেছিলেন।

এখন পরের সমস্যা রামপ্রসাদের পরে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' রচিত হয় কিনা তাই নিয়ে।

ভারতচন্দ্রেরও প্রথম জীবনী গুপ্তকবির লেখা, কিন্তু সেখানে রামপ্রসাদের মত বিদ্যাসুন্দর রচনা করার কোন নির্দেশ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে দিয়েছিলেন বলে গুপ্তকবি উল্লেখ করেন নি। বরং মুকুন্দরামের আদর্শে অন্নদামঙ্গল রচনার নির্দেশের উল্লেখ আছে।

ভারতচন্দ্র ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে "অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ভারতচন্দ্ররচিত "বিদ্যাসুন্দর"। রামপ্রসাদকে ভারতচন্দ্রের পূর্বে বিদ্যাসুন্দর রচনা করতে হলে তাঁর সে রচনাকাল কখন হবে?

১৭৪২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্গীর হাঙ্গামার যুগ। এ সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র হালিসহরে বাস করতে যাবেন ভাবাই যায় না। তিনি তখন ইছামতীর তীরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, অবশ্য এরই মধ্যে কিছুকাল নবাব আলীবর্দীর কারাগারে। তাহলে ১৭৪২ এর পূর্বে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর রচনার ঘটনাটি ঘটে এবং তাঁর উপাধিলাভও হয়ে যায়। কিন্তু তাও অসম্ভব।

কবির জন্ম ১৭২০ খৃষ্টাব্দে হলে এবং জীবিকার্জনে বাইরে কিছুকাল কাটিয়ে বৃত্তি নিয়ে কবিত্বখ্যাতির সঙ্গে কুমারহট্টে স্থিতি হতে হলে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের ঘটনা ঘটতেই পারে না।*

গুপ্তকবি আরও লিখেছেন, "বাঙ্গালা ১১৬৫ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৪/ চৌদ্দ বিঘা ভূমি রামপ্রসাদ সেনকে নিষ্করর়ূপে প্রদান করেন, তাহার সনন্দপত্রে লিখিত আছে 'গরআবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক'। পরন্তু তাহাতে রাজার মোহর ও নাম স্বাক্ষরিত আছে, ঐ ভূমি কুমারহট্টের অতি নিকটেই।"

গুপ্তকবি উল্লিখিত এই দলিলের সন্ধান মেলেনি। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন "এই দান পত্র বোধ হয় গুপ্তকবি স্বয়ং পরীক্ষা করেন নাই"। (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন —পৃঃ ২১)

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র দানপত্রের পরিচয় দিয়েছেন। এই দানপত্র রচিত হয় ১১৬৫ তারিখ ৪ ফাল্গুন বা ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে। এই দানপত্রে শুধু শ্রীরামপ্রসাদ সেন বলে উল্লেখ আছে অর্থাৎ 'কবিরঞ্জন' উপাধির উল্লেখ নাই। (উক্তগ্রন্থ)

রামপ্রসাদ আরও ভূমি পেয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' গ্রন্থ থেকে ভূমিদান সনদটি তুলে দিচ্ছি—"রঘুনন্দনের বিবরণানুসারে হালিসহরের সুভদ্রা দেবী ২ বৈশাখ ১১৬৫ সনে একটি বাটি (পরিমাণ আন্দাজ ১/০ বিঘা) রামপ্রসাদকে "বসতি করিতে বৈদ্যত্তর মহাত্রাণ" রূপে দান করেন......। হালিসহরের বিখ্যাত তালুকদার সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় দর্পনারায়ণ ঐ পরগণার তালডেঙ্গা গ্রামে ২/০ বিঘা জমী ১৫ আষাঢ় ১১৬৫ সনে রামপ্রসাদকে দান করেন .....। দর্পনারায়ণ ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের অধস্তন ৭ম পুরুষ। রামপ্রসাদের প্রাচীনতম ভূমিদান সনদের তারিখ ১৭ চৈত্র ১১৬০ সন (=১৭৫৪ খৃঃ)—দাতা উক্ত দর্পনারায়ণ শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একাযোগে......।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিদান সনদের তারিখ ৭ ফাল্গুন, ১১৬৫। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বেই ভূমিদানপ্রাপ্তি রামপ্রসাদের পূর্ব প্রতিষ্ঠারই পরিচয় দিচ্ছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্রে 'কবিরঞ্জন' উপাধির উল্লেখ না থাকায় স্বভাবতঃই মনে হতে পারে ১৭৫৮র পূর্বে তিনি এ উপাধি পান নি। অবশ্য সবই নির্ভর করছে গুপ্তকবির জনশ্রুতি-ভিত্তিক তথ্যের ওপর। কৃষ্ণচন্দ্রই যে তাঁকে কবিরঞ্জন উপাধি দিয়েছেন, অন্যত্র তার কোন প্রমাণ মিলছে না। বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ না পাওয়ায় ধরা যেতে পারে

* এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 'বিদ্যাসুন্দর' রচনাকালে রামপ্রসাদ তিন সন্তানের পিতা। দুটি কন্যা এবং একটি পুত্রের উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ১৭৫৮র পর কোন এক সময়ে রচিত এবং স্বভাবতঃই তা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পরে।

শোভাবাজার রাজবাড়ীর পণ্ডিত-কবি রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী ১২৪৩ সালে (অর্থাৎ ১৮৩৬ র কাছে) প্রাণরাম চক্রবর্তীর 'কালিকামঙ্গল' সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থে সম্পাদক নিজে এই লাইন ক'টি যোগ করে দেন—

বিদ্যাসুন্দরের লই প্রথম প্রকাশ।
তদন্তর কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥*

উদ্ধৃত অংশটির দ্বিতীয় লাইনের 'তদন্তর' কথাটির ভুল পাঠ গ্রহণ করে অনেকেই প্রাণরামকে ভারতচন্দ্রের পরবর্তী বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা বলে মনে করেন।

প্রকৃতপক্ষে, সম্পাদক রচিত এ পঙক্তি ক'টি খুবই মূল্যবান। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যধারার পর্যায়ক্রম নির্ণয়ে এগুলি খুবই সহায়ক। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাঠের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৫৮) বর্তমান লেখকের সম্পাদিত 'কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকাটি দেখতে অনুরোধ করি।

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার ক্রম সম্বন্ধে মন্তব্যটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কালীকীর্ত্তন' প্রকাশের তিন বছর পরে প্রকাশিত। গুপ্তকবি তখন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। রামচন্দ্রের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি 'রামপ্রসাদ জীবনী'তে রামপ্রসাদকে ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা বলে মনে করেছেন।

রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার তাঁর তথ্য কোথা থেকে পেয়েছিলেন জানা যায় না। তিনি রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। অথচ শুনেছিলেন। রামপ্রসাদরচিত বিদ্যাসুন্দরের অপ্রতুলতার জন্যই সম্ভবত তাঁকে ভারতচন্দ্রের পূর্বে বলেছেন।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' দেখলে দেখতেন রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের ধারায় তাঁর কাব্য লিখেছেন। কৃষ্ণরামের গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর গ্রন্থের সাদৃশ্যের পরিমাণ যেমন অধিক, ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তেমনি তাঁর পার্থক্যের পরিমাণও নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যাপক। অথচ রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর দেখেছিলেন। ভারতচন্দ্রের অনুসরণেই তিনি

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫০ ভাগ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, "প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গল'।

বিদ্যাকে বর্ধমানের রাজকন্যা বলে ধরেছিলেন কিন্তু আর সব বিষয়েই তিনি কৃষ্ণরামকে অনুসরণ করেছিলেন।

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরে পুরানো ধারার জনপ্রিয় কবি কৃষ্ণরামকে জনপ্রিয়তায় অতিক্রম করতে পারেন নি। আবার নতুন ধারার যে প্লাবন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এনেছিল, তারও পাশে দাঁড়াতে পারেন নি। ফলে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর সুপ্রচলিত হওয়ার পূর্বেই অপ্রচলিত হয়ে জনসাধারণের অগোচরে চলে যায়।

রামপ্রসাদের পদাবলীর জনপ্রিয়তাও সাহিত্যআসর থেকে তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর'কে দ্রুত সরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। এ বিষয়ে রামপ্রসাদই যেন তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন। সুন্দরের 'দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি-সংস্থাপন' অংশে কবি বলেছেন—

বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হবে ব্যস্ত॥

প্রকৃতপক্ষে রামপ্রসাদের 'গান' নিয়েই সবাই ব্যস্ত। তবে এই সমস্ত আলোচনা করে এইটুকু বোঝা যায়, কবিসাধক যৌবনের প্রথম দিকে চপলতাবশতঃ বিদ্যাসুন্দর লিখেছেন বলে অনেকে যে মনে করে থাকেন, তা ঠিক নয়। 'পদাবলী'র পথে কবি অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছেন 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার আগে, কবির উদ্ধৃত উক্তিটিই তার প্রমাণ। যৌবন-চাপল্যে লিখলে তিনি ভারতচন্দ্রকেই অনুসরণ করতেন। কাজেই 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁর প্রথম রচনাও নয়।

'নিমতা'র কৃষ্ণরাম দাসের অনুসরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। একই পৃষ্ঠপোষক হ'লে অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখলে দুজন দুরকমের বিদ্যাসুন্দর লিখতেন না।

কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে কুড়ি বছর বয়সে 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। কৃষ্ণরাম তাঁর 'কালিকামঙ্গলে'র আত্মবিবরণীতে লিখেছেন—

সাবর্ণ্য চৌধুরী সব একমুখে কিবা নিব
অশেষ মহিমা অতি স্থির।
শ্রীশ্রীশ্রীমন্ত রায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
ধার্ম্মিক যেমন যুধিষ্ঠির॥
বিদ্বান উত্তম দাতা জিনিয়া কল্পলতা
জনার্দ্দন রায় মহাশয়।
উপমা কোথায় এতো কি কহিব গুণ যত
সহস্র-বচন মোর নয়॥

প্রতাপে তিমির হয় যশের যামিনী কর
শুদ্ধমতি কাশীশ্বর রায়।
পুণ্যের অবধি নাই দেখি ইন্দ্র ভয় পাই
কলিকালে এমন কোথায় ॥
সেই গ্রামের মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপত্তি।
তাহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি ॥*

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ" গ্রন্থের ২১ ও ২২ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, "হালিসহরের বিখ্যাত তালুকদার সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় দর্পনারায়ণ ঐ পরগণার তালডেঙ্গা গ্রামে ২/বিঘা জমি ১৫ আষাঢ় ১১৬৫ সনে রামপ্রসাদকে দান করেন ..। দর্পনারায়ণ ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের অধস্তন ৭ম পুরুষ। রামপ্রসাদের প্রাচীনতম ভূমিদান সনদের তারিখ ১৭চৈত্র ১১৬০সন (=১৭৫৪ খ্রী)—দাতা উক্ত দর্পনারায়ণ শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একাযোগে (...ভূমির পরিমাণ মোট ৮/ বিঘা)। সুতরাং বুঝা যায়, রামপ্রসাদ স্বগ্রামবাসী জমিদারদের নিকটই প্রথম ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের বহুস্থলে রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।"

এককালে সাবর্ণচৌধুরীদের জমিদারী বহু বিস্তৃত ছিল। নিমতা ও কুমারহট্ট একই জমিদারের অধীন। এই জমিদার বংশই প্রথমে কুমারহট্টে কবি রামপ্রসাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিদানের ৪।৫ বছর পূর্বেই এই দানকার্য ঘটে। তাঁদেরই প্রভাবে রামপ্রসাদ নিমতার কৃষ্ণরামের অনুসরণে বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন বলে মনে হয়।

একই জমিদারীর মধ্যে কৃষ্ণরামের রচনা অবশ্যই সুপ্রচলিত ছিল। কবি কৃষ্ণরাম তাঁর গ্রন্থের অন্যত্রও তাঁর স্বগ্রামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মনে হয়, তাঁদের কাছে পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিলেন, তবে গ্রন্থে তা উল্লিখিত হয় নি, সম্ভবতঃ তাঁদের নির্দেশে। 'চারসমাজের পতি' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া এই গ্রন্থের প্রকাশ্যে পৃষ্ঠপোষকতার সাহস কারু ছিল বলে মনে হয় না।

অনুরূপ কারণেই সম্ভবতঃ রামপ্রসাদও গ্রন্থে পৃষ্ঠপোষকের নামোল্লেখ করেন নি। আর কৃষ্ণচন্দ্র এই রচনার প্রেরণামূলে থাকলে অবশ্যই এতে তাঁর নাম থাকতো একাধিক বার এবং গ্রন্থের আদর্শ হত ভারতচন্দ্রীয়।

রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' উপাধিও এই সাবর্ণচৌধুরী জমিদারদেরই দেওয়া হতে পারে।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী। পৃ ৭

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সনদপত্রে উপাধির উল্লেখ নাই কিন্তু তা বলে উপাধিটি চৌধুরী জমিদারদের পূর্বে দেওয়া উপাধি হতে বাধা কি?

ভারতচন্দ্রকে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার পূর্বেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র "কবিগুণাকর" উপাধি দিয়েছেন। জমি দেন গ্রন্থ রচনার পরে। তাঁর পক্ষে একজন কবিকে উপাধি দিতে কালবিলম্ব ঘটার কোন কারণ থাকতে পারে না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপাধি বিতরণ একসময় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। বলা হত— "কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি নাহি থাকে যার, উপাধি বিষম ব্যাধি ঘাড়ে চাপে তার।"* 'কবিরঞ্জন' উপাধি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে দিলে তা অবশ্যই ভূমিদানের পূর্বে দিতেন এবং দানপত্রে তার উল্লেখ থাকতো।
অন্যদিকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি চৌধুরী জমিদারদের দেওয়া হলে তা তখন প্রচারিত ছিল না কিংবা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তা স্বীকার করেন নি। পরে 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের দ্বারাই উপাধিটি বহুল প্রচারিত হয়। গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুল্লেখ এবং কৃষ্ণরামধারার অনুসরণ এই ধারণাই সৃষ্টি করে।

কোন ব্যক্তিকে তাঁর গুণের জন্য কিংবা তখনকার দিনে বংশকৌলীন্যের জন্যও ভূমিদান করা হত। দেখা যাচ্ছে সাবর্ণ্যচৌধুরী জমিদারেরা দুবার রামপ্রসাদকে ভূমি দান করেন। একবার ১১৬০ সনে ৮ বিঘা ও পরে ১১৬৫ তে ২বিঘা জমি দেন। দীনেশবাবুর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে দেখা যায়, হালিসহরের সুভদ্রাদেবী রামপ্রসাদকে 'বসতি করিতে বৈদ্যত্তর মহাত্রাণ' হিসেবে ১ বিঘা পরিমাণ জমি দেন এবং তাও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বে। সাবর্ণ্য চৌধুরীরা অবশ্যই গুণের জন্য রামপ্রসাদকে দুবার ভূমি দেন এবং দুবারে ১০ বিঘার মত।

রামপ্রসাদের গুণ বলতে দুটি—সাধকত্ব ও কবিত্ব; এবং দুটিই সমতালে বিরাজ করতো। কবিত্বগুণের জন্য চৌধুরী জমিদারদের পক্ষে তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেওয়া বিচিত্র নয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বড় জমিদার, তাই একসঙ্গে ৫১ বিঘা (গুপ্ত কবি ১৪ বিঘা বলেছেন) জমি দিয়েছিলেন এবং দানপত্রে গ্রাম্য জমিদারপ্রদত্ত উপাধিটি স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

সম্ভবতঃ গ্রাম্য আশ্রয়দাতা এবং মহানুভব জমিদারের মনোরঞ্জনার্থেই সাধককবি রামপ্রসাদ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের পরে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটি লেখেন। জমিদারপ্রদত্ত উপাধির গৌরব ঘোষণা এর সবচেয়ে বড় কারণ হতে পারে।

---

* কলকাতার কথা—প্রমথনাথ মল্লিক, পৃ ২৮

বাংলা "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যধারা ও বর্ধমানের উল্লেখ

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বলরাম কবিশেখর-বিরচিত "কালিকামঙ্গল" গ্রন্থ চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বলরামকে রামপ্রসাদভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি বলেছেন এবং প্রাণরাম চক্রবর্তীর লেখায় তাঁর উল্লেখ না থাকার কারণ দেখিয়েছেন।

বলরামের রচনায় কোন রচনাকাল মেলেনি এবং এতে এমন কোন সমসাময়িক বিবরণ উল্লিখিত হয় নি যাতে একে প্রাচীনত্বে মণ্ডিত করা যায়। ভাষার প্রাচীনতার যুক্তি মোটেই জোরালো নয়। সব চেয়ে বড় কথা, প্রাণরাম চক্রবর্তীর লেখা বলে যা উল্লিখিত হয়েছে এবং নানাস্থলে হয়ে থাকে, তা প্রাণরামের লেখাই নয়। তা তাঁর গ্রন্থের সম্পাদক রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের রচনা। পূর্বে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রাণরাম চক্রবর্তী অনেক পূর্ববর্তী কবি।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যধারায় প্রাণরাম চক্রবর্তীর স্থান তৃতীয়। প্রথম দুজন হলেন দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খাঁ (এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য) এবং চতুর্থ জন হলেন কৃষ্ণরাম দাস।

'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী আসলে একটি বহুকাল প্রচলিত লৌকিক প্রণয় কাহিনী। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলতান হোসেন শাহ-র দরবারে সমাবিষ্ট উত্তর ভারতের মুসলমান কবিদের প্রভাবে এই কাহিনী রূপ লাভ করে। দ্বিজ শ্রীধর ছিলেন হোসেন শাহর নাতি ফিরুজ শাহর সভাসদ্।

প্রথমে এই কাব্যের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রাণরাম চক্রবর্তীই প্রথমে এতে ধর্মীয় ছাপ দিলেন। পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে এর রূপ প্রথম প্রকাশ পায় কৃষ্ণরাম দাসের রচনায় এবং তা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

কবি বিহ্লণের 'চৌরপঞ্চাশিকা' এবং বররুচি (বাঙ্গালী এবং সম্ভবতঃ খুবই অর্বাচীন। প্রচলিত বাংলা বিদ্যাসুন্দরেরই সংস্কৃত রূপান্তর বলে মনে হয়।) রচিত 'সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর' বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দম্' গ্রন্থ তো ছিলই। কৃষ্ণরাম নায়িকা ও রাজসম্ভাষণে জয়দেব ও বিহ্লণ উভয় কবির শ্লোকই নিয়েছেন।

বাংলা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে ভারতচন্দ্রের হাতে নতুন সংযোজন ঘটলো 'বর্ধমান' নামটি। পূর্বের কবি কৃষ্ণরাম বিদ্যার জন্মস্থান বীরসিংহপুর বলেছেন। ভারতচন্দ্রই প্রথম রাজা বীরসিংহের রাজধানীকে বীরসিংহপুর না বলে বর্ধমান বললেন এবং এতে একটা

ঐতিহাসিক ছাপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী সকল বিদ্যাসুন্দর রচয়িতাই 'বর্ধমান' নাম গ্রহণ করেছেন এবং এই বর্ধমানের উল্লেখই গ্রন্থকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বের, না তাঁর পরবর্তী সুনিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করে দেয়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমাকীর্তনে নিয়োজিত। এর প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণনগরের বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের জন্ম ও তাঁর গৃহে লক্ষ্মীর আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের সূচনায় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সাহায্যকারীরূপে সেনাপতি মানসিংহের পাশে ভবানন্দ মজুমদারকে দেখা গেল। প্রতাপাদিত্যকে জয় করার জন্য যশোর যাওয়ার পথে ভবানন্দসহ মানসিংহ এবং মানসিংহের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য বর্ধমানের পরিচয় দান করতে গিয়ে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অবতারণা। বিদ্যার পিতা বীরসিংহের অবর্তমানে তাঁর পুত্র রাজা ধীরসিংহের সঙ্গে মানসিংহের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এসবই ১৬০৬-৭ খৃষ্টাব্দের কথা হয়ে পড়ে।

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয়খণ্ডে রাজা মানসিংহের সাহায্যে ভবানন্দের রাজত্বলাভ, পারিবারিক জীবনকাহিনী ও শেষে মুক্তিলাভ বর্ণিত হয়েছে।

সাহিত্য একাদেমী প্রকাশিত (১৯৬১) ডঃ মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্র' গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে, কৃষ্ণনগর রাজবংশের মূল দলিল (১৬০৬-১৬১৩ খৃষ্টাব্দ) দুখানিতে ভবানন্দের মানসিংহকে সাহায্যের কোন উল্লেখ নাই।

কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রথমদিককার দুখানি ইতিহাস গ্রন্থ হল—"ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্" এবং "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং"।

প্রথম গ্রন্থখানি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে তাঁর সভার পণ্ডিতদের দিয়ে লেখান।* এই গ্রন্থের একটি ইংরেজি অনুবাদ (অনুবাদক W. Pertsch) ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে ভবানন্দ মজুমদারের রাজা মানসিংহকে রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সংগ্রামে সাহায্যের উল্লেখ আছে। এই সাহায্যের বিনিময়ে তাঁর রাজত্বলাভের কথাও এতে আছে। কিন্তু এতে বর্ধমান বা বিদ্যাসুন্দরের কোন উল্লেখ নাই।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং গ্রন্থখানির প্রণেতা রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত ছিলেন। গ্রন্থটি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত।

এই গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগের কাহিনী যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনি এতে বিদ্যাসুন্দরেরও উল্লেখ রয়েছে। এখানেও বীরসিংহের পুত্র ধীরসিংহের

* নবদ্বীপমহিমা—কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী—পৃঃ ২৯৫।

সঙ্গে পরিচয়, মানসিংহের বর্ধমান ভ্রমণ, সুড়ঙ্গদর্শন প্রভৃতি আছে। কিন্তু বিস্তার কাহিনী বলতে গিয়েই লেখক ভবানন্দকে দিয়ে মানসিংহের হাতে একখানি 'চোর পঞ্চাশত' গ্রন্থ ধরিয়ে দিয়েছেন এবং তাতেই সব আছে বলেছেন। সুতরাং রাজীবলোচনের উৎস যে ভারতচন্দ্র তা নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং বিবৃতির হাস্যকর ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিও চোখে পড়ে।

'The Travels of a Hindu' গ্রন্থ প্রণেতা ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ট্রেনে চড়ে বর্ধমান যান, তাঁর উত্তরভারত ভ্রমণের প্রথম পর্ব হিসেবে। তাঁর গ্রন্থে 'বিদ্যাসুন্দর' প্রসঙ্গে কৌতুককর অনেক সংবাদ আছে। বিদ্যাসুন্দরচিহ্নিত স্থানগুলি বর্ধমানে তখন বিশেষ বিখ্যাত এবং খুব উৎসাহ ভরে বিদেশীকে তা দেখিয়ে দেওয়া হতো।

অন্তরে অবিশ্বাস অথচ কৌতূহল নিয়ে ভোলানাথ চন্দ্র সব দেখে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবতঃ তাঁর হাতেই সর্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দরের আধুনিকোচিত সমালোচনার স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর। পাঠককে এ প্রসঙ্গ এবং আরও অনেক মূল্যবান প্রসঙ্গের জন্য দুখণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এখানে শুধু বর্ধমানে বিদ্যাসুন্দরের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাঁর সুন্দর মন্তব্যটি তুলে দিচ্ছি—

"No decisive conclusion can be arrived at as to the truth or fictitiousness of Bharatchunders' tale—"much may be said on both sides of the question." But to save trouble grant that Biddya was a character of historic authenticity. Her epoch, then may be fixed somewhere between the 8th and 11th centuries—a period tallying with that during which the Chola princes held a powerful sovereignty in Southern India, and had their capital at Kanchipoor or modern Conjevaram whence Soondra came. There was in that age a considerable intercourse between Coromandal coast and the Gangetic valley. It is mentioned in the Periplus that "large vessels crossed the Bay of Bengal to the mouth of the Ganges." In the days of Asoca, Voyages were made across the Bay from Ceylon in seven days—such as the modern mail streamers perform now. Soondra may have come up in a clipper vessel of his time—there is at least some truth in the speed of his journey. Beersingh may have belonged to a collateral branch of the ancient Gunga Vansa Rajas. The neighbouring Rajah of Bishenpoor traces back his ancestry for a thousand years." (পৃঃ ১৫৬, প্রথম খণ্ড)।

এই গ্রন্থের ১৫৮ পৃষ্ঠায় ভোলানাথ চন্দ্র সবচেয়ে কৌতুককর সংবাদটি দিয়েছেন—
"Though without any relationship with the preceding line, the present family, it is told, long smarted under Bharatchandra's keen

and brilliant satire. It was strictly forbidden for many years to be enacted on a festival in any part of their Rajdom."

বিদ্যাসুন্দর উল্লিখিত ভবানন্দ সম্পর্কে ঘটনাটি ১৬০৬/৭ খৃষ্টাব্দের পরে ঘটতে পারে না। অথচ বর্ধমানের বর্তমান রাজবংশের প্রথম পত্তন ঘটে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে।

এই বংশের চিত্রসেন রায় (১৭৪০-৪৪ খৃষ্টাব্দ) প্রথম রাজা উপাধি পান। তাঁর পরে তাঁর ভাইপো তিলক চাঁদ রায় ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হন এবং তিনি প্রথম মহারাজাধিরাজবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন।

এই বংশের চারজন উত্তরাধিকারী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। এঁরা হলেন কীর্তিচন্দ্র রায় (১৭০২-৪০), চিত্রসেন রায় (১৭৪০-৪৪), তিলকচাঁদ রায় (১৭৪৪-৭১), তেজচন্দ্র (১৭৭১-১৮৩২)।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার রাজতক্ত পান। তাঁর রাজ্যের জৌলুষ ছিল ঠিকই, কিন্তু বীরত্বশূন্য। বারবার সুবেদারদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে এই বংশের নৃপতিরা কিছুটা শঙ্কিত হয়ে সুবেদারের রুষ্ট সতর্কদৃষ্টির মধ্যে বাস করছিলেন।

অন্যদিকে সম্রাটপুত্র আজিমউস্মানের বন্ধুত্ব ও কৃপাধন্য ছিল বর্ধমান রাজপরিবার। কীর্তিচন্দ্র বীরবিক্রমে একের পর এক জমিদারী দখল করতে থাকেন। ছাতুয়া, ভুরসুট বার্দা, মনোহরশাহী, চন্দ্রকোণা, বলডাঙ্গা একের পর এক দখল করলেন মুর্শিদাবাদের নবাবদের চোখের সামনে, অথচ কেউ কিছু বললেন না।

অপর দিকে নদীয়া রাজবংশের সব পূর্বপুরুষই শুধু দীর্ঘদিন ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের কারাগারে কাটিয়ে গেলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও এ দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রেহাই পান নি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বভাবতঃই বর্ধমানরাজসৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। সম্পদে প্রতাপে বর্ধমান রাজ্যের কাছে নদীয়ারাজ্য অনেক ছোট ছিল।

অত্যন্ত অহমিকা ও প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষার অধিকারী বলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সকল ঐতিহাসিকই চিহ্নিত করেছেন। তিনি নদীয়া, কুমারহট্ট, শান্তিপুর ও ভাটপাড়া এই চার সমাজের সমাজপতি ছিলেন। সামাজিক সকল মীমাংসাকর্মেই তিনি নেতৃত্ব করতেন, অবশ্য বড় বড় পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে। তিনি অগ্নিহোত্র, বাজপেয়ী যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। প্রচুর দান ছিল তাঁর। এক সময় বলা হত, যে ব্রাহ্মণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দান পায় নি সে ব্রাহ্মণই নয়। তার সভা বড় বড় পণ্ডিতরা অলঙ্কৃত করতেন। তিনি শিকার ও সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এরকম নানাবিধ গুণে তিনি গুণী ও সকলের মান্য ছিলেন।

তাঁর সভাকবি বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার কিছুকালের জন্য বর্ধমানরাজ চিত্রসেন রায়ের সভা আশ্রয় করেন এবং সেখানেই তিনি "চিত্রচম্পূ" নামে একটি সংস্কৃত কাব্য রচনা

(১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) করে বর্গীর হাঙ্গামার পরিচয় দেন। শোনা যায় বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার কলকাতায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আপত্তি সত্ত্বেও শূদ্রের দান গ্রহণ করেন এবং এতেই মহারাজ রুষ্ট হয়ে তাঁকে ত্যাগ করেন। কিন্তু বর্ধমানরাজ সঙ্গেসঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেন। ঘটনাটি দুই রাজবংশের রেষারেষির পরিচয় দেয়।

বাণেশ্বর অবশ্য পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ফিরে আসেন এবং শেষে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের সভা অলঙ্কৃত করেন।

পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্পর্বে যখন একদিকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছেন, সেই সময় দেখা গেল ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজ তিলকচাঁদ তাঁর রাজ্যসীমার মধ্যে ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন। (Alivardi and His times পৃ ১৬৯)। দুই রাজার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এবং বন্ধুবিভাগের পরিচয় এর থেকে পাওয়া যায়।

ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর ভ্রমণকালে স্পষ্টভাষায় বলেছেন—"Rajah Krisnachandra was a great rival of the Rajah of Burdwan, and is said to have set Bharat Chandra to level the poem as a squib against his adversary."

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশধর উমাচরণ ভট্টাচার্যের লেখা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনীতে (১৮৮০ খৃঃ তে প্রকাশিত) এই দুই রাজপরিবারের তিক্ত সম্পর্কের কিছু বিবরণ আছে। জগন্নাথের ওপর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রুষ্ট ছিলেন, কারণ তিনি প্রথমেই বর্ধমানরাজের আশ্রয়গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমাজপতিত্বের যে ইঙ্গিতটুকু আছে তা রাজার প্রশংসাসূচক নয়। উমাচরণ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অসাধারণ গুণগ্রাহিতা, কাব্যানুরাগ, বিদ্যোৎসাহ এবং দাতৃত্ব প্রভৃতি মহৎগুণে তাৎকালিক ভূম্যধিকারীগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দম্ভাহঙ্কারের আতিশয্যনিবন্ধন তাঁহার দ্বারা অনেক অসঙ্গত কার্যও হইত।............ কোন ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত কিংবা জাতিচ্যুত ব্যক্তির সমন্বয় করা কেবল তাঁহারই আয়ত্ত ছিল। এই ক্ষমতাপ্রভাবে রাজার যথেষ্ট ধনাগম হইত; আশানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত না হইলে সমাজচ্যুত লোকের সমন্বয়ের অনুমতি দিতেন না।"

রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের বর্ধমানরাজবিদ্বেষের মূলে ছিল ঈর্ষা ও অক্ষমতা এবং ভারতচন্দ্রের ছিল প্রচণ্ড অপমানবোধ। দুয়ে গঙ্গাযমুনা সঙ্গম ঘটেছিল।

যৌবনের প্রারম্ভে ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতচন্দ্রকে অন্যায়ভাবে কিছুকাল বর্ধমানরাজকারাগারে অবস্থান করতে হয়েছিল।* এর পর তিনি একরকম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন।

* ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত রচিত কবিজীবনী—পৃঃ ১৩(ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত)

উড়িষ্যায় পলায়ন আত্মরক্ষার জন্য হতে পারে, কিন্তু যে ভারতচন্দ্র কৈশোরপ্রারম্ভে অনায়াসে দুখানি উৎকৃষ্ট সত্যনারায়ণ পাঁচালি লিখতে পেরেছিলেন, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, যৌবনে পা দিয়েই, তাঁকে জীবনসংগ্রামে দীর্ঘদিন পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল, বর্ধমানরাজের নির্দয় দণ্ডের জন্য।

বেশ বয়সকালে সুপারিশ ধরে তাঁকে কৃষ্ণনগররাজের আশ্রয়ছায়ায় আসতে হয়েছিল এবং রাজার মনোরঞ্জনের জন্য কাব্য রচনা করে জীবিকাসংস্থান করতে হয়েছিল। তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ যে ঘটতে পায় নি, তা এই বিলম্ব ও বাধার জন্যই। ভারতচন্দ্রের মনে এ ক্ষোভ নিশ্চয়ই গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে রেখেছিল।

(অতি শিশুকালে কীর্তিচন্দ্ররায়ের ভুরসুট অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের পিতৃরাজ্য দখলের ঘটনাটিও এক্ষেত্রে স্মরণীয়)।

অক্ষমের ঈর্ষার সঙ্গে নিজের অপমানের ও দুর্ভাগ্যের জ্বালা মিশিয়ে তিনি সুন্দরকে স্থাপন করলেন বর্ধমান রাজপ্রাসাদের সুড়ঙ্গে। কাব্যের সুন্দর কালীর কৃপায় সুড়ঙ্গ থেকে ত্রাণ পেয়ে গেল, কিন্তু সাহিত্যইতিহাসে প্রাসাদসুড়ঙ্গের দাগ চির অক্ষয় হয়ে রইল। কেউ ইতিহাস উল্টে দেখলে না যে বীরসিংহের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য হলেও বর্ধমানের বর্তমান রাজবংশের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নাই। সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং অযৌক্তিক একটি কলঙ্কের দাগ মাথায় নিয়ে বর্ধমানরাজ্য সীমার মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর গান নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কৃষ্ণচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র আপনাদের অন্তরের জ্বালায় কিছুটা শান্তিবারি ছিটোবার সুযোগ পেয়ে গেলেন।*

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও তাঁর পারিবারিক পরিচয়

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলের ভূমিকায় লিখেছেন, "ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ-কৃত বিদ্যাসুন্দরের রতিসুখভোগের দীর্ঘ ও অশ্লীলতাপূর্ণ বর্ণনা বর্তমানে সাধারণের নিকট তেমন সুরুচিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।"

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে মন্তব্যটি সত্য হতে পারে, কিন্তু রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। দুটি গ্রন্থ পাশাপাশি রেখে পড়লেই তা সহজে বোঝা যায়। রামপ্রসাদ সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণরাম দাসকে অনুসরণ করেছেন। শুধু রাজঅন্তঃপুরে মিলনের পূর্বে স্নানের ঘাটে নায়কনায়িকার সাক্ষাৎ করানোর ব্যাপারটি রামপ্রসাদে অতিরিক্ত।

* এখানে বিবেচ্য কৃষ্ণচন্দ্রের সমর্থন না থাকলে ভারতচন্দ্র কখনই বর্ধমানের উল্লেখ করতে পারতেন না।

কৃষ্ণরাম দাসে বৈষ্ণবভাবের অংশ বেশি, কিন্তু রামপ্রসাদে শাক্তভাবের প্রাধান্য। উভয়ের কাহিনীগত সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশি। উভয়েই মঙ্গলকাব্যের ছাঁচ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের কাব্যকে। শাপভ্রষ্ট স্বর্গের দেবদেবীদের নিয়ে উভয়ের নায়ক নায়িকা মর্তে এসেছে এবং গ্রন্থশেষে পূজা প্রচারের পর স্বর্গে ফিরে গেছে।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য তাঁর রচনারাজির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী করতে পারে। এই কাব্যেই কবি তাঁর বংশ ও পারিবারিক পরিচয়াদি দিয়েছেন। তাঁর তান্ত্রিক সাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয়ও এই গ্রন্থে রয়েছে। রামপ্রসাদ তাঁর বংশের পরিচয় এই ভাবে দিয়েছেন—

ধনবন্ত মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্টশান্ত গুণানন্ত
প্রসন্ন কালিকা কৃপাময়ী ॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত ধীর সর্ব্বগুণযুত
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিবেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

কবির পিতা রামরাম এবং পিতামহ রামেশ্বর। বংশ বিশেষ গৌরবান্বিত ছিল একসময়। গ্রন্থে কবির দুই কন্যা ও এক পুত্রের উল্লেখ আছে। পুত্র রামদুলালের নাম অন্ততঃ সাতবার ভণিতায় উল্লিখিত হয়েছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা পরমেশ্বরী ও কনিষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরীর একবার করে ভণিতায় উল্লেখ পাই। তাছাড়া ভাই বিশ্বনাথের নামও একবার ভণিতায় আছে। গ্রন্থের শেষের দিকে পারিবারিক পরিচয় বিস্তৃতভাবে আছে—

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী।
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি ॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমারে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম ॥

সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদচ্ছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জন মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মা গো দেহ পদধূলি॥

পিতার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহের সন্তান অম্বিকা দেবী জ্যেষ্ঠা, তারপর ভবানীদেবী, তারপর দু ভাই রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ। বৈমাত্রেয় ভাই নিধিরাম। কবির দ্বিতীয় পুত্র ও সর্বকনিষ্ঠ সন্তান রামমোহন এখনও জন্মান নি।

দুই ভগিনীর মধ্যে ভবানীদেবী মনে হয় সুখে প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর নামোচ্চারণে কবির কৃতজ্ঞতাবিগলিত কণ্ঠস্বরের আভাষ পাই। তবে কি কলকাতায় এই ভগিনীর গৃহেই তিনি থাকতেন চাকরী করার কালে?

কবির স্বাভাবিক স্নেহময় স্বভাবের জন্যও মন্তব্যগুলি এরূপ কমনীয় রূপ ধারণ করতে পারে। সর্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী অম্বিকা দেবীর বোধহয় দারিদ্র্যের সংসার, তাই তাঁর জন্য দেবীর কৃপাভিক্ষা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন" গ্রন্থের ৬-৭ পৃষ্ঠা থেকে 'চন্দ্রপ্রভা' ও 'রত্নপ্রভা' নামক সুবিখ্যাত বৈদ্যকুলপঞ্জী অনুসারে বিবৃত প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে দিচ্ছি—

"রাঢ়-বঙ্গের সর্বত্র ধন্বন্তরিগোত্র বীজী পুরুষ বিনায়ক সেনের বংশ সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইত। বিনায়কের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ কৃত্তিবাস (বিনায়ক-রোষ-নারায়ণ-সাণ্ডু-সরণ-কৃত্তিবাসঃ)। কৃত্তিবাসের পুত্রেরা আদি স্থান রাঢ়ান্তর্গত মালঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া 'ধলহণ্ডগোষ্ঠীং সমাশ্রিতাঃ,' তদবধি মালঞ্চের পরেই ধলহণ্ডে সেনবংশের একটি প্রসিদ্ধ সমাজ গড়িয়া উঠে। রামপ্রসাদ সুতরাং কৃত্তিবাসকেই আদি পুরুষ ধরিয়াছেন। রামপ্রসাদের পিতামহ রামেশ্বরের নাম ভরত মল্লিক উল্লেখ করিয়াছেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৫৫ রত্নপ্রভা পৃঃ ২১)—তিনি ছিলেন কৃত্তিবাসের অধস্তন নবম পুরুষ (কৃত্তিবাস—রত্নাকর—নিত্যানন্দ—জগন্নাথ—যদুনন্দন—রঞ্জন—রাজীবলোচন—জয়কৃষ্ণ—রামেশ্বর)। বিনায়ক হইতে রামেশ্বর পর্যন্ত ১৪ পুরুষের পারিবারিক বিবরণ ভরত মল্লিক যথাযথ লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন—এই সকল সমৃদ্ধ উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে রামপ্রসাদের উক্তির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ভরত মল্লিকের লেখা হইতে জানা যায় রামেশ্বরের পিতার আমল হইতে বংশে দৈন্যদশা উপস্থিত হইয়াছিল। 'দুর্দৈবদৈন্যতঃ' রামেশ্বরের সহোদরা ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল 'কুমারহট্টবাসী' জগদীশ দাসের সহিত এবং অনুমান হয় তৎসূত্রে রামেশ্বরই প্রথম কুমারহট্টে বাস স্থাপন করেন। কুমারহট্ট সপ্তগ্রাম সমাজের অন্তর্গত। মূল রাঢ়ীয় সমাজের কুলীনেরা অনেকে 'ধলগুীয়' সেনবংশকে নিষ্কুল বলিয়া লিখিয়াছেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ১৩, রত্নপ্রভা, পৃঃ ৩), কিন্তু ভরত মল্লিক স্বয়ং তাহা স্বীকার করেন নাই।"

গ্রন্থে কবি একবার স্বগ্রামের পরিচয় দিয়েছেন—

ধরাতলে ধন্য কুমারহট্ট-গ্রাম।
তন্মধ্যে সিদ্ধপীঠ্ রামকৃষ্ণধাম ॥*
শ্রীমণ্ডপজাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা ॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা ॥ **

হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে কবির বাসস্থান। রামকৃষ্ণ নামে কোনও তান্ত্রিক সাধকের সিদ্ধিস্থান হওয়ায় রামকৃষ্ণধামরূপেও গ্রামটিকে অভিহিত করা যায়।

---

* রামকৃষ্ণধাম—"যে স্থান হইতে মহাপ্রভু মৃত্তিকা তুলিয়াছিলেন; বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে রাম (বলরাম) বলিয়া জানেন। সম্ভবতঃ তৎপরবর্তী বৈষ্ণবগণ ঐ স্থানকে এবং পরে কুমারহট্ট নগরকে "রামকৃষ্ণধাম" বলিয়া কহিতেন। রামপ্রসাদ মহাপ্রভুর বহু পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে রামকৃষ্ণধামে সাধনা করিলে সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, এই আশায় 'সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধামে' সাধন ভজন করিয়া ইষ্ট দেবীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন"—শ্রীসজ্জনতোষিণী পত্রিকা। ৭ম খণ্ড ৭ম সংখ্যা।

'রামকৃষ্ণধাম' মনে হয়, রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত কোন তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষের সিদ্ধ আসন। এখানে প্রথমে রামপ্রসাদ সাধনা করতেন সিদ্ধির আশায়, কিন্তু সে সিদ্ধি যে তাঁর তখন ঘটে নি, তাঁর এখানকার উক্তিতেই তাঁর প্রমাণ আছে। সাধক রামকৃষ্ণ বা তাঁর আসনের কোন সন্ধান মেলে নি।

** পদাবলীর মধ্যে কেবল এক জায়গায় কবি স্বগ্রামের উল্লেখ করেছেন। যে পদটির সূচনা 'কি ভয় দেখাও। আমি যাব কাশীনাথের কাশী ॥'—তারই শেষাংশ—

গ্রামের তান্ত্রিক ঐতিহ্য ঘোষণা এখানে সুস্পষ্ট। কবি নিজেও এখানে রাত্রিতে 'শৈলেশ পুত্রী'র সাধনায় প্রচুর চরিতার্থতা লাভ করেন। কিন্তু সিদ্ধিলাভ কি তিনি করেছিলেন? এ বিষয়ে ব্যর্থতার ইঙ্গিতই কবি দিয়েছেন। তবে এটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করে ধরা যায়, কবি তখনও ব্যাকুল আগ্রহে সাধনা করে যাচ্ছেন, ফললাভ হয় নি। কবিপত্নী কিন্তু এক হিসেবে অধিকতর ভাগ্যবতী। দেবী তাঁকেই গ্রন্থরচনার জন্য আদেশ করেন এবং সেকথা গৌরব ও আক্ষেপের সঙ্গে কবি বহুবার ঘোষণা করেছেন।—

ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥
অষ্টরসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম।
পরম রহস্য কথা শুন গুণসদ্ম॥

কৃষ্ণরাম নিজেই স্বপ্নাদেশ পান। রামপ্রসাদের স্ত্রী স্বপ্নাদেশ পেলেন। ভারতচন্দ্রের নতুন করে স্বপ্নাদেশের প্রয়োজন হয় নাই কারণ তাঁর "বিদ্যাসুন্দর" অন্নদামঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড। তাছাড়া ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে গ্রন্থ রচনা করেন।

কাঞ্চীপুর থেকে বর্ধমান বা বীরসিংহপুর গমনপথের বর্ণনা রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরামে একরূপ। দেবী দ্বারা পরীক্ষিত উভয়ের নায়কই। নগরবর্ণনায় পরিপক্কতা রামপ্রসাদে বেশি, কারণ তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতা বেশি। কৃষ্ণরাম মাত্র কুড়ি বছর বয়সে গ্রন্থরচনা করেন।

পরবর্তী সব বর্ণনাই প্রায় একরূপ, সামান্য একটু ইতরবিশেষ আছে। নায়ক নায়িকার যোগাযোগের বর্ণনা একরকম। উভয় গ্রন্থেই একবার মাত্র বিহার ও বিপরীত বিহার এবং একই রাত্রিতে। যেন নিয়মরক্ষা করার জন্যই বিহার বর্ণনা। কামশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণের ব্যাপারটিও গতানুগতিক।

ভারতচন্দ্রে এই অংশগুলি সর্বপ্রকার শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে গেছে। নানাভাবে এবং নানা সময়ে চতুর কবির রতিক্রিয়ার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। সুন্দরের সন্ন্যাসী সেজে মজা করার চিত্রও ভারতচন্দ্রেই শুধু আছে।

হালিসহর পরগণায় কত,
কুমারহট্ট গ্রামবাসী।
সে যে রামপ্রসাদ কিঙ্কর,
ভদ্রকালী পদ-অভিমানী॥

চোর ধরার বর্ণনাও কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদে এক। শুধু কৃষ্ণরামের মালিনী বিমলা ও রামপ্রসাদের মালিনী হীরা। কৃষ্ণরামের কলাবতী ব্রাহ্মণী রামপ্রসাদে বিদুবামনীতে পরিণত হয়েছে। চোর ধরার প্রক্রিয়া ভারতচন্দ্রে স্বতন্ত্র এবং অভিনব।

বিদ্যার গর্ভজাত পুত্রের নাম রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরাম উভয়ের গ্রন্থেই পদ্মনাভ। সুন্দর কান্নাকাটি করে উভয় গ্রন্থেই পিতামাতাকে স্মরণ করে বাড়ি ফেরার জন্য।

ভারতচন্দ্রে সুন্দরের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটেছে। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদে তারপর কাহিনী দীর্ঘতর মঙ্গলকাব্যিক রূপ নিয়েছে। রামপ্রসাদ তাঁর তান্ত্রিক অভিজ্ঞতার দীর্ঘ স্বাক্ষর এখানে রেখেছেন। রামপ্রসাদের নায়ক নায়িকা উভয়েই অকৃত্রিম কালীভক্ত। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—"ভারতচন্দ্র তাঁহার নায়কনায়িকাকে কেবল রিপুর দাসদাসী করিয়া সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কবিরঞ্জন উভয়কে ভক্তির জীবন্ত প্রতিমা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক কথায় ভারতচন্দ্র প্রসাদগুণপ্রধান আর কবিরঞ্জন ভক্তিরসপ্রধান। ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, শব্দ যোজনায় ভারতের কাব্য অতুলনীয়, আর ভাবে, চরিত্রচিত্রণে ও বর্ণনার গভীরতায় কবিরঞ্জন লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ।"*

এ প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণীয়—"ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে শিল্পচাতুর্যে এবং ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইলেও চরিত্রচিত্রণে অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদের ভূমিকাগুলি যথাসম্ভব স্বাভাবিক, আর ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্র সবই টাইপ ধরণের অথবা ব্যঙ্গবিকৃত। এইজন্য সাধারণ পাঠকের কাছে ভারতচন্দ্রের রচনার তুলনায় রামপ্রসাদের রচনা নিষ্প্রভ মনে হয়। তবে রামপ্রসাদের কাব্যে একটি বড় গুণ আছে যাহা ভারতচন্দ্রে তেমন নাই—ঘরোয়া ভাবের প্রকাশ।"**

রামপ্রসাদের গ্রন্থে ভাষা প্রধানতঃ সরল। কিন্তু সংস্কৃত, পার্সী ও হিন্দীর ব্যবহারও জানতেন। রামপ্রসাদের পার্সীজ্ঞান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য রয়েছে—"mastered Persian within a short time through the help of a Maulavi. The Chapter on "Madhava Bhat's Journey to Kanchipura" in his "Vidyasoundara" gives us some idea of his proficiency in Persian and Urdu."***

রামপ্রসাদের ভাষার সারল্য কিন্তু ভারতচন্দ্রের প্রসাদগুণমণ্ডিত ভাষার কাছে হীনপ্রভ। ভারতচন্দ্রের কাব্যের অশ্লীলতা দোষটুকু বাদ দিলে শিল্পগুণের তুলনা হয় না। কবিচাতুর্য, ভাষার তীক্ষ্ণতা, ছন্দের বৈচিত্র্য, প্রকাশের স্পষ্টতা সব ক্ষেত্রেই ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ।

* বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০

রামপ্রসাদের গ্রন্থ প্রসারসৌভাগ্য লাভ করে নি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের নানা আকর্ষণীয় গুণের জন্যই।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরে'র দু জায়গার বর্ণনায় বিশেষভাবে মনে দাগ কাটে। কোটালের চরেদের চোর অন্বেষণে ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণের বর্ণনায় তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় কদাচারের কিছু কিছু বাস্তবচিত্র পাওয়া যায়। এই বর্ণনায় রামপ্রসাদের বৈষ্ণব-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন। রামপ্রসাদের সাধনঔদার্যের কথা ভাবলে এ অভিযোগ টেকে না।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হল, কোটালের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার বর্ণনা। এখানে কৌতুক ও গুজবপ্রিয় বাঙালীর একটি জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে।

কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থ রামপ্রসাদের গ্রন্থের পাশে নিষ্প্রভ হলেও প্রাচীনত্বের জন্য তার প্রচারসৌভাগ্য কিছুটা বেশি। W. Ward সাহেব The Hindoos গ্রন্থের ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম শ্রীরামপুর সংস্করণে দেশীয় কবিদের উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন, "The Kalika Mangulu by Krishnu Ramu, a Shoodru." (১ম খণ্ড, পৃ ৫৭৯) রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর" নামে প্রথম ছাপা হয় ১২৬০ সালের ২০ চৈত্র। কবির দেওয়া নাম কি ছিল জানার উপায় নাই। গ্রন্থে পঁয়তাল্লিশ বার ভণিতায় কবিরঞ্জন উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসাদ, রামপ্রসাদ, শ্রীরামপ্রসাদ ভণিতাও বহুবার আছে, 'কবিরঞ্জনে'র থেকে বেশিই হবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগ ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় (১৪ পৃষ্ঠাতে) বলা হয়েছে—"বর্ধমানের রাজপরিবারের সহিত তাঁহার (ভারতচন্দ্রের) বিরোধের কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আছে, ভারতচন্দ্র প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উক্ত রাজপরিবারকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য এই কার্য করিয়াছেন—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়, বরঞ্চ ইহার সপক্ষে এই ধরণের একটি জনশ্রুতিও আছে।"

এই ভূমিকায় আরও আছে—"ভারতচন্দ্রের কাব্যরচনার অব্যবহিত পরেই রামপ্রসাদ তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন। বর্ধমান, হীরা ও শুকপক্ষী ভারতচন্দ্রের নিজস্ব তিনি এগুলি কাহারও নিকট ধার করেন নাই। কবিশেখর বলরামের কাব্য অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন রচনা।"

বাংলাদেশে সংস্কৃতে বররুচি রচিত 'বিদ্যাসুন্দর', 'বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানম্' নামে অপর একটি কাব্য এবং 'চৌরপঞ্চাশৎ' দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এবং কবিকুলের সঙ্গে পরিচয়যুক্ত। কৃষ্ণরাম দাস বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আবিষ্কর্তা নন এবং ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ যে তাঁর

দ্বারা প্রভাবিত হন তাও নিশ্চিত। তিনজন কবিই সংস্কৃতে প্রচলিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং শ্লোকাদি তাদের থেকে গ্রহণ করেন।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে (আষাঢ়) দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের পরিচয়দান প্রসঙ্গে একটি নতুন সংবাদ দিয়েছেন। তিনি গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় (২য় সংস্করণ) লিখেছেন— "বিদ্যার পিতৃগৃহ বর্ধমানে স্থাপন করাও ভারতচন্দ্রের কল্পনা নহে। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের একটি প্রাচীনতর প্রতিরূপে আমরা উভয়ই (অর্থাৎ বামচরণে সুন্দরের খন্দক পার হওয়া এবং বিদ্যার বিছানায় সিন্দুর লেপন) আবিষ্কার করিয়াছি। গুপ্তিপাড়া নিবাসী 'চন্দ্রচূড় ব্রহ্মচারী' ১৬২৭ শকাব্দের মাঘমাসে (=১৭০৬ খৃঃ) "কালীপক্ষীয়া বিদ্যাসুন্দর কাব্যটীকা রচনা করেন। (সা-প-প, ৫৮, পৃঃ ১৬)।" দীনেশবাবু নিজেই শেষে বলেছেন "বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানের এই অভিনব 'নাটকানুবন্ধ' সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেও ইহার আকর বোধহয় বাঙ্গালা নাটক।"

এখানে স্মরণীয়, ১৬৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থে বাঁ পায়ে 'খন্দক' পার হওয়ার ঘটনা আছে। দীনেশবাবু আবিষ্কৃত গ্রন্থের ৩০।৩২ বছর আগে লেখা কৃষ্ণরামের গ্রন্থ। রামপ্রসাদ সিন্দুরলেপন কার্যের অনুষ্ঠান করেন কৃষ্ণরাম দাসের অনুসরণে। ভারতচন্দ্র সিন্দুরলেপনের ধার দিয়েই যান নি আর খন্দক পার হওয়ার ব্যাপারে এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীনির্মাণে তিনিও কৃষ্ণরামদ্বারা প্রভাবিত। কৃষ্ণরামের গ্রন্থ যে দীনেশবাবু পড়েন নাই, তা বোঝা যায়, ভারতচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদের গ্রন্থের দীর্ঘ তুলনামূলক আলোচনা থেকে। কৃষ্ণরামের সঙ্গেই রামপ্রসাদের সর্ববিষয়ে ঘনিষ্ঠ মিল, অথচ কৃষ্ণরামের নাম একবারও উল্লিখিত হল না।

দীনেশবাবু আবিষ্কৃত 'চন্দ্রচূড়ে'র গ্রন্থ সংস্কৃতে লেখা এবং এত দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃত থাকাই প্রমাণ করছে এ গ্রন্থের প্রচার একেবারে ছিল না এবং ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ কেউই তা পড়েন নাই।

কৃষ্ণরাম দাস পর্যন্ত 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' রচয়িতারা বিদ্যার পিতৃগৃহকে বীরসিংহ রাজার রাজধানী বলেই 'বীরসিংহপুর' বলে অভিহিত করেছেন, নগরের কোন বিশেষ নাম দেন নি। ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে মানসিংহের প্রতাপাদিত্য অভিযানে যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পরিবারের এক পূর্বপুরুষকে বর্ধমান রাজবংশের এক কলঙ্কজনক ঘটনার সাক্ষ্যস্বরূপ খাড়া করার ব্যাপারটি ভারতচন্দ্রেরই স্বকপোলকল্পিত এবং বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। 'চন্দ্রচূড়ে'র লেখা দেখে ভারতচন্দ্র 'বর্ধমান' নামের ব্যবহার করেন নি।

১৬৬৬-৭ খৃষ্টাব্দে রচিত প্রাণরাম চক্রবর্তীর বিদ্যাসুন্দর কাব্য কৃষ্ণরামের প্রায়

১০ বছর আগের রচনা। প্রাণরামের হাতেই প্রথম 'বিদ্যাসুন্দর' প্রণয়কাব্য 'কালিকামঙ্গল' ছাঁচ পেয়ে মঙ্গলকাব্য শ্রেণীতে উন্নীত হয়। তবে তাঁর কাব্য বিশেষভাবে খণ্ডিত। তাই এই গ্রন্থের প্রথম সার্থক মঙ্গলকাব্যিক রূপ পাওয়া গেল কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গলে'। লক্ষণীয় কৃষ্ণরামের কাব্যেরই নাম কালিকামঙ্গল। W. Ward সাহেবও এর নাম উল্লেখ করেছেন। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরও প্রকৃতপক্ষে 'কালিকামঙ্গল' কাব্য। তাঁর কাব্যের ভক্তিভাবের দিকটিই প্রধানভাবে লক্ষণীয়। সাধককবির হাতে এমনিই হওয়া সঙ্গত।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরে'র সূচনায় দেবদেবীর বন্দনার পর "জাগরণারম্ভ" বলে গ্রন্থারম্ভ হয়েছে। সমাপ্তিতে 'অষ্টমঙ্গলা'য় আটটি পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আটটির শেষ কাহিনীর নায়কনায়িকারূপে বিদ্যাসুন্দরের নায়কনায়িকার নাম পাওয়া যায়। এর জন্য বিশ্বকোষপ্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু রামপ্রসাদকে আটটি পালার রচয়িতা বলে অনুমান করেন। তবে আরও সাতটি পালা রচনা করে থাকলে তাদের কোন সন্ধান মেলে না।

কালীকীর্তন-পরিচিতি ও রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষক সমস্যা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "রামপ্রসাদ" প্রবন্ধে লিখেছেন, "কবিরঞ্জন, কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন, এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই। পূর্বে দুই একটা করিয়া অভ্যাস করত সংগ্রহ পূর্বক যিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারি নিকট তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে, কারণ পূর্বকালের লোকেরা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় গোপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন, প্রাণান্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে দিতেন না, আহ্নিক পূজাকরণকালে সেই পুঁতির উপর ফুলচন্দন প্রদান করিতেন, অধুনাও দুই এক মহাশয় ঐ প্রকার করিয়া থাকেন, আমরা সর্ব্বস্ব করিয়াও তাঁহারদিগের নিকট হইতে সেই পদাবলী প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। এইরূপ গোপনেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। কীটের আঘাতে ভূতের দৌরাত্ম্যে সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ পোকায় কাটিয়াছে, জলে ও সর্দ্দিতে পচিয়াছে এবং আগুনে পুড়িয়াছে, যেমন ক্লীব ব্যক্তি সুরূপসী কামিনী ক্রোড়ে পাইলে না আপনিই ভোগ করিতে পারে, না প্রাণ থাকিতে অন্যকেই দিতে পারে, এ বিষয়ের গোপনকারি মহাশয়েরা অবিকল তদনুরূপ রামপ্রসাদি কীর্ত্তিকে এককালে উচ্ছন্ন দিলেন।"

"কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় গুপ্তকবি লিখেছিলেন, "ভারতচন্দ্রের কৃত অন্নদামঙ্গলের সমুদয় কবিতার টীকা করিয়া প্রকাশ করিব, এবং এই প্রণালীক্রমে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যা-সুন্দর এবং অবস্থাভেদের সমস্ত পদ টীকা সম্বলিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব।" * ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই পরিকল্পনা রূপ লাভ করে নি তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য। তিনি শুধু ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে "কালীকীর্তন" গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন, পূর্বোদ্ধৃত পরিকল্পনা রচনার বহু পূর্বে। ১২৬০ বঙ্গাব্দের পৌষে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় রামপ্রসাদের জীবনীর সঙ্গে এবং তার পূর্বে ও পরে রামপ্রসাদের যে পদগুলি প্রকাশ করেন তাদের সংখ্যা ৭৭টি।

'কালীকীর্তনে'র 'গৌরচন্দ্রী' প্রকাশ করেন সংবাদ প্রভাকরের ১২৬১ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। এই সংখ্যাতেই "নৌকাখণ্ডের সংগীত", "সীতার বিলাপোক্তি সংগীত" ও "শিবসংগীত" প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩এর কালীকীর্তনের সঙ্গে এই "গৌরচন্দ্রী" ছিল না। এমন কি রামপ্রসাদের জীবনীর সঙ্গেও অর্থাৎ ১২৬০এর পৌষ বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দেও এটি প্রকাশিত হয় নি।

১২৬০এর পৌষে রামপ্রসাদের জীবনীর সঙ্গে শেষের দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, "কবিরঞ্জন কালীকীর্তনের রাসলীলার স্থলে ভগবতীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।"

তারপর রূপ বর্ণনার একটি দীর্ঘপদ উদ্ধৃত করেছেন। ১৮৩৩এ প্রকাশিত 'কালীকীর্তনে' এ রূপ বর্ণনার পদটি নাই। 'রাসলীলা'র কথা ঈশ্বরচন্দ্রেরই কল্পনা। মনে করেছেন, 'কালীকীর্তন' যে জাতীয় রচনা, তাতে একটি রাসলীলার পদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। আকরস্থানের পুথিতে 'রাসলীলা' পান নি। তারপর অনেক অনুসন্ধানেও পেলেন না, পেলেন রূপ বর্ণনার একটি পদ। ধরে নিলেন সাধক-কবি রাসলীলার স্থলে এই রূপ বর্ণনার পদটিই লিখেছিলেন।

১৭৭৭ শকাব্দের ভাদ্র বা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা শ্রীবিহারীলাল নন্দীর সম্পাদনায় কলিকাতা নিউ-প্রেস যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়ে "শ্রীশ্রীকালীকীর্তন" প্রকাশিত হয়।**

শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল নন্দীর 'কালীকীর্তনে'র বিজ্ঞাপনপত্রে দেখি—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত এই কালীকীর্তন, প্রায় ২২/২৩ বৎসর গত হইল, বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সচরাচর ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং

* ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী", পৃ- ৩৩৩
** উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের এক কপি আছে।

আধুনিক বিদ্যার্থি যুবকেরা অনেকে ইহার নাম ও কবিরঞ্জনের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির পরিচয় অবগত নহেন।"

বিজ্ঞাপন আরও দীর্ঘ কিন্তু আমাদের কাছে এইটুকুই প্রয়োজনীয়। ১৮৫৫র ২২/২৩ বছর পূর্বে মুদ্রিত গ্রন্থ অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত ১৮৩৩এ প্রকাশিত 'কালীকীর্তন' গ্রন্থটি। এখানে জানা গেল "কালীকীর্তন" 'বারদ্বয়' মুদ্রিত হয়েছিল। দুবার মুদ্রণের ঘটনাটি এই গ্রন্থের উল্লেখটুকু না দেখার জন্য আমরা অনেকেই অবগত নই। 'বিজ্ঞাপন' থেকে রামপ্রসাদের কালীকীর্তনের জনপ্রিয়তা বোধগম্য হয়। Ward সাহেব "The Hindoos" গ্রন্থের ১৮২২ খৃষ্টাব্দের বিলিতি সংস্করণে রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' গ্রন্থটির কথাই শুধু উল্লেখ করেছিলেন।

এই গ্রন্থের নামপত্রটি এইরূপ—

শ্রীশ্রীকালী
শরণং
শ্রীশ্রীকালীকীর্তন
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত
অধুনা
শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা শ্রীবিহারীলাল নন্দী কর্তৃক
গ্রন্থকর্তার সংক্ষেপ জীবনচরিত সমেত
প্রকাশিত হইল।
কলিকাতা
কলিকাতা নিউ-প্রেস যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত
১৭৭৭ শক। ভাদ্র
মূল্য ।০ আনা

শ্রীনাথ বিহারীলাল সম্পাদিত গ্রন্থে রামপ্রসাদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও সম্পাদকেরা দিয়েছেন। লিখেছেন—"হালিশহরান্তর্বর্তি কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদ সেনের নিবাস ছিল। ১৬৪০—৪৫ শকের মধ্যে তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ন্যূনাধিক ৬০ বৎসরকাল তিনি জীবিত ছিলেন।"

এ পর্যন্ত প'ড়ে মনে হয়, দু বছর পূর্বে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রামপ্রসাদজীবনী থেকেই হয়তো এ সকল কথা লিখেছেন। কিন্তু তারপরেই রামপ্রসাদের পিতৃপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—"এই মহাত্মা কবির পিতার নাম রামদুলাল সেন।"

প্রকৃত পক্ষে রামদুলাল ছিলেন রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মনে হয়, দয়ালচন্দ্র ঘোষ এই গ্রন্থখানি দেখেছিলেন এবং এর সম্পাদকদেরই লক্ষ্য করে তাঁর প্রসাদ-প্রসঙ্গের প্রথম,

সংস্করণে লিখেছিলেন, 'কোন জীবনাখ্যায়ক এমন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে রামপ্রসাদের পুত্র রামদুলাল সেনকে অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহার পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।' *

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আবিষ্কৃত ও ১২৬০এর পৌষে রামপ্রসাদজীবনীর সঙ্গে প্রকাশিত 'রূপবর্ণনা'র পদটি সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থ শেষে জুড়ে দিয়ে পাদটীকায় এই টীকাটি যুক্ত করেছেন—(পৃষ্ঠা ৩৩) "এই কালীকীর্তনের মধ্যে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ভগবতীর রাসলীলা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু সংপূর্ণ পুস্তকাভাববশতঃ আমরা ঐ ভাগ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমরা যে পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন করিলাম ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্বে উহা যে যে যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন স্থানে গোষ্ঠলীলার প্রসঙ্গও প্রকাশ হয় নাই, আর তদবধি কেহই উহা যন্ত্রারূঢ় করেন নাই। সুতরাং উহা সংগ্রহ করা আমাদিগের পক্ষে সহজ নহে, ব্যয় ও যত্নসাপেক্ষ করে। অতএব, আমরা সম্পূর্ণ ঐ ভাগটি প্রকাশ করিতে না পারিয়া, সংবাদ প্রভাকর পত্রে ইতিপূর্বে যে রাসলীলা স্থলে ভগবতীর রূপ বর্ণনটি প্রকটিত হইয়াছিল, পাঠক মহাশয়দিগের তুষ্ট্যার্থে সেই অংশটি মাত্র প্রকাশ করিলাম। কবিরঞ্জনের রচনানৈপুণ্য ও ভাবকেলি সন্দর্শন করিয়া তাঁহারা আনন্দিত হউন। কোন প্রকার দুষ্প্রাপ্য, বহুমূল্য, উপাদেয় দ্রব্য আশামত ভোজন করিতে না পাইলে যেমন মন ক্ষুব্ধ থাকে, একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সকল অংশ দেখিতে না পাইলে কবিতাপ্রিয় পাঠকবৃন্দের তেমনি চিত্ত বৈকল্যতা জন্মায় বটে, কিন্তু কি করি আমরা উহা কোনক্রমে সংগ্রহ করিতে পারিলাম না ; সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াই নিরস্ত রহিলাম।"

এই পাদটীকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদকদ্বয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লিখলেন, ২২।২৩ বছর পূর্বে এই গ্রন্থ দুবার মুদ্রিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কালীকীর্তন' ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত, সুতরাং এই মুদ্রণটিই কি গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ ? ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কালীকীর্তন' দুবার মুদ্রিত হয়ে থাকলে ঈশ্বরগুপ্তের লেখাতেই তা জানা যেত। অন্ততঃ এ সংবাদটি অগোচরে থাকতো না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তাঁর 'কালীকীর্তনে'র গদ্য ভূমিকায় তাঁর গ্রন্থকে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বলেন নি। তিনি শুধু বলেছেন, "ভক্তিরসপ্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত"* এবং "নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকালস্থায়িতার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূলপুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্তন পুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"**

* প্রমথনাথ চৌধুরী সম্পাদিত 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ'—পৃ ৩৫

** উদ্ধৃতিগুলি ডঃ শান্তি কুমার দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুখটি সম্পাদিত ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলীর প্রথমখণ্ড থেকে গৃহীত। পৃঃ ৪৩

শ্রীনাথ-বিহারিলাল সম্পাদিত 'কালীকীর্তন' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মুদ্রিত 'কালীকীর্তন' দেখে যেমন মুদ্রিত নয়, তেমনি ১২৬০ এর পৌষে রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত রামপ্রসাদ-জীবনীও তাঁরা দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। দেখলে রামদুলাল সেনকে রামপ্রসাদের পিতা বলতেন না। ১২৬১ র চৈত্র সংখ্যার সংবাদপ্রভাকরে গুপ্তকবি "কালীকীর্তনের গৌরচন্দ্রী" প্রকাশ করেন। কয়েকমাস পরে প্রকাশিত শ্রীনাথ-বিহারীলালের "কালীকীর্তনে" 'গৌরচন্দ্রী' যুক্ত হল না। শুধু ১২৬০ এর পৌষ সংখ্যার সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত "রাসলীলার স্থলে রূপবর্ণনা"র পদটি গ্রন্থের শেষে জুড়ে দিলেন এবং পাদটীকায় তার স্বীকৃতি জানালেন।

তা হলে কি ধরতে হবে ঈশরচন্দ্র গুপ্তের পূর্বে প্রকাশিত কোনও 'কালীকীর্তন' তাঁদের আদর্শ ছিল এবং তাতে 'গৌরচন্দ্রী' না থাকাতেই তাঁরা 'সংবাদপ্রভাকরে' এটি দেখেও গ্রন্থসূচনায় স্থান দিলেন না? এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা একেবারেই অসম্ভব। শ্রীনাথ-বিহারীলালের গ্রন্থের পাঠ গুপ্তকবির পাঠের সঙ্গে একেবারে এক, অমিলগুলি মুদ্রণপ্রমাদজাত।

গুপ্তকবির পরিকল্পিত মুদ্রণে 'কালীকীর্তনে'র সূচনায় আমরা এই 'গৌরচন্দ্রী' পদটি হয়তো পেতাম। গুপ্তকবির অকালমৃত্যুর জন্য তা ঘটে নি।

'গৌরচন্দ্রী' পদটি মায়ের বাল্যলীলার যথার্থ গৌরচন্দ্রিকা। তবে যে অর্থে বৈষ্ণব-পদাবলীর গৌরচন্দ্রিকা, সে অর্থে নয়। মায়ের শিশুচিত্রটি এখানে প্রকটিত।

১২৬০ এর পৌষ সংখ্যার সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্ত "কৃষ্ণকীর্তনে"র একটি অংশ প্রকাশ করেন। 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থটি ঈশ্বরগুপ্ত দেখেছিলেন এবং পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছাও যে তাঁর ছিল, তা আমরা পূর্বে দেখেছি। এখানে লিখলেন, "রামপ্রসাদের কৃষ্ণকীর্তনের এক স্থান হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।" সেই 'কতিপয় পংক্তি'ই আমাদের সম্বল। তিনি যা ছিটেফোঁটা দিলেন, রামপ্রসাদ রচনাসংগ্রহে আমরা তাই রক্ষা করছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের একজন কবির রচনা এত দ্রুত দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাওয়ায় আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত।

লিখিত আকারে মাত্র তিনটি রচনাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দেখেছিলেন। রচনাগুলি হল—বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন। লেখা অবশ্যই অন্য কারো—রামপ্রসাদের নয়। পদগুলি সম্পর্কে জানিয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন জন প্রথমে শুনে অভ্যাস করে, তারপর নিজেরাই লিখে নিতেন। এ হেন কবির রচনার পাঠবিচার করার কোন সার্থকতা নাই। যেখানে যেটুকু পাওয়া যায়, সাদরে তাই গ্রহণ করে নেওয়া ভাল।

বৈচিত্র্যপিয়াসী কবি রামপ্রসাদের আরও টুক্‌রো-টুক্‌রো রচনা পাওয়া গেছে। ১২৬১ র চৈত্র সংখ্যার সংবাদপ্রভাকরে "নৌকাখণ্ডের সংগীত" নামে আরও দুটি পদ প্রকাশিত

হয়। এর কোন পরিচিতি সম্পাদক দেন নি, শুধু শেষে মন্তব্য করেছেন—"এই দুই গীতে কি আশ্চর্য রস প্রকাশ পাইয়াছে।"

মনে হয় 'কৃষ্ণকীর্তন' ও 'নৌকাখণ্ডে'র গান দুটি একই গ্রন্থের অন্তর্গত ছিল। 'কৃষ্ণকীর্তনে' রাধার রূপ বর্ণনা ও 'নৌকাখণ্ডে'র গানে কাণ্ডারী কৃষ্ণকে রাধার সম্ভাষণ কবি রামপ্রসাদের উদার, সমন্বয়বাদী মনোভাবের পরিচয় বহন করছে। যে কোনও একজন বৈষ্ণব কবির হাতে এমনি রচনা প্রকাশিত হতে পারতো।

১২৬১ র চৈত্র সংখ্যার প্রভাকরে প্রকাশিত আরও একটি বিচিত্র পদ হল "সীতার বিলাপোক্তি সংগীত"। এর কোনও পরিচিতি নাই, শুধু শেষে মন্তব্য আছে—"আহা কি চমৎকার! কি চমৎকার! এতদ্রূপ করুণা পূরিত বিলাপ বর্ণনা প্রায় দেখা যায় না, পাঠ করিতে করিতে অমনি অশ্রু পতন হইতে থাকে। হে পাঠকগণ! শ্রুতিপথে এই সুধার আস্বাদন গ্রহণ কর।"

লবকুশের সঙ্গে অশ্বমেধের অশ্বউদ্ধারের জন্য সংগ্রামে রামচন্দ্রের সাময়িক মৃত্যুজনিত সীতার বিলাপ এই কবিতাটিতে যথার্থ আন্তরিকতার স্পর্শে রমণীয়।

এই সংখ্যারই একটি পদ 'শিবসংগীত' শ্মশানভ্রমণরত শিবের বিভূতির বর্ণনা। শাক্ত কবির হাতে এ বর্ণনা যথার্থ কবিত্বমণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত। ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্য—"কি আশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, ধন্য ধন্য।"

এ ছাড়া "আগমনী" "বিজয়া" নামের দুটি পদও ১২৬০এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এগুলিকে বিশেষ শ্রেণীর পদ না ধরাই সঙ্গত। পদাবলীর সঙ্গেই এগুলি বিচার্য্য।

বিশেষ রচনাগুলির মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দর' বাদে একমাত্র 'কালীকীর্তন' গ্রন্থকেই প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থরূপে ধরে বিচার করা চলে। প্রায় সম্পূর্ণ বলার কারণ সমগ্র গ্রন্থটি গুপ্তকবি প্রথমেই পেলে "রূপবর্ণনার পদ" ও "গৌরচন্দ্রী" পদ পরে সংগ্রহ করে প্রকাশ করতেন না।

কালীকীর্তনের প্রাপ্ত অংশটুকুতে দুটি খণ্ড লক্ষ্য করা যায়— বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলা। বাল্যলীলা অংশটি বাৎসল্যরসপ্রধান এবং গোষ্ঠলীলার মুখ্য রস ভক্তি। অবশ্য উভয় অংশেই দেবী ভগবতীর অনন্তমহিমা বিধৃত।

'কালীকীর্তনে' ভাগবতীয় আদর্শে মা কালীর জীবনবর্ণনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অথচ সম্পূর্ণ জীবনী লেখার কোন প্রয়াসই প্রকাশ পায় নি। আদিঅন্তহীনা, সর্বদেব ও ভূতের সৃষ্টিকর্ত্রী মায়ের জীবনবর্ণনা একজন শাক্তকবির হাতে সম্ভবও নয়। সুতরাং যে সমন্বয়বাদের পরিচয় রামপ্রসাদরচনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য এবং পরে যা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হচ্ছে, কালীকীর্তনে তারই পরিচয় পাচ্ছি বললে অন্যায় হবে না।

'বাল্যলীলা' অংশে কবির 'আগমনী' কবিতার বাৎসল্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এখানে সাধারণ পৌরাণিক আদর্শ ও 'কুমারসম্ভবে'র প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। কবি নিজেই

এই কাব্যের একস্থলে বলেছেন,"প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে।" আবার অন্যত্র শিবের মুখ দিয়ে বলেছেন—

দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান।
শিখরিকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান ॥

এখানে স্পষ্ট পৌরাণিক ও কুমারসম্ভব আখ্যানের প্রতিধ্বনি। শিবকে পাবার জন্য 'বাল্যলীলা' খণ্ডে পার্ব্বতীর কঠোর তপও বর্ণিত হয়েছে। এ শুধু কুমারসম্ভবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বৈষ্ণবপদাবলীর পূর্বরাগে বাঁশী বাজিয়ে কৃষ্ণ রাধার মন টানে, এখানে কঠোর তপস্যায় গৌরী শিবের সিংহাসন টলিয়েছেন।

তারপর পুষ্পকাননে মহাদেবের আবির্ভাব হয়েছে। নায়ক-নায়িকা পরস্পর মুখোমুখি অথচ প্রণয়লীলা বর্ণিত হয় নি। কবিই শুধু সসঙ্কোচে বলেছেন—

যদি বল অনূঢ়া কালের একি কথা।
শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছে কোথা ॥

নায়িকা শুধু বলেছেন—

আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেথা রব ।

নায়ক বলেছেন—

কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুরে লব ॥

এরপর গোষ্ঠলীলা আরম্ভ। গৌরী এখন মহেশপত্নী। স্বামীর অনুমতি নিয়ে তিনি একাম্রকাননে গেছেন গোষ্ঠলীলার জন্য। সেখানকার গোষ্ঠলীলায় বৈষ্ণবপদাবলীর বাৎসল্য, সখ্যমণ্ডিত গোষ্ঠলীলার চিহ্নমাত্র নাই। দেবী জগদীশ্বরীর অনন্ত মহিমাই শুধু এখানে প্রকটিত। পুত্রভাবে ভাবিত কবি যেমন হরগৌরীর প্রণয়লীলার কথায় সঙ্কুচিত, তাঁর হাতে রাসলীলার প্রকাশও সম্ভব নয়। মনে হয়, ইচ্ছে করেই কবি রাসলীলার স্থলে দেবীর অনন্তরূপের বর্ণনা করেছেন। অথচ কবির ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। তিনি নিজেই দেবীকে প্রশ্ন করেছেন—

একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখ ধেনু ॥
আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা।
এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্যা ॥

বাৎসল্য, ভক্তিভাব ও সমন্বয়ের আন্তরিকতায় "কালীকীর্তন" অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে অনন্য সাহিত্যকর্ম। বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব রচনায় সুস্পষ্ট। 'ব্রজবুলী' রচনাকে তিনি আয়ত্ত করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবপদকর্তাদের বিশিষ্ট রচনা ভঙ্গীটি তাঁর দখলে

ছিল। এই ভঙ্গীর বিশেষ লক্ষণ হল ব্রজবুলি ও বাংলার সঙ্গে অনুস্বারযুক্ত ভাঙাভাঙা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার।

কিন্তু তাঁর পথ অন্য। সে পথ কোন গোষ্ঠীর নয়—না গোস্বামীশাসিত বৈষ্ণবাদর্শ, না গূঢ়পথের তান্ত্রিক সাধক। কবি রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' তাঁর সমগ্র পদাবলীর যথার্থ ভূমিকা। এখানে যা সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতের আকারে প্রকাশিত, দীর্ঘপদাবলীসাহিত্যে তাই নানাভাবে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। এখানে আমরা এমন একজন কবির আবির্ভাব-বার্তা পাই, যিনি দীর্ঘকাল রেষারেষির মধ্যে পাশাপাশি বসবাসকারী শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন। শাক্তবৈষ্ণব এর পর এক হয়ে বাঙালী জাতির সৃষ্টি করেছে—ধর্ম যেখানে ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং আচরণে সকল দেবতারই যেখানে সমমর্যাদা।

অষ্টাদশের শেষার্ধে রামপ্রসাদ ধর্মীয় গোড়ামির প্রাসাদে যে আঘাত হানলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর রামমোহনচালিত ধর্ম ও সমাজের সংস্কারকেরা তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। কবি ভারতচন্দ্রকে যুগস্রষ্টা বলতে বাধে, কারণ তিনি নিজ যুগের প্রভাবটিকেই বেশি করে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাধ্য হয়েই, তবু তাঁর রচনায় নতুন যুগের দূরশ্রুত পদধ্বনির আভাষ রয়েছে। কবি রামপ্রসাদ নতুন যুগকে পথ করে নিয়ে এলেন। এ অর্থে প্রকৃতই তিনি যুগস্রষ্টা। কেন কিভাবে তাঁর দ্বারা এ আচরণ সম্ভব হল পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

॥ রাজা রাজকিশোর ॥

"কালীকীর্তন" গ্রন্থখানি আর একটি কারণে রামপ্রসাদরচনায় বিশেষ মর্যাদা দাবী করতে পারে। একমাত্র এই রচনাটিতেই তিনি একজন পৃষ্ঠপোষকের উল্লেখ করেছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্যই এটি লক্ষ্য করেছিলেন কালীকীর্তন সম্পাদনার সময়ে, কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে একেবারে চুপ করে রইলেন কেন বোঝা গেল না। ঈশ্বর গুপ্তের সাক্ষ্য যদি গ্রহণ করতে হয় এবং তা করাই বাঞ্ছনীয়, তা হলে দেখা যায়, রামপ্রসাদের কবিকর্মে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিলেন এবং কবিও নিজের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থটির 'কবিরঞ্জন' নাম দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থ ও 'কবিরঞ্জন' উপাধির সম্পর্ক নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি এবং গুপ্তকবির বিবরণের অসারতা দেখিয়েছি। গুপ্তকবি নিজে 'কালীকীর্তন' সম্পাদনা করেছেন। পুনরায় তা সম্পাদনা করার ইচ্ছেও ছিল।

রামপ্রসাদজীবনীতে ও বিজ্ঞাপনে কয়েকবারই তিনি 'কালীকীর্তনে'র উল্লেখ করলেন অথচ একটি কথা সযত্নে এড়িয়ে গেলেন।

রামপ্রসাদের কর্ম্মজীবন প্রসঙ্গে 'কলিকাতা' বা তৎসন্নিকটবর্তী স্থানে তাঁর খাতা লেখার কথা বললেন এবং জনশ্রুতিতে নির্ভর করে গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ও দুর্গাচরণ মিত্রের নাম ঘোষণা করে দিলেন। অথচ একটু খেয়াল করলেই রামপ্রসাদের খাতালেখার স্থান বা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা, এমন কি তাঁর উপাধিদাতা সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য দিতে পারতেন। তাঁর সময়েও এই তথ্যগুলি যতটা জীবিত ছিল, তার থেকে তিনি যেটুকু সংবাদ আহরণ করতে পারতেন, পরবর্তীকালে কারো পক্ষেই আর তা করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্রকে দোষ দিয়ে লাভ নাই, তাঁর পক্ষে এমনি করাই সম্ভব ছিল। তবু তো তিনি যা করে গেছেন, তাই আমাদের সম্বল। যা করেন নি তার জন্য খেদ করে কোন লাভ হবে না।

'কালীকীর্তন' গ্রন্থে কবি রামপ্রসাদ চারবার ভণিতায় 'রাজকিশোর' নামটি প্রকাশ করেছেন। দু'বার রাজকিশোরের উল্লেখ এইভাবে হ'ল—

শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্টা সুতজ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহাঅন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥

তৃতীয়বার রাজকিশোরের নাম উল্লিখিত হল—

কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোরে ভাবে, বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর, দীন দয়াময়ী সন্তত ছল ছলনা॥

শেষবার 'রাসলীলার' রূপবর্ণনার পূর্বে অর্থাৎ গ্রন্থের শেষের দিকে এইভাবে—

শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী।
কালিকা বিজয়ী হরিচিত্তমোহ হরি॥

'রাজকিশোর' নামের উল্লেখের দ্বারা কবি যে কথাগুলি প্রকাশ করেছেন, তা হল রাজকিশোর একজন কালীভক্ত ব্যক্তি। তিনি রামপ্রসাদের এই গ্রন্থরচনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে 'কালীকীর্তন' রচিত হয়। তাঁর প্রতি কবি রামপ্রসাদের অসাধারণ দুর্বলতা ছিল। তাঁর মঙ্গলকামনায় কবিকণ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ত। এই রাজকিশোর রাজা বা রাজতুল্য সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল, এই রাজকিশোর কে? এ সম্বন্ধে বিশ্বকোষে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০)

নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন "এই 'রাজকিশোর' কে ? তারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন এই 'রাজকিশোর' শব্দ যুবকরাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিত, কিন্তু তাও কতটা যুক্তিযুক্ত তা স্থির করার কোন উপায় নাই।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে 'রাজকিশোর' নন তা সুনিশ্চিত। প্রথমতঃ কিশোর বা যুবক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদের কোন যোগাযোগের কারণই ঘটতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এ সম্বন্ধে সামান্যতম সম্ভাবনা থাকলে ঈশ্বরগুপ্ত অবশ্যই সাড়ম্বরে তার বর্ণনা করতেন। অনেকে বিশেষ করে ঐতিহাসিক ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত রাজকিশোরকে রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় নামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এক আত্মীয় মনে করেছেন।* এরূপ অনুমানের মূলে ভারতচন্দ্রের একটি উক্তি। অন্নদামঙ্গলের প্রথমখণ্ডে "কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন" পরিচ্ছেদে এই লাইন কটি আছে—

ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।
তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি॥
ভূপতির পিতার জামাই তিন জন।
কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন॥
মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর।
মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর॥

এই 'কবিত্বকলাধর' রাজকিশোর মুখ 'কালীকীর্তনে'র রাজা রাজকিশোর—এমনি অনেকের অভিমত। এই মত সত্য বলে গ্রহণ করতে হলে রামপ্রসাদের সঙ্গে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পর্ককেই আরও গভীর করে ভাবতে হবে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ই রাজপরিবারের অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে রামপ্রসাদের সম্পর্ককে অগ্রসর করে দিতে পারে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মত পৃষ্ঠপোষক থাকতে তাঁরই এক আত্মীয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'কালীকীর্তনে'র মত কাব্য রামপ্রসাদ লিখবেন, ভাবতে কষ্ট হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েও (যদি ধরি পেয়েছিলেন) যখন 'বিদ্যাসুন্দরে' একবারও তাঁর নামোল্লেখ করলেন না, আর তাঁরই আত্মীয়ের পৃষ্ঠপোষকতা কাব্যে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশিত হয় কি করে ভাবা যায় না। আমরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যে পরিচয় নানাভাবে পেয়েছি এবং পূর্বের আলোচনায় যার সামান্য ইঙ্গিত আছে, তাতে এ একেবারে অসম্ভব। কবিত্ববোদ্ধা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কম ছিলেন না। ভারতচন্দ্র, বাণেশ্বরের মত কবির তিনি আশ্রয়দাতা ছিলেন।

'কালীকীর্তনে'র রাজকিশোর রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তি এবং তিনি রীতিমত শক্তিভক্ত; এ দুটি পরিচয়ই ভারতচন্দ্র প্রদত্ত ঐ 'কবিত্বকলাধর' বিশেষণটির মধ্যে অনুপস্থিত।

'Alivardi and His times"—পৃঃ ১৮৮

সুতরাং কালীকীর্ত্তনের 'রাজকিশোর' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয় রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় কিছুতেই হতে পারেন না।

কবি বিজয়রাম সেন 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থে এক রাজকিশোরের উল্লেখ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত তীর্থমঙ্গল গ্রন্থের "যাত্রারম্ভ" পরিচ্ছেদের ২৩ পৃষ্ঠায় দেখি—

চলাচল আইল নৌকা হুগলী শহরে।
সে রাত্রি বঞ্চিলা কর্তা নৌকার ভিতরে॥
হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়।
বজরাতে আসিয়া তাঁহে প্রণমিল পায়॥
বৈদ্যের প্রধান তিনি বড় কুলবান।
এদেশে নাহিক লোক তাঁহার সমান॥
ক্ষণেক কর্তার সঙ্গে আলাপ কথনে।
নৌকা হৈতে উঠি গেলা সহর ভুবনে॥
স্নান পূজা ভোজন করিয়া মহাশয়।
রায়ে আশীর্ব্বাদ করি পুন আইলা নায়॥

২১শে মাঘ ১৬৯২ শকাব্দে "তীর্থমঙ্গল" লিখিত। সুতরাং ধরা যায়, হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়ের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পূর্বোদ্ধৃত সাক্ষাৎকার ঘটে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়।

"হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের ৬৭৯ পৃষ্ঠায় সুধীরকুমার মিত্র শুধু লিখেছেন, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে রাজকিশোর রায় নামে এক ব্যক্তি দেওয়ান হয়েছিলেন। তিনি অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই 'তীর্থমঙ্গল'ও 'কালীকীর্তনে' উল্লিখিত 'রাজকিশোর' বলে সুধীরকুমার মিত্র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে দেওয়ান ছিলেন সে কথা বলেন নি। দেওয়ানদের পরিচয়বাহী কোন সূত্র থেকেও সে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। গভর্ণর ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান অর্থাৎ তৎকালীন ব্রিটিশ অধিকারের প্রধান মন্ত্রী গোকুলচন্দ্র ঘোষালের দাদা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল তীর্থদর্শনে ধর্ম অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হলেও তাঁর রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহেরও যে একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, বিজয়রামের গ্রন্থে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তৎকালীন শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আতিথ্য গ্রহণ করতেন।

রাজকিশোর রায় এমনি একজন ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং তিনি যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরই একজন অতি শক্তিশালী দেওয়ান ছিলেন তা বোঝা যায়। নবাবী আমলে ১৭৪৮ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত ছাড়াছাড়াভাবে মহারাজ নন্দকুমার এই দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসক পরিবর্তনের পর আর এক ব্যক্তির এই দেওয়ানীর পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন কৃষ্ণরাম বসু। লোকনাথ ঘোষের "Modern History of Indian Chiefs etc.,' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায় দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর মাসিক বেতন বলা হয়েছে দু হাজার টাকা। তখনকার দিনের বিচারে রীতিমত বড় অঙ্কের টাকা। সুতরাং রাজকিশোরের পদগৌরব ও প্রতিপত্তির কথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

সুধীরকুমার মিত্র এবং বিজয়রাম সেন উভয়েই রাজকিশোর রায়কে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেছেন। বিজয়রাম তাঁকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ লাইন জুড়ে দিয়েছেন—

'বৈদ্যের প্রধান তিনি বড় কুলবান' ;

রাজকিশোর রায়ের বৈদ্য পরিচয়টির প্রতি কেউই গুরুত্ব দেন নি। গঙ্গাতীরবর্তী কুমারহট্টের সঙ্গে হুগলীর দূরত্ব যেমন নগণ্য, তেমনি বৈদ্য রামপ্রসাদের সঙ্গে বৈদ্য রাজকিশোরের স্বাভাবিক নৈকট্যও অত্যন্ত বেশি। বৈদ্যজাতির ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে নৈকট্যবোধ বাঙালী সমাজে প্রবাদবাক্যতুল্য। প্রয়োজনে রামপ্রসাদ তাঁর আশ্রয় পাবেন এবং তিনিও রামপ্রসাদকে উৎসাহিত করবেন, কাব্যরচনায় প্রণোদিত করবেন, এতে আর আশ্চর্য্যের কি থাকতে পারে ?

রাজকিশোর রায় রাজা না হলেও রাজতুল্য সম্মানিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং তিনি যে তখনকার দিনে সাধারণের কাছে 'রাজা' নামে পরিচিত হবেন তা খুবই স্বাভাবিক। তিনিই রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন ধরতে হলে 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থকে ১৭৭০এর কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমরা এখনই অতদূর অগ্রসর হতে প্রস্তুত নই। আমরা "কবিরঞ্জন" উপাধি আর বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে গ্রাম্য জমিদারদেরই সম্পর্ক রাখতে চাই।

রামপ্রসাদের গ্রন্থ রচনার ক্রম জানা যায় না। তাঁর লিখিত দুটি গ্রন্থ 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'কালীকীর্তন' গ্রন্থের রচনাগত কালের ব্যবধান অবশ্যই ছিল। মনে হয় তাঁর বিদ্যা-সুন্দর ১৭৬০এর অল্প আগেপরে কোন একসময় রচিত এবং সাংসারিক জীবনে তখন তিনি তিন সন্তানের পিতা। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর শাক্ত উপলব্ধি যথেষ্ট পরিপক্ক হলেও পারিবারিক বন্ধনসীমার তিনি উর্দ্ধে নন। কিন্তু 'কালীকীর্ত্তনে' কোন পারিবারিক উল্লেখ নাই। শুধু পৃষ্ঠপোষকের নামোল্লেখটুকু স্মরণীয়।

রাজকিশোর রায় দেওয়ানী পদ পাবার পূর্ব থেকেই যে কোম্পানীর কুঠীতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা ভাবতে কোন বাধা নাই। সম্ভবতঃ তাঁরই সাহায্যে হুগলীতে কবি রামপ্রসাদ কিছুকাল কোম্পানীর অধীনে কাজ করেন। তাঁর পার্থিব কাজে অনাসক্তি দেখে এবং আধ্যাত্মিক মনোভাবে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্বগ্রামে পাঠিয়ে দেন কিছু আর্থিক সাহায্যের বরাদ্দ করে।

তারপর তিনি দেওয়ান হলে অর্থাৎ উচ্চতরপদে প্রতিষ্ঠিত হলে পুনরায় রাম-প্রসাদকে স্মরণ করে "কালীমাহাত্ম্য" সূচক কাব্য রচনা করতে নির্দেশ দেন। পূর্বেই রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লিখেছেন, সুতরাং কাব্যরচনায় তিনি অভ্যস্ত জেনেই কাব্যরচনার এই নির্দেশ। রামপ্রসাদও তাঁর রচনায় তাঁর পূর্বের সাহায্যকারী পোষ্টার হিতকামনায় দেবী কালিকার কাছে সকাতর আবেদন জানিয়ে ধন্য হতে পারলেন। সব আলোচনাই অনুমাননির্ভর, তবে ঈশ্বর গুপ্ত প্রদর্শিত পথ থেকে এ পথের মাটি শক্ত বলে মনে হয়।

দীর্ঘ মুসলমান শাসনে হিন্দুমানসিকতা ও রামপ্রসাদের কণ্ঠে নতুন সুর

।। অষ্টাদশ শতাব্দী-পূর্ব চিত্র ।।

১২০১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ এই দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশো বছর বাংলাদেশে একটানা মুসলমান শাসন বর্তমান ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে নানা বংশ কখনও স্বাধীনভাবে, কখনও দিল্লীর অংশরূপে বাংলাদেশ শাসন করেছে। এরই মধ্যে ১৬৫৮ খৃঃ থেকে ১৭০৭ খৃঃ পর্যন্ত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল। ১৭০৭ খৃঃ থেকে ১৭৫৭ খৃঃ অর্থাৎ শেষ পঞ্চাশটি বছর কার্যতঃ স্বাধীন নবাবদের শাসন।

দীর্ঘ মুসলমান শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র মনস্বী ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের "A short History of Aurangzib" গ্রন্থ থেকে তুলে ধরছি। এই গ্রন্থের ৪৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে "......in Mughal India man was considered vile ;—the mass of the people had no economic liberty, no indefeasible right to justice or personal freedem, when their oppressor was a noble or high official or landowner ; political rights were not dreamt of. While the nation at large was no better than human sheep, the status of the nobles was hardly any higher under a strong and clever king ; they had no assured constitutional position, because a constitution did not exist in the scheme of government, nor even

had they full right to their material acquisitions. All depended upon the will of the autocrat on the throne. The government was in effect despotism tempered by revolution or the fear of revolution. The whole power and all the resources of a country produce a Court, —the centre of the Court is the Prince......

......By its theory, Islamic Government is military rule—the people are the faithful soldiers of Islam, the Emperor (Khalifa) is their commander. In an army it is not for the officers, any more than for the privates, to reason why or to seek reply from the supreme leader. The Khalifa Emperor is the silhouette of God (Zill-i-Subhani), and in God's court there is no "why or how." No more could there be in the padishah's administration, which was a sample of God's court (namunai darbar-i-ilahi). By the basic principle of Islamic Government, the Hindus and other unbelievers were admittedly outside the pale of the nation.

......According to the root principles of Muslim Polity, there can be no political rights for minorities, the nation must be merged in the dominant sect, and a community homogeneous in creed and social life must be created by crushing out all divergent forms of faith, opinion and life."

এই হল সাধারণ মুসলমান-শাসনের চিত্র এবং হিন্দুর অবস্থা।

এর পর সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ের বিশেষ চিত্র (পৃঃ ৪৬৭)—"......the Quranic polity made life intolerable for the Hindus under orthodox Muhammadan rule. Aurangzib furnishes the best example of the effects of that polity when carried to its logical conclusions by a king of exemplary morality and religious zeal, without fear or favour in discharging what he held to be his duty as the first servant of God. Schools of Hindu learning were broken up by him, Hindu places of worship were demolished, Hindu fairs were forbidden, the Hindu population was subjected to special fiscal burdens in addition to being made to bear a public badge of inferiority; and the service of the state was closed to them,......"

সম্রাট আকবর ১৫৬৪ খৃঃতে 'জিজিয়া করে'র লাঞ্ছনা থেকে তাঁর হিন্দু প্রজাদের বাঁচান। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৬৭৯ খৃঃতে তা পুনঃপ্রবর্তন করলেন। তাঁর অনুসৃত হিন্দু দমন নীতির কতকগুলি পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

পৃ ১৫৯—"In 1671 an ordinance was issued that the rent collectors of the crownlands must be Mulims, and all Viceroys and taluqdars were ordered to dismiss their Hindu head clerks (peshkars) and

accountants (diwanian) and replace them by Muslims.......Later on, the Emperor yielded so far to necessity as to allow half the 'peshkars' of the revenue minister and paymaster's departments to be Hindus and the other half Muhammadans. Under Aurangzib, 'qanungo-ship on condition of turning Muslim' became a proverbial expression.........

In March 1695 all Hindus, with the exception of the Rajputs, were forbidden to ride palkis, elephants or thoroughbred horses or to carry arms."

পৃ ১৫৫—"An order was issued early in his reign in which the local officers in every town and village of Orissa from Katak to Medinipur were called upon to pull down all temples, including even clay huts, built during the last 10 or 12 years, and to allow no old temple to be repaired."

Next, on 9th April, 1669, he issued a general order "to demolish all the schools and temples of the infidels and to put down their religious teaching and practices." His destroying hand now fell on the great shrines that commanded the veneration of the Hindus all over India,—such as the second temple of Somnath, the Viswanath temple of Benares, and the Keshav Rai temple of Mathura."

১৭৫৭ খৃঃর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর জাতীয় জীবনে পরিবর্তনের রূপটি ফোটানোর জন্যই এত কথার অবতারণা। এর আরও উদ্দেশ্য শাক্তপদাবলীর আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ। চতুর্দশের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশের রাজত্বের সূচনা। সময়টি মোটামুটি ধরা যায় ১৩৪৫ খৃঃ থেকে ১৪৯৩ খৃঃ পর্যন্ত। মাঝে ১৪১৪ খৃঃ থেকে ১৪৪২ খৃঃ রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বের সামান্য বিচ্ছেদ।

১৪৯৩ খৃঃ থেকে ১৫৩৮ খৃঃ পর্যন্ত হোসেনশাহী বংশের রাজত্ব। ১৩৪৫ খৃঃ থেকে ১৫৩৮ খৃঃ পর্যন্ত একটানা স্বাধীন সুলতানী প্রাদেশিক রাজত্ব। এরপর কিছুকাল সম্রাট হুমায়ুন এবং সম্রাট শেরশাহ ও তাঁর বংশধরেরা বাংলাকে দিল্লীর কাছে টেনে নিয়ে গেছেন।

১৫৬৪ খৃঃ থেকে কররাণী বংশের সূচনা এবং আবার বাংলা স্বাধীন। এই বংশের শেষ সুলতান দাউদ খাঁকে ১৫৭৫ খৃঃতে পরাজিত করে সম্রাট আকবর বাংলায় মোগল শাসন প্রবর্তিত করেন এবং তা সম্পূর্ণ কার্যকরীরূপে চলে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। শেষের পঞ্চাশটি বছর আবার স্বাধীন নবাবী।

স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলা নানাভাবেই ভারতের বৃহত্তর সমাজ ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন। এ সময়ে সুলতানেরা স্বভাবতঃই বাংলাকে আপন করে নিয়ে রাজত্ব করতে

চেয়েছিলেন, এবং অনেক ক্ষেত্রেই বোঝাপড়া হয়েছিল বলে ধরা হয়। তবু এ সময়ের অন্তরালবর্তী চিত্র তুলে ধরা যায়।

যদুনাথ সরকারের গ্রন্থে (History of Bengal Vol II) প্রদত্ত ইবন বতুতার বর্ণনায় দেখা যায়—"The lot of the Hindu population in Fakhruddin's time was not very enviable, for 'they are mulcted' says Ibn Batuta, 'of half their crops and have to pay taxes over and above that'."

এই সামান্য ইঙ্গিতটুকুই মুসলমান শাসকদের বৈষম্যনীতির পরিচয় দিচ্ছে এবং ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর জিজিয়াপ্রথা তুলে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহতভাবে চলেছে। হিন্দুর শিল্পে সংস্কৃতিতে উৎসাহপ্রদান তাঁদের উদারতার পরিচয় দেয় ঠিকই, কিন্তু তা শুধু উদারতাই, প্রজা হিসেবে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি বিভেদ ব্যবহার বরাবরই ছিল।

সুলতান হোসেন শাহের উদারতা নানাভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য সনাতনের ইঙ্গিতে বৃন্দাবনযাত্রার পথ পাল্টেছিলেন। সুলতান হোসেনের প্রতি সন্দেহের যে ইঙ্গিতটুকু এখানে আছে, রাজাপ্রজার সম্পর্ক নির্ণয়ে তাই যথেষ্ট। সুবুদ্ধি রায়ের ঘটনা, রূপসনাতনের সঙ্গে শেষকালের ব্যবহার সবই এই সন্দেহকে সত্যের রূপ দেয়। শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রধান লীলাভূমিরূপে কেন নীলাচলকে বেছে নিয়েছিলেন, তারও হদিশ বোধহয় এখানেই মিলবে। তখনও নীলাচল মুসলমানশাসনমুক্ত। ইলিয়াশ শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং ইলিয়াস শাহই চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ভালভাবে একবার উড়িষ্যায় হানা দিয়ে আসেন। সবচেয়ে বড় হামলা হয় কররাণী বংশের রাজত্বকালে প্রায় দুশো বছর পরে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। সুলেমান কররাণীর পুত্রের সঙ্গে গিয়ে রাজু বা কালাপাহাড় নামে এক ব্যক্তি যে ভয়াবহ দেবোদ্বেষের পরিচয় দেয়, এখনও তা ভীতির সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ধর্ম্মই মানুষকে রক্ষা করে, অন্ততঃ 'ধর্ম্ম' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে তাই দাঁড়ায়। কিন্তু এই ভারতভূমিতে বিধাতার নির্ম্মম পরিহাসেই যেন তার উল্টোটি ঘটেছে। ধর্মের জন্যই ভারতের আদিবাসী হিন্দুরা মুসলমান যুগে বিপন্ন হয়েছে।

ধর্ম্মান্তরকরণের দ্বারা স্বধর্মীয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি, ধনরত্নলাভ এবং বসতিবিস্তারের জন্য ভূখণ্ড অধিকার—এই তিনটি উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতবর্ষে মুসলমান বিজয় শুরু হয় এবং তা খুব দ্রুত সাফল্যলাভ করে।

মন্দিরধ্বংসের দ্বারা আরও গূঢ়তর উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

হিন্দুরা বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করেছে ধর্ম্মদ্বেষে এবং প্রতিশোধের বাসনায়। সারনাথ এবং অন্যত্র এই ধ্বংসলীলার রূপ দর্শনের জন্য আমরা বহু অর্থ ব্যয় করি। বিধাতার ন্যায়বিচারেরই সূত্র ধরে হিন্দুর মন্দির মুসলমানের হাতে ধ্বংস হতে থাকে

কিন্তু এর মধ্যে প্রতিশোধগ্রহণের বাসনা থাকা সম্ভব নয়। ধর্মদ্বেষ একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ মনে হয় হিন্দুর নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া।

বৌদ্ধদের হটিয়ে হিন্দুরা মন্দিরেই আবার আশ্রয় নেয়। বৌদ্ধপুরোহিতের স্থলে গদিয়ান হয় হিন্দুপুরোহিত। সব ধনরত্ন, মানসিক সমস্ত বলবীর্য হিন্দুরা এই মন্দিরেই উৎসর্গ করে দেয়।

দেশের স্বাধীনতার চেয়ে ধর্মই তখন হিন্দুর কাছে বেশি আদরণীয়। তাই দেখি বিদেশী আক্রমণকারী অনেকস্থলে সৈন্যবাহিনীর সামনে গোবাহিনী রেখে অগ্রসর হয়েছে এবং সহজেই সাফল্যলাভ করেছে।

অনেক ক্ষেত্রে আবার অস্ত্রের বদলে মন্ত্র আশ্রয় করতো এবং মন্ত্র তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতো না। ডঃ সুকুমার সেনের মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙ্গালী (পৃঃ ২) থেকে এর একটি কৌতুকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে—

"শত্রুসৈন্য যদি চার দিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন কি কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে বইটিতে অনেক রকম বিধান আছে। তার মধ্যে একটি বলছি। শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্য্যের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে,

ওং অংহং হলিয়া হে মহেলি বিহঞ্জহি সাহিণেহি
মশাণেহি থাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি হুং ফট্ স্বাহা।

আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধুতুরা পাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক এঁকে সর্ব্বজ্ঞোদয় মন্ত্র জপ করতে হবে। তা হ'লে সেই তূর্য্যের শব্দ শুনে "ভবতি পরচক্রভঙ্গঃ স্বসৈন্যবিজয়ঃ"।"

॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পালা বদল ॥

এবার অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে একবার তাকানো যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরই কার্যতঃ বাংলায় নতুন যুগের সূচনা। মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সহকারী সুবেদারের পদ লাভ করেন এবং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবেদার হন।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী বাংলার দেওয়ান হন এবং কিছুকাল পরেই তাঁর দেওয়ানী আদালত মুর্শিদাবাদে তুলে নিয়ে আসেন ঢাকা থেকে। মুর্শিদাবাদ তখন থেকেই বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে।

মুর্শিদকুলী সুবেদারী করেন তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৭২৭)। তারপর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলা শাসন করেন ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে বিহাররাজ্যও

বাংলা-উড়িষ্যার সুবেদারের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দী বঙ্গবিহার উড়িষ্যার সর্বময় কর্তা হন।

বাংলা কার্যতঃ ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হল এবং অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় রীতিমত শান্তির পরিবেশ এখানে বিরাজ করতে লাগলো। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন, "Murshid Quli and Alivardi between them also gave this province a peace unknown in that age elsewhere in India. No repercussion of the dynastic revolutions at Delhi reached Bengal except in the change of the name on the coin. Maratha incursion which convulsed and transformed the face of Malwa and Gujrat, Khandesh and Berar, was felt in Bengal as merely a passing blast (১৭৪৩-৫২) ; it touched the fringe of the Province and at the very end (১৭৫২) only tore away Orissa from Bengal." (Hist. of Bengal Vol II).

মুর্শিদকুলী খাঁ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা আর একটি পরিবর্তন ঘটালেন। এঁদের সময় "Bengali Hindus, by the force of their talents and mastery of Persian came to occupy the highest civil posts under the Subahdar and many of the military posts also under the faujdar. There had been Bengali Hindu Diwans and qanungoes, well versed in the persian language and in Muslim Court etiquettee, as early as the days of Husain Shah (1510). Under Murshid Quli such men grew prosperous enough to found new zemindari houses." (Hist. of Bengal, Vol II)

মুর্শিদকুলী নতুন ধরণের জমিদারী প্রথা সৃষ্টি করলেন। তিনি সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে বাংলা দেশের জায়গীরগুলি নিয়ে নিলেন এবং তাঁদিকে অশান্ত উড়িষ্যায় জায়গীর দিলেন। এভাবে সব জমি সরকারের খাসে এল।

এতদিন পর্যন্ত জমিদারদের কাছ থেকে থোকে রাজস্ব আদায় করা হত। মুর্শিদকুলী রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারা প্রথা প্রবর্তন করলেন। এর ফলে প্রাচীন জমিদারদের অনেকেরই হেনস্থা হল কিন্তু নতুন এক শ্রেণীর জমিদারের সৃষ্টি হল। বাংলায় নতুন এক অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল।

প্রাচীন জমিদারদের স্থলে এই নতুন অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করলেন। এ সম্বন্ধে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল "In choosing his contractors (ইজারাদার) Murshid Quli always gave preference to Hindus and to new men of that sect, as most of the Muslim collectors before his time were found to have embezzled their collections and it was impossible to recover the money from them.

(Historian Salimullah writes—Murshid Quli employed none but Bengali Hindus in the collection of the revenues, because they were most easily compelled by punishment to discover their malpractices; and nothing was to be apprehended from their pusillanimity.) He thus created a new landed aristocracy in Bengal, whose position was confirmed and made hereditary by Lord Cornwallis." (Hist. of Bengal Vol II)

মুর্শিদকুলী খাঁ কঠোর হস্তে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সরকারী কর্মে ও ইজারাবণ্টনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু মনোনয়ন করে হিন্দুর মনে আস্থার ভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা থেকে এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করার মত। এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকে সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দীর আমলে। রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হিন্দুর প্রধান ভূমিকা গ্রহণের ঘটনা এই শতাব্দীর ইতিহাসপাঠকমাত্রেই জানেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনার অল্পপূর্বে ১৬৯৬খৃষ্টাব্দে দেবী সিংহের বিদ্রোহ পশ্চিমবঙ্গকে তোলপাড় করে এবং ১৭৪২খৃঃ থেকে ১৭৫১খৃঃ পর্যন্ত বর্গীর হাঙ্গামায় পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনই বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়।

এই দুটি ঘটনাই কিন্তু আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার লক্ষণ প্রকট করে দিয়ে বিদেশী বণিকদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। হুগলী, চন্দননগর ও কলকাতা রীতিমত প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। ১৭০৪খৃষ্টাব্দে কলকাতার লোকসংখ্যা ছিল পনের হাজার কিন্তু ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই জনসংখ্যা এক লক্ষের ওপরে চলে যায়।

জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য যেমন পূর্বোক্ত দুটি ঘটনায় দলে দলে জনসাধারণ ঐ তিনটি নগরে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করে তেমনি অনেকে বণিকদের সঙ্গে মিলিত ভাবে অর্থোপার্জনের জন্যও ওখানে হাজির হয়।

স্যার যদুনাথের গ্রন্থে (Stewart থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন) এ সম্বন্ধে লিখিত হয়েছে—"Besides a number of English Private merchants licensed by the company, Calcutta was in a short time peopled by Portugues, Armenian, Mughal (i.e. Persians), and Hindu merchants, who carried on their commerce under the protection of the English flag ; thus the shipping belonging to the port in the course of ten years the embassy amounted to ten thousand tons, and many individuals amassed fortunes, without injuring the Company's trade, or incurring the displeasure of the Mughal Govt......... the inhabitants of Calcutta enjoyed,........... a degree of freedom, and security unknown to the other subjects of the Mughal empire; and that city, in consequence, increased yearly, in extent, beauty and riches.

Salimullah confirms this description :—'The mild and equitable conduct of the English in their settlement, gained them the confidence and esteem of the natives; which joined to the consideration of the privileges and immunities which the company enjoyed, induced numbers to remove thither with their families; so that in a short time Calcutta became an extensive and populous city'."

একদিকে মোগলশাসনের বিভীষিকা স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে আসছে; অন্যদিকে বণিকদের আশ্রয়ে সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি স্বভাবতই তখন জনচিত্তের পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। 'ইজারা' প্রথায় নতুন ধনীজমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। ব্যবসাবানিজ্যের দৌলতে অনেকেরই গৃহে ধনদৌলতের সমাগম হতে আরম্ভ করেছে, ফলে একশ্রেণীর ব্যবসাভিত্তিক ধনীশ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে। বেনিয়ানী, মুৎসুদ্দিগিরি. ও নানা ব্যবসায়ী কুঠীর দেওয়ানী অনেককেই আকস্মিকভাবে ধনী করে তুলছে।

এই সঙ্গে আছে নতুন রাজতন্ত্র বিকাশের মুখে অর্থাৎ ইংরেজরাজ্য সূচনার সঙ্গেসঙ্গে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে যুক্ত একশ্রেণীর প্রভূত শক্তিশালী ও ধনী মানুষের আবির্ভাব। কিন্তু এ সবই হল ওপর মহলের কথা। অবশ্য এই ওপর মহলই জনচিত্তকে স্বভাবতঃ প্রভাবিত করে থাকে।

সাধারণ মানুষের অর্থাৎ রায়ত্ বলতে যাদের বোঝায় তাদের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। বরং আরও খারাপ হয়েছে। এ সম্বন্ধে স্যার যদুনাথ তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে দুবার মন্তব্য করেছেন। মুর্শিদকুলী প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Thus while the luxury of Delhi and Murshidabad was pampered, and Murshid Quli every year buried a new hoard in his treasure-vaults, the mass of the people browsed and died like human sheep.'

সুজাউদ্দীনের শাসনসমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, সুজাউদ্দীন বছরে এককোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা দিল্লীর বাদশাহকে পাঠাতেন। ফলে তাঁর এগারো বছরের রাজত্বে চোদ্দ কোটির বেশি টাকা তিনি দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন।

এই টাকা তিনি জমিদারদের ওপর অতিরিক্ত কর (abwabs) বসিয়ে আদায় করতেন। জমিদাররা সংগ্রহ করতেন প্রজাদের ওপর পীড়ন করে। ব্যবসাবানিজ্য ইত্যাদির প্রসারের ফলে এই সংগ্রহনীতির তাৎক্ষণিক কুফল প্রচণ্ড আকারে প্রকাশ না পেলেও "There is no doubt that it set a dangerous precedent, the imitation of which must have in future considerably strained the resources of the people during the second half of the 18th century, when Bengal had to pass through a very unhappy period due to acute economic troubles."

বিদেশী, বিভাষী; বিধর্মী শাসকদের উৎপীড়নের আশঙ্কা থেকে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত হয়েছে, রাজকর্ম, জমিদারী ও ব্যবসাবানিজ্য থেকে নতুন ধনতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে, সবই ঠিক কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত ঘটে নি।

এই দুর্দশা চিরকালীন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে কোন কবির কাব্যে সামাজিক বৈষম্য, আর্থিক দুর্গতির জন্য অভিযোগ ধ্বনিত হয় নি। সাধককবি রামপ্রসাদের শাক্তপদাবলীতে প্রথম এই নতুন সুরটি শোনা গেল।

যেখানে সবাই যূপকাষ্ঠের বলি, সেখানে কে পেলে আর কে বঞ্চিত হল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সেখানে মঙ্গলকাব্যের দেবীরা তাঁদের অতুলনীয় ক্ষমতা নিয়ে ঘরের আশপাশে ঘুরে বেড়ান। তাঁর অকৃপণ বদান্যতায় আকস্মিকভাবে লোকে অগাধ সৌভাগ্যের মুখ দেখে আবার তাঁর অবাধ্য হয়ে অশেষ কষ্ট ভোগ করে। সেখানে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আশাআকাঙ্খা প্রকাশের কথা কেউ ভাবেই না।

বৈষ্ণবপদাবলীতে কামনা উচ্ছ্বসিত। অপ্রাপ্যকে পাবার জন্য আকুলতা নানাভাবে প্রকাশিত। কবিরা প্রধানতঃ বিরহের চিন্তাতেই ব্যাকুল। বৈষয়িক চিন্তার বাষ্পটুকুও কোথাও নাই। ভোগের কথা কেউ ভাবতেই পারেন না। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি' ইচ্ছার বর্জনই যেখানে মূল কথা, সেখানে মানবমনের সন্ধান মিলবে কি করে?
কিন্তু শাক্তপদাবলীতে কবি প্রথম মাটির দিকে তাকিয়েছেন। এখানে দৈবের কাছে আবেদন ধ্বনিত হলেও ইঙ্গিতগুলি মানবিক।

হবেই বা না কেন? মঙ্গলকাব্যে কবিরা দৈব কৃপায় ধনদৌলতের সন্ধান পেতেন। কিন্তু এখন অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর নতুন ধনতন্ত্রে 'পুরুষস্ত ভাগ্যং' যেমন সর্বত্র প্রতিফলিত তেমনি দৈবের স্থান অধিকার করে বসেছে পুরুষকার। ত্যাগের বা বিরহের স্থান দখল করেছে ভোগ। বিভীষিকার পরিমণ্ডল আত্মবিশ্বাসের সুস্থ পরিবেশে পরিণত হয়েছে।

দু একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলে সমস্ত ব্যাপারটি বোঝা যাবে। লোকনাথ ঘোষের "The Modern History of Indian chiefs, Rajas and Zamindars, & C" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের হঠাৎ ধনীদের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

এই গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় গোবিন্দরাম মিত্রের জীবনী বর্ণনায় দেখি গোবিন্দরাম কলকাতায় বসবাসকারী প্রথম নাগরিকদের অন্যতম। তিনি তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। পলাশীর যুদ্ধের অল্প পরেই তাঁকে দেখা গেল "Black Deputy", "Naib Zamindar", কলকাতার 'মেয়র' প্রভৃতিরূপে সম্বোধিত হতে। বেতন তখন তাঁর মাসিক ৫০ টাকা মাত্র। অথচ তিনি ছিলেন বিরাট প্রভাবশালী ও

ধনশালী ব্যক্তি। বেতনটি সামান্য অজুহাত মাত্র। এক সময় তাঁর প্রভাব প্রসঙ্গে এই প্রবাদটি খুব প্রচলিত ছিল—

'গোবিন্দরামের ছড়ি। বনমালী সরকারের বাড়ি। উমিচাঁদের দাড়ি। জগৎশেঠের কড়ি।'

এই ছড়ায় উল্লিখিত কয়জনই তখন অত্যন্ত খ্যাত অর্থ ও প্রভাবের জন্য।

লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠা থেকে অল্প তুলে দিচ্ছি—'for Ram chand, who then received only sixty Rupees a month, died ten years after, with a fortune of one kror and a quarter of Rupees ; and Nabakrishna, the writer, afterwards Raja Nabakrishna, whose monthly salary was not more than sixty,' was able soon after to spend nine lakhs of Rupees on his mother's shradda.'

রামচাঁদ আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব কলকাতার শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

দেওয়ান রামকৃষ্ণ বোস (কৃষ্টরাম বোস বলে খ্যাত) জন্ম গ্রহণ করেন ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে। হুগলী জেলার 'তারা' গ্রাম থেকে বালীতে এলেন এবং বাবার কাছ থেকে সামান্য অর্থ নিয়ে লবণের ব্যবসা আরম্ভ করলেন এবং কয়েকদিন মাত্র ব্যবসা করেই চল্লিশ হাজার টাকা মুনাফা করলেন। তিনি এক সময় মাসিক দু হাজার টাকা বেতনে হুগলীর দেওয়ান হন। দানধ্যানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। দুর্ভিক্ষের সময় ১ লক্ষ টাকা মূল্যের সঞ্চিত চাল তিনি বুভুক্ষুদের মধ্যে বিতরণ করেন।

অত্যন্ত দরিদ্রের সন্তান গোকুলচন্দ্র মিত্র (বাগবাজার) লবণের ব্যবসা করে বিরাট ধনী হন এবং এক সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজাদের মদনমোহন বিগ্রহ বাঁধা রেখে এক লক্ষ টাকা দেন।

কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী 'কান্তমুদী' নামে খ্যাত সাধারণ এক ব্যক্তি ছিলেন। কাশিমবাজার কুঠীর রেসিডেন্ট ওয়ারেণ হেস্টিংসকে নবাব সিরাজদ্দৌলার কোপ থেকে বাঁচিয়ে পরে বাংলার গভর্ণরের (হেস্টিংসের) দেওয়ানী লাভ করেন এবং প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক হন।

রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্র পান্তি সামান্য পানের ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ আড়ংহাটার মোহান্তর ছোলা নিলেমে কিনে নিয়ে বিক্রি করে বিরাট বড়লোক হয়ে গেলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ওয়ারেণ হেস্টিংসের কর্মচারী। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে ১২ লক্ষ টাকা খরচ করেন এবং পুরী থেকে টাটকা জগন্নাথের প্রসাদ আনিয়ে নিমন্ত্রিতদের খাওয়ান। এক সময় তিনি এমত প্রভাবশালী হয়ে পড়েন যে, তাঁর সম্বন্ধে একটি

প্রবচন সৃষ্টি হয়—"নিজের নাই কোন সাধ্য, ছেলেরা সব অবাধ্য, এবে যা কিছু ভরসা তুমি যে গঙ্গাগোবিন্দ।" (কবিতাটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের লেখা বলে প্রসিদ্ধি আছে।) গঙ্গাগোবিন্দ পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

।। রামপ্রসাদের বৈষয়িক চিন্তা ।।

মহারাজ নন্দকুমার, দেবীসিংহ, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতি আরও বহু নব ভাগ্যধরের অভ্যুদয় হয়। কলকাতা রাজা, মহারাজা, জমিদারে ভরে গেল। হেস্টিংসের আমলে কালেক্টারগণ একাধারে শাসক ও ব্যবসাদার হয়ে ওঠেন। কুঠীর সাহেব ও তাদের বাঙালী গোমস্তারা ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের ওপর অত্যাচার করে প্রচুর অর্থোপার্জন করতে থাকে। কলকাতা সম্বন্ধে ছড়া বেরুল—"জাল জুয়াচুরি মিথ্যাকথা এই তিন নিয়ে কলকাতা।" নানাজনে নানাভাবে অর্থ সংস্থান করে বড়লোক হয়ে উঠতে লাগলো।

আর্থিক প্রতিষ্ঠা হল, এবার সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পালা আরম্ভ হয়ে গেল। সামাজিক নানা কাজেকর্মে নতুন ধনীরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে থাকে। প্রথমেই দেবতা প্রতিষ্ঠার পালা আরম্ভ হল।

গোকুলচন্দ্র মিত্র বিষ্ণুপুর রাজাদের কাছ থেকে পয়মন্তর 'মদনমোহন' দেবকে নিয়ে এলেন। বিনিময়ে দিলেন একলক্ষ টাকা।

রাজা নবকৃষ্ণদেব অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহকে অপহরণ করে নিয়ে এলেন। পরে অবশ্য তার অনুরূপ মূর্তি তৈরী করিয়ে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বীরভূমের গ্রাম জামোকুণ্ডিতে মন্দির নির্মাণ করে কৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। দেবতার রাজসিক ভোগ ব্যবস্থা করে সকলের চমক লাগিয়ে দিলেন। W. Ward এর "The Hindoos" গ্রন্থে দেখা যায়, রাজা নবকৃষ্ণ দেব কালীঘাট দর্শনে গিয়ে একদিনেই এক লক্ষ টাকা খরচ করেন। জয়নারায়ণ ঘোষাল খরচ করলেন একদিনে পঁচিশ হাজার টাকা। এই টাকায় অন্যান্য খরচের সঙ্গে পঁচিশটি মোষ, পাঁচটি ভেড়া এবং ১০৮টি ছাগ বলির ব্যবস্থাও করেন।

এরপর মাতৃশ্রাদ্ধ ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিরাট জাঁকজমক তো ছিলই। ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে খরচ করেন ১২ লক্ষ টাকা। নবকৃষ্ণ দেব এই উপলক্ষে ব্যয় করেন ৯ লক্ষ টাকা।

এ সব তো গেল সামাজিক পুণ্যকার্যের কথা। এতে সমাজে পুণ্যাত্মা বলে নাম পাওয়া যায় কিন্তু বড়লোকী জৌলুষ সবটুকু প্রকাশ পায় না।

সেই জৌলুষের ক্রিয়াকলাপও শুরু হয়ে যায়। প্রমোদ বিলাসিতা প্রকাশের জন্য ছিল বিগতবীর্য নবাবী আদর্শ আর নতুন বাদশাহ ইংরেজ বণিকদের আচার আচরণ। দুয়ের মধ্যেই গর্হিত অংশটুকু ছিল পরিমাণে বেশি এবং স্বভাবতঃই তার কটু গন্ধে হঠাৎ বড়লোকরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

প্রচুর পয়সা কামিয়ে প্রবাসী ইংরেজরা কি রকম বর্বর বিলাসিতার মধ্যে গা ভাসিয়ে দেয় তার বিবরণ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের "The Life and Time of Carey, Marshman and Ward" গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইংরেজ প্রভু ও ব্যবসায়ীরা পাদ্রীদের দুচোখে দেখতে পারতো না, তাদের জীবনাচরণের সমালোচনার জন্য। ইংলণ্ডের ওপর মহলে পাছে তাদের দুষ্কার্যের বিবরণ পৌঁছায়, এ ভয়ও সাদা নবাবদের ছিল। দেখা যায়, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ডকে প্রথমে কলকাতার মাটিতেই পা দিতে দেওয়া হল না। তাঁরা দিনেমার সরকারের আওতায় শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিলেন।

সব জিনিসেরই আলো-আঁধারি থাকে। আমরা শুধু বুঝছি, দেশে নতুন হাওয়া এসেছে। একটা আস্থার ভাব জেগেছে সর্বত্র। সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাসের পরিধি যে এতে বিস্তৃত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। দেশের সামাজিক ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তনের সূচনা হল। কবি রামপ্রসাদের কণ্ঠে এই পরিবর্তনের সুর প্রথম শোনা গেল।

রামপ্রসাদের একটি পদে অন্নের জন্য কাতর প্রার্থনা ফুটে উঠেছে—

"অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্নদা।"

ছিয়াত্তরের (১৭৬৯ খৃঃ) মন্বন্তরের প্রভাব এই গানে আছে কি না বলা যায় না। কবি গেয়েছেন—

মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলাম গৃহবাসী করিলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না॥

কিংবা দেবীর বিচারে বৈষম্যের সুর—

প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারী॥

কিংবা—

একি অসম্ভব কথা, শুনে বা কি বলবে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে ॥

অন্যত্র—

কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী ॥
কারেও দিলে ধন জন মা হয় হস্তীরথী জয়ী।
আর কারো ভাগ্যে মজুরখাটা শাকে অন্ন মিলে কই ॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমার ইচ্ছা তেম্নি রই।
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি কেউ নই ॥
কারো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই।
আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালী ধানে ভরা খই ॥
কেউবা বেড়ায় পালকী চড়ে আমি বোঝা বই।
মাগো আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়াছি গো মই ॥

এমনি বহু পদে রামপ্রসাদ ব্যক্তিগত দুঃখের কথা ব্যক্ত করেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যবানদের চিত্রও তুলে ধরেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন রামপ্রসাদের দুঃখকাতরতাকে 'দুঃখবাদ' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলি স্পষ্টই প্রমাণ করে তাঁর সংসারের প্রতি আসক্তি।

দুঃখবাদী কবির কাছে দুঃখের জন্য কোন অভিযোগ থাকে না। যেখানে কবি স্পষ্ট বলেন, "কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমার ইচ্ছা তেম্নি রই।" সেখানে সহজেই বোঝা যায়, কবির দুঃখ সৌভাগ্যসুখবঞ্চিত হওয়ার জন্য। কামনাবাসনায় তিনি আর পাঁচজন মানুষের মতই।

রামপ্রসাদের কবিতায় যে সুর শোনা গেল তা বাংলা সাহিত্যে তখন অভিনব। প্রথম বৈষয়িক কামনাবাসনা কবিতার বিষয় হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তুলনা করে মনে যে ক্ষোভের জন্ম হয়, সেই অক্ষমতা-জনিত ক্ষোভের প্রকাশে বাস্তবতার একটি নতুন দিগন্ত বাংলাসাহিত্যে খুলে গেল। আমাদের প্রশ্ন, এই দিগন্তখোলার জন্য শাক্তপদাবলী এবং একজন সাধকের প্রয়োজন হল কেন?

শাক্তপদাবলী নামতঃই ধর্মবিষয়ক কবিতা। শক্তিদেবীর মহিমাগান, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ, তাঁর কাছে আত্মনিবেদন যেখানে ধর্মীয় সকল শিষ্টাচার মেনে শাক্তপদাবলীতে ঘটেছে, সেখানে এই অভিনব সাহিত্যলক্ষণের প্রকাশ ঘটে কিরূপে?

তখনও ধর্মকে বাদ দিয়ে সাহিত্যরচনার কথা ভাবা যেত না। অষ্টাদশের দ্বিতীয়ার্ধে কবিগানের বিষয়ও বৈষ্ণব ধর্মের তলানি। সাহিত্যিক প্রকাশের অন্য কোন মাধ্যমের অভাবই প্রধানতঃ শাক্তপদাবলীকে এই কার্যসাধনে রত করেছে।

অন্য সাহিত্যিক মাধ্যম বলতে ছিল একমাত্র বৈষ্ণব কবিতা। কিন্তু এই কাব্যধারার ভোগবিমুখতা, শাস্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং স্তিমিত সৃষ্টিপ্রবাহ সে সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক উচ্ছ্বাসকে তুলে ধরতে পারে নি।

শাক্তপদাবলী নব আবির্ভূত একটি সাহিত্যিক প্রকরণ। রচয়িতার ইচ্ছাই এই নিয়ন্ত্রণ-শক্তির মূলে। কেন কিভাবে এ সময় শাক্তধর্মের প্রাধান্য ঘটলো সে আলোচনা পরে করা হচ্ছে। এখানে শুধু আমরা দেখছি, নবআবির্ভূত শাক্তপদকর্তাদের পুরোধা পুরুষরূপে সাধককবি রামপ্রসাদকে।

রামপ্রসাদ সাধক ও গৃহী একসঙ্গে ছিলেন। বাল্যাবধি মাতৃপদে নিয়োজিতচিত্ত। অথচ সংসারের বেড়াও তাঁর চারদিকে। সংসারের বিভীষিকা অল্প বয়সেই তাঁর চিত্তকে গ্রাস করে। তাঁর পদে দেখি—

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে॥
শিশুকালে পিতা ম'লো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়েরের জলে॥
স্রোতের সেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবে না অগাধ জলে॥

সাংসারিক দায়িত্বকে তিনি এড়িয়ে যান নি আর পাঁচজন সাধকের মত। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁকে নানাভাবে চেষ্টা করতে হয়েছে। কখনও মনে হয়েছে—

ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকবো না আর এমন দেশে।

অথচ গৃহত্যাগ তিনি করেন নি। তিনি অনুভব করেছেন, 'অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি।' তিনি সংসারী হয়েছেন এবং অর্থোপার্জনের জন্যই শুধু বিদেশে গেছেন। এই অর্থোপার্জনেও যে সাংসারিক শান্তি মেলেনি তাঁর পদেই তার প্রমাণ আছে। কবি গেয়েছেন—

যখন তারা ধন উপার্জন, করেছিলাম দেশে বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে॥
এখন আমার ধন উপার্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে॥

কবির পার্থিব জীবন আকাঙ্ক্ষার এই চিত্রের সঙ্গে যুক্ত দেখতে পাই তাঁর অন্য কিছু কিছু পার্থিব অভিজ্ঞতা। তখন চাকরিবাকরির জন্য পেটে কিছু বিদ্যার প্রয়োজন হত। রামপ্রসাদকেও মৌলভীর কাছে পারসী পড়তে হয়েছিল। এ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা অনবদ্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে—

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে জাননা কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পড়াশুনার এই উদ্দেশ্যটিকেই এইভাবে প্রকাশ করেন—"বিদ্যা দদাদি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্তং"*

কবির আর একটি অভিজ্ঞতা—

অন্নে কারে পাওয়া যায় ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যে জন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত জোর জবরে॥

অর্থাৎ শক্তের সবাই ভক্ত। সাধকের অন্যান্য সাধুসন্ন্যাসীর সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। একটি পদে বলেছেন—

মন চাইরে মনের মত।
এমন আছে যোগী কত শত॥
বাঁধিয়ে মাথায় জটা, করে ফোঁটা ঋষির মত।
তারা বলে এক করে আর, আছে বট বৃক্ষ মত॥

সংক্ষেপে রামপ্রসাদের এই পার্থিবতার দিক। কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তাঁর অপার্থিবের কথা। তিনি যেন পার্থিব চিন্তার মাঝেই চমকে উঠে বলেন—

ছি ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জাননা, মাননা, শুননা কথা॥

তিনি মনকে সম্বোধন করে বলেন—

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥

তাছাড়া—

কালী বলে ডাকরে, ওরে ও মন, তিনি ভবপারের তরী।
কালী নামটা বড় মিঠা, বলবে দিবা শর্ব্বরী॥

* বাংলার বিদ্বৎসমাজ—বিনয় ঘোষ—পৃ: ৩০

তিনি মনকে বারবার সতর্ক করে দেন—

মন তোমার ভ্রম গেল না।
তুমি কালী কে তা চিনলে না॥

কবি জগজ্জননীকে বলেন—

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥

এই শ্যামার উপলব্ধি রামপ্রসাদচিত্তের আর এক দিক। পার্থিব ও অপার্থিবের দোটানায় পড়ে তাঁর উপলব্ধির কথাগুলি তাঁরই আবিষ্কৃত বিশেষ সুরে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। একদিকে পার্থিব জগতে নতুন জীবনজোয়ার, নতুন জীবনমূল্যায়ন, নবতর কর্মপ্রবাহ, অন্যদিকে কবির মনে অপার্থিবের অনন্ত ভাবপ্রবাহ। কবি রামপ্রসাদ ভাবউদ্বেলিত চিত্তকে ভাষার রূপে ধরে রাখলেন।

সাধারণ তান্ত্রিকের ধরণ-ধারণ সবই তাঁর ছিল কিন্তু তিনি সাধারণ তান্ত্রিক ছিলেন না। তাঁর এক জীবনীকার বলেছেন—"সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্গালা এই ভাষাত্রয়েতেই তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রত্যুত তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে কৌলাচার ধর্মেই বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন, অপিচ জ্ঞানাংশেও নিতান্ত হীন ছিলেন না—তৎকালবর্তি মূঢ়দিগের ন্যায় মোহমুগ্ধ ছিলেন না। তাঁহার স্বপ্রণীত পদাবলীতেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"*

রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন কিন্তু চিকিৎসাব্যবসা না করে করলেন পরের চাকরি। নানাবিধ ভাষা শিখলেন। স্বগ্রামের জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখলেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য কৃষ্ণরাম দাসের অনুসরণে। কবিত্বের প্রেরণায় রচনা করলেন 'কালীকীর্তন,' 'কৃষ্ণকীর্তন' প্রভৃতি। তিনি কবি ও সংসারী পার্থিব জীবনের নিয়মানুসারে। আবার তিনি শক্তিসাধক ধর্মীয় মনোভাবের তাগিদে।

তিনি সে ধর্মাচারের বিধি মানলেন কিন্তু প্রকৃতি মানলেন না। দেবতাকে তিনি আচারের মধ্যে নিবদ্ধ করে রাখলেন না। অথচ প্রকৃত সাধকের সব গুণই তাঁর ছিল। ব্রহ্মাস্বাদ গ্রহণও তিনি করেছিলেন। অন্তর দৈব আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভূমিতে থেকেই তিনি ভূমার স্বপ্নে বিভোর। এই বিভোরতারই স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর পদগুলি।

* শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারিলাল নন্দী সম্পাদিত "কালীকীর্তনে"র (১৮৫৫) ভূমিকা।

দেশের ভাগ্যতরণীর পালে পশ্চিমের নতুন হাওয়া ভর করেছে। দীর্ঘ পাঁচশো বছরের গুমোট গেছে কেটে। কবি রামপ্রসাদ খোলা মনপ্রাণ নিয়ে জীবন ও দেবতাকে দেখলেন। তাঁর দেখার বিশেষ গুণেই সাহিত্যের একটি নতুন ধারা খুলে গেল।

তাঁর অল্পপূর্বে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শাক্তপদাবলীর সুর শোনা গেছে। তাঁর সময়ে জমিদার, রাজা ও দেওয়ানদের কেউ কেউ শাক্তপদ রচনা করেছেন। কিন্তু রামপ্রসাদের পদে যা পাওয়া গেল, তা তাঁরই নিজস্ব এবং শাক্তপদাবলীর প্রকৃত মূল্য সেখানেই সাহিত্যধারা হিসেবে। তাঁর দেবীর উদ্দেশ্যে লেখা পদে মানব-জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতা বেদনা ধ্বনিত হয়েছে, আবার মানবজীবনের কথা বলতে গিয়ে আরাধ্যা দেবীর জন্য চিত্তের আকুলতার প্রকাশ ঘটেছে। সাংসারিক, কবি ও ভক্ত—রামপ্রসাদের রচনায় জীবনের এই ত্রিস্রোতসঙ্গম ঘটেছে।

।। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্তসাহিত্য ।।

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি সংস্কৃত পুরাণের অনুসরণ মাত্র। কেউ কাশীখণ্ড, কেউ বা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীকে অনুসরণ করেছেন। এখানে লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে পুরাণের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছে। পৌরাণিক দৃষ্টান্তে গ্রন্থগুলি পূর্ণ।

আবার কাঠামোও গৃহীত সংস্কৃত পুরাণ থেকে। সেই দেবতার মহিমাগান, সেই সৃষ্টি পত্তন কাহিনী, সেই তীর্থবর্ণনার স্থলে দিগ্‌বন্দনা, সেই ধান ভানতে শিবের গীত অর্থাৎ কাহিনী শৈথিল্য—এক কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র না রেখে হাজার কাহিনীর সমাবেশ। সংস্কৃত পুরাণগুলিই ছিল মঙ্গলকাব্যগুলির আদর্শ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত পুরাণের চর্চা শুরু হয়, এই শতাব্দীতে রামায়ণ ও ভাগবতের অনুবাদ তার নজির। মঙ্গলকাব্যগুলি যতদিন গেছে পুরাণের প্রভাবকে বেশী করে আত্মসাৎ করেছে। যে কোন মঙ্গলকাব্যের কাব্যধারাকে অনুসরণ করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রথমে সে যতটা লৌকিক পরে আর তত নয়। দেবতারা পর্যন্ত পৌরাণিক ভদ্রস্বভাব গ্রহণ করে ফেলেছে। মনসামঙ্গল কাব্যধারায় এ চিহ্ন সুস্পষ্ট।

আবার কবিরা একই ধারার বারবার অনুসরণ করতেন। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম—একজন কারও বিষয়ে লিখলে বিভিন্ন সময়ে দশজন সে বিষয়ে লিখে ফেলতেন। তাঁদের ব্যক্তিগত ছাপ লেখায় ফোটার সম্ভাবনা কোথায়? মনে হয় পারিপার্শ্বিক প্রভাবে ব্যক্তিগত কথা ভাবার অবকাশ ছিল না, তাই গতানুগতিক ধারায় তাঁরা গা ভাসিয়েছেন।

বৈষ্ণব কবিরা করেছেন ভাগবতকে অনুসরণ। তাঁরাও একই কথাকে বিভিন্ন ভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। সেই রাধার রূপ আর রাধাকৃষ্ণের পরস্পর আকর্ষণ বর্ণনাই তাঁদের বিষয়বস্তু। বৈচিত্র্য আনয়ন করতে গিয়ে ভাগবতধারারই অনুসরণ করেছেন বেশি করে।

দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় স্বাধীন প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়। বিদ্যাপতিও এ বিষয়ে ভাগবতের বন্ধনে বিশেষ ধরা পড়েন নি। সংস্কৃত কাব্যাদি ছিল অনেক সময়েই তাঁর আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস লৌকিক ধারারই বেশি অনুসরণকারী। বেশ বোঝা যায়, রাধাকৃষ্ণকাহিনীর ভাগবতীয় ধারার পাশে পাশে একটি লৌকিক ধারা অবিরত বয়ে চলেছিল।

জয়দেব কাব্যে স্পষ্ট বলেছেন, তাঁর কাব্যের দ্বিমুখী উদ্দেশ্য—হরির স্মরণ ও বিলাস-কলার চরিতার্থতা সম্পাদন। যদি হরির স্মরণের ব্যাপারটি রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর প্রধান বিষয় হত, কবি জয়দেব একথা বলতে সাহস করতেন না। বেশ বোঝা যায় জয়দেব রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর লৌকিক ধারাটির সঙ্গে সম্যক রূপে পরিচিত ছিলেন এবং জনচিত্তে তার প্রভাবের কথাও জানতেন।

ভাগবতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলাই মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। রাধার নামই উচ্চারিত হয়নি সেখানে। একমাত্র রাসলীলাতেই মানবিকতার স্পর্শটুকু অনুভব করা যায়। অন্যথায় ভাগবত একখানি পুরাণ এবং ভগবান কৃষ্ণের মহিমাগানেই তা সম্পূর্ণ।

জয়দেব রচনা করলেন একখানি কাব্য। ভাগবতের মহাশক্তিধর কৃষ্ণকে নায়ক করে নিলেন। আর সুন্দরী রাধাকে করলেন তার প্রণয়িনী। যমুনা তীর, কুঞ্জবন প্রভৃতি পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব প্রতীকগুলিকে প্রণয় বর্ণনার পরিবেশ রচনায় নিয়োগ করলেন। তাঁর হাতে রাধাকৃষ্ণের লৌকিক কাহিনী ভাগবতীয় পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে প্রথম সম্মিলিত হল। তাই তাঁর কাব্যের একটি উদ্দেশ্য বিলাস-কলার চরিতার্থতা অপরটি হরি শ্রীকৃষ্ণের মহত্ব সম্পাদন। গ্রন্থে ঐশ্বর্যলীলার স্থলে মানবী নায়িকার মান অভিমান, প্রণয়ের শঙ্কা ও সঙ্গমের উদ্বেল আনন্দ।

বিদ্যাপতি ও বড়ুচণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী দুই কবি দু ভাবে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীধারাকে অনুসরণ করেছেন। বড়ু ভাগবতের আখ্যান জানতেন, গ্রন্থেই তার প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি অনুসরণ করলেন লৌকিকধারা। ফলে পরবর্তীকালের বৈষ্ণবেরা তাঁকে ত্যাগ করলেন, তিনি গোয়াল ঘরের চালের বাতা আশ্রয় করে ঘোর বৈষ্ণবতার যুগে কারু মনে অশুচি দোষ ঘটালেন না।

আর বিদ্যাপতি করলেন একাধারে ভাগবত, জয়দেব ও সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ। তাঁর রচনায় যুক্ত হল তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা, যার প্রেরণায় তিনি বয়ঃ-

সম্ভির ও ভাবসম্মিলনের পদ লিখে সকলকে বিস্মিত করলেন। তাঁর অভিসার, মানঅভিমান, বিরহ—সবেতেই লৌকিক ও অলৌকিকতার স্পর্শ। প্রত্যেকটি স্তর প্রথমে স্থূল লৌকিক আঙ্গিক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং শেষ অলৌকিকতার উত্তুঙ্গ তোরণে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

এই অলৌকিকতা কোনরূপ ভক্তিজাত সামগ্রী নয়। কবির প্রতিভার পরশপাথরের স্পর্শে লৌকিক লৌহ অলৌকিক স্বর্ণে পরিণত হয়েছে। ফলে তিনি ও জয়দেব নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের আসরে স্থান পেয়েছেন।

কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রকৃত সৃষ্টিধর্মী যুগ এই জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে নিয়েই। এখানে প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশে তৎপর।

পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে উৎকৃষ্ট পদ আছে, নাই কবির স্বাধীনতা। সবই গতানুগতিক। বৈষ্ণব মহান্তদের নির্দেশ, ভাগবতের আদর্শ ও শ্রীচৈতন্যের ভাবপ্রেরণায় চালিত হয়ে ভক্ত বৈষ্ণব কবিরা একই বিষয় নিয়ে বারবার কবিতা রচনা করে গেছেন। এরই মধ্যে কোন কোন পদে রাধার আচরণের মধ্যে মানবিকতার স্পর্শটুকু অনুভব করা যায়, পদ সেখানে রসোত্তীর্ণ। না হলে দিনের পর দিন ভাগবতের অনুসরণ ক্রমাগত ব্যাপকতা লাভ করে চলেছে বৈষ্ণব পদের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাধক কবি রামপ্রসাদের রচনায় সর্বপ্রথম কবির মনোভূমি থেকে পরাধীনতাশৃঙ্খল খুলে গেল। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য পূর্বধারার অনুসরণ, 'কালীকীর্তনে' পৌরাণিক আদর্শ সুস্পষ্ট, সাধনবিষয়ক পদে তন্ত্র ও অন্যান্য শাক্ত আদর্শের ছাপ রয়েছে। কিন্তু রামপ্রসাদরচনার এই সব নয়।

রামপ্রসাদের অধুনাতন কাল পর্যন্ত অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে এই রচনাগুলির কোন ভূমিকা নাই। রামপ্রসাদ যে কারণে দুঃখী, উদাসী এবং হঠাৎ আনন্দে উচ্ছ্বসিত মানবের কাছে যখন তখন স্মরণীয় হয়ে আছেন, সে কারণটি হল তাঁর পূর্ববর্ণিত বৈষয়িক চিন্তাপ্রধান পদগুলি।

এই পদগুলিতে কবি দেবীর কাছেই তাঁর সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষার কথা নিবেদন করেছেন। তাঁরই কাছে অভিযোগ করেছেন আবার প্রতিকারও চেয়েছেন। প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গে আঙ্গিকগত দিক দিয়ে রামপ্রসাদের এইটুকুই যোগ। অর্থাৎ তিনি দেবতাকে বাদ দিয়ে নিজের কথা বলতে পারেন নি। যেমন পারেন নি জয়দেব, যেমন অসমর্থ ছিলেন বিদ্যাপতি।

কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবি কিংবা চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা সর্বাঙ্গে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরেছিলেন, রামপ্রসাদ তাঁদেরই পথ ধরে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করে

গেলেন। দেবতাকে লক্ষ্য করে নিজের কথা বললেন আবার নিজের কথা বলতে গিয়ে দেবতাকে টেনে এনে ফেললেন। 'বৈষয়িকতা' চিহ্নিত পদগুলিতে দেবতা ও মানুষের যুগপৎ উপস্থিতি কবির ভক্ত সত্তারই পরিচায়ক কিন্তু এতেই সাহিত্যে নিজের কথা বলার পথ উন্মুক্ত হল।

রামপ্রসাদের ধর্মমিশ্রিত আন্তরিকতাপূর্ণ পদগুলিতে যে গীতিকবিতার সৃষ্টি হল তারই জের টেনে পরবর্তী শতাব্দীতে ধর্মসম্পর্কশূন্য সার্থক গীতি কবিতার জন্ম হল।

হিন্দুর জীবনে শাক্তপ্রভাব
এবং রামপ্রসাদের সমন্বয়বাদ

॥ কবি অভিনন্দের রামচরিত ॥

শাক্তসাধকের কণ্ঠে শাক্তগীতি বা পদাবলী গান প্রথম শোনা গেল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বৈষ্ণব কবির কাব্যসৃষ্টিপ্রবাহ স্তিমিত, অর্থাৎ সৃষ্টির নতুন জোয়ার বা নতুন ভাবের আমদানী বন্ধ। শাস্ত্রীয় বিধানে বৈষ্ণব কবির হাত পা বাঁধা। অষ্টাদশের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনজাত যে ভাব-প্রতিক্রিয়ার প্লাবন উপস্থিত স্বভাবতঃই সঙ্গীত বা কবিতার মধ্যে তার প্রকাশপথ উন্মুক্ত হওয়া চাই।

অষ্টাদশের দ্বিতীয়ার্ধে কবিগানের মধ্যে তার কিছুটা প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু যথার্থ ভাব-চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করা গেল শাক্তপদগুলির মধ্যে। শাক্তকবিদের পদরচনায় স্বাধীনতা এবং শাক্তভাবে নতুনতর উদারতার অভিব্যক্তিই যুগচেতনাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাকে সাফল্য দান করেছে। বিষয়টি বোঝার জন্য কিছু পূর্ব ইতিহাসের আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাংলায় পাল শাসনের অবসান হয়ে সেনরাজা-দের রাজত্ব শুরু হ'ল। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের স্থলে শৈবধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হল। সরকারীভাবে বৌদ্ধরাজত্বের অবসান এ সময় ঘটলেও বৌদ্ধপ্রভাবের হ্রাস লক্ষিত হয়েছে অনেক পূর্ব থেকে। বৌদ্ধযুগের শেষাংশের পালনৃপতিরা বহুলাংশেই পরমত-সহিষ্ণু, হিন্দুদেবদেবীর পূজা ও প্রচারে নিরপেক্ষচিত্ত ছিলেন। বৌদ্ধআমলের শেষে অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীতে মদনপালদেবের সময়ে রামপালদেবের জীবনী নিয়ে লেখা সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থখানি এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলিল।

প্রবলপ্রতাপ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের শেষ লগ্নে হিন্দুধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে মুসলমান যুগ অবসানের পরে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলির যে চিত্র চোখে পড়ে তার অনেক মিল আছে। ব্যাপারটি খোলসা করে দেখা দরকার।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি অভিনন্দ 'রামচরিত'* নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি আমাদের ধর্মীয় জীবনের একখানি মূল্যবান তথ্যপঞ্জী, অথচ সন্ধ্যাকরের গ্রন্থ যেরূপ আলোচিত ও সমাদৃত, এর ভাগ্যে সেরূপ ঘটেনি।

তৃতীয় পালনৃপতি দেবপাল ছিলেন অভিনন্দের পৃষ্ঠপোষক। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মাত্র তিনটি কাণ্ড—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কতকাংশ, সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ড এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মূল রামায়ণ থেকে এই গ্রন্থের ঘটনা ও চরিত্রনির্মাণে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং এই পার্থক্যই সমকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের নজির হয়ে আছে। হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘনের কালে নাগমাতা সুরসার বন্দনাটি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। মূল রামায়ণে হনুমান তাঁকে কৌশলে অতিক্রম করে গেছে। অভিনন্দের 'রামচরিতের' ষোড়শ সর্গে হনুমান-সুরসার সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। সুরসা হনুমানের কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য অভিনবভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

শক্তিরস্মি জগদীশিতুরুগ্রা সংহরামি সময়প্রতিপক্ষম্।
উদ্ধরামি চ ভবার্ণবমগ্নানীক্ষিতেন পশুকানুসন্নান্ ॥

এই পরিচয় পাওয়ার পর ৫৭তম শ্লোক থেকে ৭৮তম শ্লোক পর্যন্ত হনুমানের দীর্ঘ স্তুতি বর্ণিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবীসপ্তশতী'তে বর্ণিত দেবীর মহিমা এবং পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের চৌতিশাস্তোত্রের দেবী-মহিমা সমস্তই এই স্তুতির মধ্যে আছে। হনুমান বলেছে—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শক্তিপূজার ব্যাপক প্রসারতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে শুধু।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্রকে দিয়ে দুর্গাপূজা করানোর ব্যাপারটি অভিনন্দের ধারার অনুসরণ। তাছাড়া শরৎকালে দুর্গাপূজার আয়োজন অভিনবও কিছু নয়।

সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ উত্তর প্রদেশের গঙ্গাতীরবর্তী একস্থানে শরৎকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পূজারীরা ছিল ডাকাত এবং হিউয়েন সিয়াঙকে তারা নরবলির জন্য নিয়ে যায়।* ঘটনাটি দুদিক থেকে তাৎপর্য-পূর্ণ—শরৎকালে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান এবং ডাকাতদের কালীর বদলে প্রথমে দুর্গাপূজা।

শ্রীচৈতন্যপূর্বযুগের শাক্তপ্রভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় কৃত্তিবাসী রামায়ণে রয়েছে। নাগমাতা সুরসার পথ-অবরোধের দ্বারা হনুমানের শক্তিপরীক্ষার বিবরণ, লঙ্কার রক্ষাকর্ত্রী চামুণ্ডাকে লঙ্কা থেকে হনুমানের স্তবে অপসারণের কাহিনী, রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বৃত্তান্ত এবং যেখানে সেখানে শিবদুর্গার প্রসঙ্গ ও প্রভাবের কথা প্রকৃতই শাক্তযুগের পরিচায়ক।

বাল্মীকি লঙ্কাকাণ্ডের শেষে সীতার অগ্নি পরীক্ষার পর ব্রহ্মার মুখ দিয়ে রামচন্দ্রের অবতারত্ব আরোপ করেছেন। কৃত্তিবাস গ্রন্থের প্রথম থেকেই এই অবতারত্বের ভূমিকা রামচন্দ্রকে দিয়েছেন, কারণ তিনি বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করেন নি, অবতার রামচন্দ্রের কীর্তিগাথা প্রচারই তাঁর লক্ষ্য। তাই বাল্মীকিসৃষ্ট কাহিনীতেও তিনি সন্তুষ্ট নন। নানা পুরাণ ও লোককথা থেকে তিনি রামচন্দ্রের মহিমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন এবং কাহিনীতেও বহু নতুন চমক এনেছেন। বাল্মীকি বলেন নি, কিংবা বললেও ইঙ্গিতে বলেছেন এমন সব ঘটনার কথা লিখেছেন বলে কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন। আবার 'জৈমিনী ভারত' থেকেও কাহিনী নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন। এমন সব বিবরণ কৃত্তিবাসে পাওয়া যায়, যা অন্য কোন গ্রন্থের সামগ্রী নয়। অবশ্যই কৃত্তিবাস সেগুলি লোককথা থেকে নিয়েছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বৈষ্ণবত্ব অবতার রামচন্দ্রের প্রভাবের পরিচয় ছাড়া কিছু নয়।

অভিনন্দের গ্রন্থে হনুমান যেভাবে চণ্ডীরূপে সুরসার পূজা করেছে অর্থাৎ তার বন্দনার নির্জনতা ও ভয়াবহতা শাক্তধর্মের তৎকালীন নিভৃত সাধনার ইঙ্গিত যেমন দেয় তেমনি শক্তিদেবীর বা শাক্তধর্মের অসাধারণ প্রতিষ্ঠার পরিচয়ও এর মধ্যে রয়েছে।

এই গ্রন্থের অন্যত্র মন্দোদরীর মানভঞ্জনের একটি চিত্র জয়দেবপূর্ববর্তী এ জাতীয় রচনার

* Samuel Beal অনূদিত The life of Hiuen-Tsiang (1888) পৃঃ ৮৬

পরিচয় হিসেবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিভীষণকে ত্যাগ করায় অভিমানিনী মন্দোদরীর মান ভাঙাচ্ছে রাবণ—

আপাণিগ্রহণাদ্দেবি দাসস্তে দশকন্ধরঃ।
অয়ং লাক্ষারসেনাস্য পাদৌ পল্লবয়িষ্যতি॥
ইতি পাদতলপ্রাপ্তপ্রস্বিন্নকরপল্লবম্।
রুরোধ ত্রপমাণেব রাবণাং রমণা নিজা॥

এই চিত্র 'দেহি পদ-পল্লবমুদারম্' শ্লোকেরই পূর্ব সংস্করণ।
অভিনন্দ দশজন অবতারের বন্দনা করেন নি। বাল্মীকির রামকে অবতারত্বে মণ্ডিত করে দেখালেও শঙ্করাচার্যের পরবর্তী কবি বুদ্ধদেবকে অবতার করলেন না, সম্ভবতঃ বৌদ্ধরাজার আশ্রিত ছিলেন বলে। জয়দেব অকপটে দশাবতার বন্দনা করেছেন আরও দুশো বছর পরে।

অভিনন্দের গ্রন্থে বিভীষণের মুখে মায়াবাদের উল্লেখ তৎকালীন শঙ্করাচার্য-প্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মন্দোদরীর কথাগুলি। মন্দোদরী শৈব ও বৈষ্ণবের সাম্যের কথা বলেছে, হরিহরের একাত্মতার বাণী প্রচার করেছে। মন্দোদরী বলেছে (চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ-১১২—১১৪ শ্লোক)—

অর্ধে পুংসঃ পুরাণস্য দেবৌ হরিহরাবুভৌ।
একং তত্র প্রপন্নস্য প্রদ্বেষঃ কস্তবাপরে॥
যো হরিঃ স হরো দেবঃ যো হরঃ স পিতামহঃ।
নামত্রয়বিভিন্নেয়মেকৈব ত্রিদশময়ী॥
য এতাং বেত্তি স বুধো যো নমস্যতি সোऽনঘঃ।
যোऽভ্যস্যতি স তত্রৈব লীয়তে লীনবিক্রিয়ঃ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থে বারংবার উল্লিখিত হতে দেখি—

হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদ যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

এখানে উক্তিটি অন্নদার অর্থাৎ শক্তিদেবীর। অন্যত্র দেখি শিব বলছেন—হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।

অভেদ যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর॥

বিষ্ণুর মুখেও এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

নবম শতাব্দীর ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কবির মধ্যে ন'শো বছরের ব্যবধান। একজন বৌদ্ধযুগের প্রায় অস্তলগ্নের কবি অপরজন রাজনৈতিক আকাশ থেকে মুসলমান যুগনক্ষত্রের খসে যাওয়ার সময়ের- কবি। কাল ও অবস্থার ব্যবধান সত্ত্বেও উভয়

কবির দৃষ্টিভঙ্গীর এই সমতা, বাঙালীর জীবনে বহু বিক্ষোভ সত্বেও একই সংস্কৃতি প্রবাহ যে বরাবর বয়ে চলেছে তারই প্রমাণ দিচ্ছে। আমাদের এই ব্যবধানপর্বের চিত্রটি ভাল করে ভেবে দেখা উচিত।

॥ বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম ॥

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক যুগে বিশেষ করে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত সময়ে দুটি ধর্মধারার প্রাধান্য সব সময়ে লক্ষ্য করা গেছে। ধর্ম দুটি হল বৈষ্ণব ধর্ম ও শাক্ত ধর্ম। ধর্ম দুটি মূলে এক ছিল কি না, থাকলে দুই হ'ল কি করে এ সব আলোচনা গূঢ়তর ধর্ম ব্যাখ্যার অঙ্গীভূত। বর্তমানে আমাদের সে প্রয়োজন নাই। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে নরদেহে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বের ধর্মচিত্র বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে বিধৃত। আমরা পূর্বের একটি উল্লেখে দেখেছি, শাক্ত প্রভাব তখন অত্যন্ত বেশি। বৈষ্ণব যে ছিলেন, তারও প্রমাণ রয়েছে। অদ্বৈত আচার্য, মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানগত (Institutional) বৈষ্ণবধর্ম তখন এখানে ছিল না। ছিল চতুর্দিকে শাক্তের ছড়াছড়ি। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

জগৎপ্রমত্ত ধনপুত্রবিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপহাসে॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতি সতী তপস্বীও যাইব মরিয়া॥

অন্যত্র লিখেছেন—

নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ-গেহ-ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥
কৃষ্ণযাত্রা-মহোৎসব-পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি কর্ম্মে সে আনন্দ করি মরে॥

সংসারবিরক্ত বৈষ্ণবকে বলতো—

এত যে গোসাঞিভাবে করহ ক্রন্দন।
তবুত দারিদ্র্য দুঃখ না হয় খণ্ডন॥

বৃন্দাবন দাস আরও লিখেছেন—

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ "চৈতন্যভাগবত" পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলাদেশের একখানি প্রামাণ্য তথ্যগ্রন্থ। 'চৈতন্যভাগবতে'র শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে শ্রীচৈতন্যের সমগ্র নবদ্বীপবাসকালীন নবদ্বীপের বর্ণনা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। নবদ্বীপ সর্বপ্রকারে তখন বাঙালী হিন্দুর সংস্কৃতিকেন্দ্র, সুতরাং বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা থেকে আমরা তৎকালীন বাঙালী হিন্দুর সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্যনির্ভর চিত্র পাই। এই চিত্রটি সংক্ষেপে হল—সমাজের সর্বস্তরে শাক্তধর্মের প্রাধান্য এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাহীনতা।

বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা পূর্বে কোনকালেই ছিল না, সুতরাং এর অভাবটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু নবম শতাব্দীতে প্রাপ্ত এবং সেন আমলে বর্ধিত শক্তি নিয়ে শাক্ত-ধর্ম যে বাঙলায় তখন বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বোঝা যায়। এই প্রতিষ্ঠায় বৃন্দাবন দাসের অসহিষ্ণুতা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে, কিন্তু এরই আর একটি ভাববার দিক আছে। শাক্তধর্মের বাড়াবাড়ি অর্থাৎ মদ্য মাংস প্রভৃতি নিয়ে যথেচ্ছাচার এবং অন্যমতঅসহিষ্ণুতা যা জগাই-মাধাইএর আচরণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তা সুস্থ চিন্তার অধিকারী এবং উদারমতাবলম্বী অনেকেরই বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল বোঝা যায়।

শাক্তধর্মের শক্তি বৃদ্ধির আরও নজির মিলছে ষোড়শ শতাব্দীতে।

শ্রীচৈতন্য দেহরক্ষা করেন ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর বৈষ্ণবীয় লীলাভূমি ছিল নীলাচল। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পরই নীলাচল চলে যান। ভক্তরা অবিরত সেখানে যাতায়াত করতেন এবং প্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে থাকতে নির্দেশ দেন তাঁরই বাণী প্রচারের জন্য। কিন্তু তত্ত্বগত শিক্ষা দিলেন যাঁদের তাঁরা তাঁর তিরোধানের পর রইলেন বৃন্দাবনে। সেখান থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে শ্রীনিবাসনরোত্তমশ্যামানন্দবাহিত হয়ে বৈষ্ণবগ্রন্থরাজি গৌড়ে এল এবং খেতুরির উৎসবের (আনুমানিক ১৫৮২ খৃঃ) পরে তাই বাঙালির বৈষ্ণবদের আচরণ বিধিতে পরিণত হল।

জাহ্নবাদেবী এবং বীরভদ্রও বৃন্দাবন ঘুরে এসে বিধিমতে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠায় রত হলেন।

শ্রীচৈতন্য সমসাময়িককালে তাঁর ব্যক্তিপ্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের যে জোয়ার বাংলা দেশের অংশবিশেষকে প্রবলভাবে অধিকার করেছিল, তাঁর তিরোধানের পর তা স্তিমিত হয়ে আসে উপযুক্ত নির্দেশনার অভাবে। শ্রীনিবাসাদির কার্য এই অভাবকে দূর করে ধর্ম হিসেবে বৈষ্ণবতাকে শক্ত কাঠামোয় স্থাপন করে।

শ্রীচৈতন্যের যুগটি বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুগ। ঐতিহাসিক ডঃ তপনকুমার রায়চৌধুরী তাঁর "Bengal under Akbar and Jahangir" গ্রন্থে লিখেছেন—

During the earlier half of the 16th century the religious and intellectual life of Bengal had throbbed with the intense activity of men of unusual stature. In that memorable epoc Chaitanya revitalised the cult of Bhakti, Raghunath Siromani founded the system of Gaudiya Navyanaya, Raghunandana re-wrote the Smriti and brought it uptodate and Krishnananda Agamavagisa compiled his Tantrasara, still reckoned as the most authoritative work of its kind.

হাণ্টার সাহেব "Statistical survey of Bengal" গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িকরূপে এক কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌমের উল্লেখ করেছেন। তাঁকে দীপান্বিতা শ্যামা পূজার স্রষ্টা এবং 'তন্ত্রসার' রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তী অনেকেই এই তথ্য গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু প্রকৃত তথ্য তা নয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে দ্বিতীয় কোন তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দের অস্তিত্ব অসম্ভব নয় এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকেই কালীপূজার রাত্রিটি আলোক সজ্জায় সজ্জিত করার রীতি প্রচলিত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু এ কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসার রচয়িতা নন এবং ইনি কালীর প্রথম মৃন্ময়ী মূর্তির প্রতিষ্ঠাতাও নন।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্যসমসাময়িক এবং তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতের আদি লীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
সভারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥

কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্যের উপাধি ছিল আগমবাগীশ। তিনি সুবৃহৎ 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কার্তিকী অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত শ্যামাপূজার তিনিই প্রবর্তক। তাঁর পূর্বে ঘটে এই পূজার বিধান ছিল। কৃষ্ণানন্দই প্রথম ভগবতী কালিকা দেবীর মূর্তি প্রচলন করেন এবং পরিকল্পনা সবই তাঁর নিজস্ব।

শ্রীচৈতন্যসমসাময়িককালে কৃষ্ণানন্দের কার্যকলাপ বিশেষ করে শ্যামামূর্তি প্রচলনের ব্যাপারটি তৎকালীন শাক্তপ্রাধান্যের পরিচয় প্রদান করে। এই শতাব্দীর শেষের দিকে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রচিত পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজকের শাক্তক্রম, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে রচিত চন্দ্রশেখরের পুরশ্চরণ দীপিকা এবং এ ছাড়া এই শতাব্দীর তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, শ্যামা-রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ শতাব্দীর শাক্তপ্রাধান্যের পরিচয় দেয়।

আমাদের দেশের ধর্মীয় ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, কোন কিছুর বাড়াবাড়ি কোন সময়েই জনচিত্তে চিরকাল সমর্থন লাভ করে নাই। বৈদিক যজ্ঞাদির নৃশংস

বাড়াবাড়িই একসময় অহিংস বৌদ্ধধর্মকে ভারতভূমিতে স্থাপিত করেছিল। অনুরূপভাবেই শাক্তধর্মের বাড়াবাড়ি ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যস্থাপিত বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের মূল কারণ মনে করলে ভুল হবে না।

শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় মহাসত্তার কথা মনে রেখেও বলা চলে বাংলাদেশের প্রথম এবং সার্থক সমাজ সংস্কারকরূপে তাঁর নামোল্লেখ করা যায়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহরদ, সতীদাহ প্রথা দমন প্রভৃতি যে কটি সামাজিক আন্দোলন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সামাজিক জীবনকে আলোড়িত করেছে, তার সবগুলিরই প্রাথমিক অস্তিত্ব শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় নানা আচরণ ও উপদেশের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

যে শাক্তধর্ম দীর্ঘকাল গোপন তপস্যায় নিয়োজিত ছিল, মুসলমান আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলানোর পর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একদিকে যেমন তার সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, সম্ভবতঃ নির্বীর্য পরাধীন জাতির অন্তরে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য, তেমনি অন্যদিকে শাক্তধর্মের নানা অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে ঘটতে লাগলো।

এই অনুষ্ঠানাদির নানা দোষত্রুটি অপনোদনের জন্যই কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' সংগ্রহ, আবার তন্ত্রারাধনায় অধিকতর ইন্ধন যোগানোর জন্যই শ্যামামায়ের মূর্তিপূজার ব্যবস্থা।

কৃষ্ণানন্দের গ্রন্থের মূল লক্ষ্য কিন্তু অত্যন্ত ব্যভিচারিতা থেকে শাক্তধর্মকে রক্ষা করে তার মধ্যে সাত্ত্বিকতার অনুপ্রবেশ ঘটানো। শাক্তধর্মের প্রবল প্রসার যেমন শ্রীচৈতন্যসময়ে বর্তমান ছিল, শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সত্ত্বেও যে তার প্রসার কিছুমাত্র কমে নি, ষোড়শ শতাব্দীর শেষে রচিত তন্ত্রগ্রন্থগুলি তার প্রমাণ দেয়। আমরা বুঝতে পারছি তান্ত্রিক চক্রাদি অমাবস্যার ঘনান্ধকারে অনুষ্ঠিত হলেও শাক্তধর্ম তার গোপনীয়তার খোলস খুলে ফেলে সমাজের অলিতে গলিতে প্রবেশ করেছে।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত রাগানুগ প্রেমধর্ম তান্ত্রিকতার একটি সহজ ও ভদ্র সংস্করণে পরিণত হল তাঁর তিরোধানের অল্প পরেই। কারণ তাঁর পরেই বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এ জাতীয় জাগরণের পরিচয় রয়েছে। ডক্টর তপন রায়চৌধুরীর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখিত রয়েছে—

The followers of this cult (Sahajiya) accepted early without question the Godhood of Chaitanya. Rasakadamba, the work which is supposed to have first embodied the new Sahajia ideas, referred with deep respect not to Chaitanya alone, but to all his great followers as well. Anandabhairava and Amritarasavali also did the same, while Agama explained in detail the theory of Chaitanya's incarnation. Anandabhairava traced back the origin of Sahajia practices to Virabhadra, Nityananda and ultimately to Chaitanya, while Amritarasavali traced it back to the same ultimate source through Krishnadas kabiraj, the Vrindavan Gosvamins and Nityananda. The ideal of 'Prakritibhajana', the starting point of

post Chaitanya Sahajia development loomed large in the standard vaishnava works of the period. Spiritual participation in the love dallianee of Radha krishna as a female companion of Radha witnessing the sport divine was the essence of this particular form of mystic culture... Premvilasa spoke of Narottama's initiation into this particular form of mystic culture by Srijiva. ("Post Chaitanya Vaishnava Sahajiya cult" পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম শাক্তধর্মের প্রভাবকে স্থানবিশেষে কমিয়ে দিলেও এবং এর প্রকাশকে কিছু পরিমাণে সাত্বিকতামণ্ডিত করলেও শাক্তধর্ম আপন অস্তিত্বে শুধু বলীয়ান ছিল না, বৈষ্ণবধর্মকে গ্রাস করারও আয়োজন আরম্ভ করে দিয়েছিল। তবে মধ্যযুগীয় বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে শাক্তধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের ব্যাপারটি কোন ক্রমেই ছোট করে দেখা যায় না।

নরহরি চক্রবর্তী রচিত নরোত্তমজীবনী 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে অনেকগুলি শাক্ত থেকে বৈষ্ণবে ধর্মান্তরকরণের ঘটনা আছে। কিন্তু লক্ষণীয় সকলগুলিতেই ভক্ত বৈষ্ণব হয়েছে স্বপ্নে শক্তিদেবীর আদেশ পেয়ে। ষোড়শের শেষ ও সপ্তদশের প্রথম দিকে বৈষ্ণবতার প্রসার সাধনে এরকম শক্তিনির্ভতার দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে কৌতুকপ্রদ।

কিন্তু কৌতুকচিত্র আরও কিছু দেখার অপেক্ষা রাখছে। বাঙলায় শাক্তপ্রাধান্যের একটি অতি কৌতুককর উল্লেখ মনস্বী ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের "শিবাজী" গ্রন্থে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর তিনশোতম সিংহাসনারোহণ (১৯৭৪) উৎসব পালনকালে কেউই হয়তো খেয়াল করেন নি যে শিবাজীর দুবার রাজ্যাভিষেক হয়। প্রথমবার ৬ই জুন, ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে বৈদিক ও ক্ষাত্রমতে এবং দ্বিতীয়বার ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তান্ত্রিকমতে।

প্রথম রাজ্যাভিষেকের পর নানা রকম ভয় দেখিয়ে যিনি পুনরায় রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান করালেন তিনি একজন বাংলাদেশের তান্ত্রিক, নাম নিশ্চল পুরী গোস্বামী। 'Shivaji' গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় দেখি—

Gaga Bhatta, the director of Shivaji's first coronation rites, was a follower of the vedic system of Hindu theology and the patron of Brahmans belonging to that school, while Nishchal was the champion of the (Bengali) Tantrik School, and the two differed as Jew from Gentile.

বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'শিবাজী' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে শাক্তপ্রভাবের প্রচণ্ডতার পরিচয় যেমন এই ঘটনায় পাওয়া যায় তেমনি ব্রাহ্মণ ও সাধু সন্ন্যাসীদের

উৎকট লোভের পরিচয়ে স্তম্ভিত হতে হয়। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা প্রথম রাজ্যাভিষেকের সময় দক্ষিণার বদলে লাঞ্ছনা লাভ করে, তাতেই দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেকের প্রয়োজন হয়।

॥ রামপ্রসাদের পদে সমন্বয়ের সুর ॥

এক সময় বৌদ্ধধর্মের সারটুকু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে বুদ্ধকে হিন্দুর অবতারে পরিণত করে ভারতে এক অপূর্ব ধর্ম্ম সমন্বয় ঘটায়। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের আভির্ভাব এবং শেষে হিন্দুধর্মের সঙ্গেই তার সমন্বয়প্রচেষ্টা।

অনুরূপ পরিচয়ই পাওয়া যায় বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্রে। শাক্তধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যুগ প্রয়োজনেই বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত কবি সাধক রামপ্রসাদ গাইলেন—

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে—
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী॥

কিংবা অন্যত্র—

ও মন, তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত,
হরি-হর তোর এক হ'লো না।
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূল কথা মনে বোঝ না;
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে
ক'রে আত্ম-প্রতারণা।
অসি-বাঁশীর মর্ম্ম বুঝে
(তোমার) কর্ম্ম করা আর হ'লো না।
যমুনা আর জাহ্নবীকে
একভাবে মনে ভাব না।
প্রসাদ বলে, গণ্ডগোলে
এ যে কপট উপাসনা।
(তুমি) শ্যাম-শ্যামাকে প্রভেদ কর,
চক্ষু থাকৃতে হ'লে কাণা॥

এই কথারই প্রতিধ্বনি আর একটি পদে শুনতে পাই—

যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি ;
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ?

শ্যামার উদ্দেশ্যে কবি বলেন—

ব্রজেতে বালিকা হয়ে যশোদাকে মা বলিলি।
আবার কৃষ্ণ হয়ে মাটি খেয়ে
মুখে ত্রিভুবন দেখালি ॥

কবি বেদ, আগম, পুরাণগ্রন্থ অনুসন্ধান করে শ্যামার কি রূপের পরিচয় পেলেন দেখুন—

কালি ব্রহ্মময়ি গো।
বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোজ তালাসি ॥
মহাকালী কৃষ্ণশিব রাম সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥
দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশুসঙ্গে এক বয়সী।
এ মা অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥

পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা রামপ্রসাদের বৈষয়িকতাপূর্ণ পদগুলির পরিচয় দিয়েছি, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা বলেছি। এখন তাঁর আর এক রূপের পরিচয় পেলাম।

রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার একটি কারণ যেমন মানবমনের সর্বাবস্থার রূপদানের মধ্যে রয়েছে, তেমনি অপর কারণটি তাঁর ধর্মীয় উদারতা। তিনি চিরকালের জন্য সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিলেন।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক শাক্ত। তাঁর শক্তিউপাসনার তন্ত্রসম্মত বিশেষ প্রকরণ তাঁর পদে ও গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

কিন্তু তাঁরই এক শ্রেণীর পদ পড়লে মনে হয়, তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়গত দেবতার উপাসক ছিলেন না। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলার চিরপ্রসিদ্ধ ধর্মধারাগুলির মধ্যে চমৎকার সমন্বয়সাধন করেছেন। "আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে" বলে ঘোষণার মধ্যে তিনি

সাম্প্রদায়িক ধর্মবিদ্বেষের অবসান ঘটিয়েছেন। তাঁর ধর্মদৃষ্টির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এই পদটির মধ্যে নিহিত—

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে ॥

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তিসারে ॥
আছে কৌটার ভিতর চোর-কুটারী, ভোর হোলে সে লুকাবেরে।
ষড়দর্শনে পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রসারে ॥
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে।
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে ॥
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।
প্রসাদ বলে আমি মাতৃভাবে তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌বো হাঁড়ি বুঝবে মন ঠারে ঠোরে ॥

মাতৃভাবে সাধনা এই ভাবেরই সাধনা। প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা উপলব্ধির বিষয়। তাই শাস্ত্র বা পূজার উপকরণ তাঁর কাছে তুচ্ছ। তাই তিনি বলেন—

জাঁকজমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজনে ॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥
আলো চাল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর সে আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে ॥

অথচ লোকে তো তা শোনে না। তাই তাদের ধিক্কার দিয়ে বলেছেন—

ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি মন তাই জান না ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজনা ॥
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা ॥

কবি শুধু আচারগত ধর্মের বিরোধী নন, তান্ত্রিক হয়ে জীব হিংসারও পরম বিরোধী। তাঁর ভাবাশ্রিত বিশ্বমাতা সাদরে সর্বজীবকে পালন করেছেন। তাঁরই আদরে পালিত মেষ, মহিষ, ছাগলছানা তাঁরই প্রীতি উৎপাদনের জন্য মূর্খ মানুষ এদের বলি দিচ্ছে। তিনি এই কথারই প্রতিধ্বনি তুলেছেন আর একটি পদে—

মা আমার জগৎময়ী, জগতে তাঁর নাই তুলনা।
তুমি মাটির মূর্ত্তি গড়ে কি চাও, কর্তে মায়ের উপাসনা॥
জীব মাত্র মায়ের ছেলে, কেহ নয় তাঁর পর ভাবনা।
তুমি খুসি কত্তে চাও কি মাকে, কেটে একটা ছাগল ছানা॥
প্রসাদ বলে রে মূঢ় মন, ভক্তি মাত্র উপাসনা।
কল্লে লোক দেখান কালীপূজা, মা তো তোমার ঘুস খাবে না॥

সাধক কবি রামপ্রসাদের করুণাপূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর সাধনবিষয়ক পদগুলির অন্তর্নিহিত ভাববস্তু। তাঁর সমূহ জনপ্রিয়তার মূলেও এই উদার দৃষ্টি। তিনি নামত শাক্ততান্ত্রিক। কাজেও যে তন্ত্রাচারে লিপ্ত হতেন তাঁর পদ আর কাব্য থেকে তার প্রমাণ পাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না মূর্তিপূজায়, সাধারণ পূজা-বিধিতে, নৃশংস বলিদান প্রথায়।

॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যেই সমন্বয়ের কথা ॥

রামপ্রসাদের শাক্তবৈষ্ণব সমন্বয়প্রচেষ্টার মূলে বৈষ্ণবধর্মের ওপর শাক্তধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কোন মনোভাব যে বিন্দুমাত্র কার্যকরী ছিল না, তাঁর উদারধর্মদৃষ্টি থেকে তা বোঝা যায়।

ধর্মক্ষেত্রে গোড়ামীর অবসান তাঁর যুগেরই বৈশিষ্ট্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে এই ধর্মীয় উদারতার প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। সত্যনারায়ণ দেবতা সত্যপীরের হিন্দু সংস্করণ। সত্যনারায়ণ দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে মুসলমান ফকিরের বেশে এবং এবং তাঁর ভোগ মুসলমানী প্রথায় শিরণি। এই সত্যনারায়ণ পূজার প্রচলন হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকের কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর 'রায়মঙ্গল' কাব্যে ঈশ্বরের রূপ বর্ণনা করলেন এইভাবে—

অর্দ্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।

ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্দ্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাথে ॥*

মধ্যযুগের কবিদের মনে সাম্প্রদায়িক ধর্মের গোড়ামী কমে আসার লক্ষণ যেমন এতে সুস্পষ্ট তেমনি বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদও এতে লক্ষণায়। হিন্দুমুসলমান দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করে পরস্পরের সুখদুঃখের সঙ্গী হয়ে পড়েছে, সংস্কৃতিগত সমন্বয় ঘটতে আরম্ভ করেছে, ফলে সাহিত্যে এই সমন্বয়চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের রচনায় পরিবর্তনলক্ষণ আরও সুস্পষ্ট। ভারতচন্দ্রে সমন্বয়ের পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে দক্ষতার পরিচয় ভাঙ্গনের কাজে। তিনি মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত ধারায় কাব্য লিখলেন কিন্তু মঙ্গলকাব্যের প্রাণ অর্থাৎ দেবতায় ভক্তি ও বিশ্বাসটিকে চিরতরে দূর করে দিলেন। যে গোড়ামী হ্রাস পাচ্ছিল সপ্তদশে, অষ্টাদশের মাঝামাঝিতে হাতুড়ির ঘা মেরে কবি ভারতচন্দ্র তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। চারিদিকের কলুষ আবহাওয়ার মধ্যে কবি ভারতচন্দ্র যুগপরিবর্তনের চিহ্নটি ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তার প্রকাশে হাতুড়িমারা ছাড়া আর কিছু করলেন না।

অবস্থাগতিকে বাধ্য হয়েই তাঁকে এই পথ ধরতে হয়েছিল। তাঁর আশ্রয়দাতা ব্যক্তিটির আদেশ তাঁকে শিরোধার্য করতে হয়েছিল, তাঁর গুণগানে কাব্য ভরিয়ে তুলতে হয়েছিল, তাঁর ও তাঁর সভাসদদের মনোরঞ্জনে লেখনীকে চালিত করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর আশ্রয়দাতা পুরুষটিকে জানতেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে, মানবিকতার ক্ষেত্রে বাহ্যিক জাকজমকের অন্ত ছিল না, কিন্তু প্রকৃত ব্যক্তিটির মধ্যে ভেজাল ছিল বিস্তর।
একদিন বর্ধমানরাজের অত্যাচার তাঁকে পথে নামিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে তাঁর এমন একজন পৃষ্ঠপোষক জুটলেন, যাঁর সঙ্গে তাঁর মনের বিরূপ সম্পর্ক। কবি প্রতিশোধ তুললেন তাঁর কাব্যে।

কৃষ্ণচন্দ্রআরাধিতা অন্নদার স্বামীটিকে একটি ভাঁড়ে পরিণত করলেন। ভীরু, কাপুরুষ, অকর্মণ্য চরিত্রহীন তৎকালীন বাঙালী পুরুষের রূপ তার মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর দেখা নবাবী হাওয়ায় বিকৃত রুচি ও বুদ্ধি বাঙালীদের কাকে কাকে তিনি এর মধ্যে ফুটিয়েছিলেন বলা সম্ভব নয়। কিন্তু দেবী অন্নদার মহিমা যে তাঁর এই সর্বগুণহীন স্বামীটির জন্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ তা বেশ বোঝা যায়।

কবি আর একবার হাতুড়ি ঘোরালেন ব্যাসদেবের মাথা লক্ষ্য করে। মহামান্য মহাপূজিত ব্যাস তৎকালীন নবদ্বীপসমাজের গোঁড়া পণ্ডিতদের অনুরূপ। এই পণ্ডিত সমাজের পাণ্ডিত্যাহঙ্কারপূর্ণ নানা গোড়ামীর চিত্র কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর "নবদ্বীপ মহিমা"

* কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী (ক, বি,)—পৃ ২০১

গ্রন্থটিতে রূপ পেয়েছে, পাঠকদের সেখানি প'ড়ে নিতে অনুরোধ করি। প্রথমাংশে ব্যাসকে কবি এই সমাজের প্রতিনিধি করে গড়েছেন।

ব্যাসের গোড়ামীর পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে শৈববৈষ্ণবের দ্বন্দ্বে এবং শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে শিববিষ্ণুর বিরোধিতায়।

শাক্তবৈষ্ণবের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কবির উদার ধর্মমতবিরোধী। সব দেবতারই সমান মহিমা ঘোষণা করে কবি যেমন ব্যাসের নাকালের একশেষ করেছেন এই অংশটিতে তেমনি সর্বদেবের বিরোধিতার প্রচেষ্টায় রত ব্যাস কবির একটু সহানুভূতিও কুড়িয়েছেন। "মন্ত্রেব সাধন কিংবা শরীরপাতন" ব্যাসের এই লক্ষ্যের মধ্যে কবির পুরুষকারবিশ্বাসের ধ্বনি শোনা যায়।

এই পুরুষকারও দৈবের কাছে পরাজয় ববণ কবলো, কবি ভারতচন্দ্রও এখানে পূর্বের মঙ্গলকাব্যের কবিদের সঙ্গে তাঁর সমসূত্রতা রচনা কবলেন।

কবি ভাবতচন্দ্র শৈব ও বৈষ্ণবদ্বন্দ্বের অবসান ঘটালেন জোর কবে, কারণ তাঁব হাতিয়াব মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক। সেখানে তিনি মনোজযী মধুব প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেলেন না।

অথচ তিনি ছিলেন এই পথেরই পথিক তাঁব ধুয়াগানগুলির মধ্যে তার পরিচয় বেখে গেলেন। শাক্ত পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশে শক্তি অন্নদাব কাব্যরচনায় বসে কবি ভাবতচন্দ্র বৈষ্ণবতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করলেন তাঁব অন্নদামঙ্গলের ধুয়া গানে।

এই গানগুলিতে তিনি যে আন্তবিকতাব সুর ফুটালেন, তাতে তাঁব ধর্মীয় উদারতার পরিচয় সুস্পষ্ট। তবে কি তিনি তাঁব প্রথম জীবনের বৈষ্ণব আদর্শকেই এখানে প্রকাশ করলেন? প্রথম জীবনে বৈষ্ণবরূপেই এক সময় তিনি উড়িষ্যার পথে পথে বেড়িয়েছেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরে ভায়রাভাই তাঁর দেহ থেকে বৈষ্ণব খোলস ঘোচালেও মন থেকে তার প্রভাব কি কোনদিন ঘুচেছিল?* কার্যগতিকে শৈব-শাক্তেব আশ্রয়ে শক্তি বিষয়ে কাব্য লিখলেও ভারতচন্দ্র গাইলেন—

কি কর নর হরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ বে॥
তারবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
হবি ভজি পূর্ণকাম কমলজ্ রে।
ভব ঘোর পারাবাব হবিনাম তরী তার
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে॥

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত কবিজীবনী—ডঃ ভবতোষ দত্ত, পৃঃ ১৪-১৬

ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চারি বর্গের ধাম
বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে।
গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি
ভারতের ভূষা হরি-পদরজ রে॥

এই পদটিই ভারতচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের পরিচায়ক। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়েও প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন।

আবার এই কাব্যেই অনেকগুলি ধুয়াপদে ভারতচন্দ্রের শাক্তভক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। কবি ভারতচন্দ্র প্রকৃতই একজন সমন্বয়বাদী ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে ধর্মীয় গোড়ামীর কোন চিহ্ন তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি এই ধুয়াতেই স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন—

হরি হরে করে ভেদ। নর বুঝে না রে।
অভেদ কহে চারি বেদ॥
অভেদ ভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই
তারে না লাগে পাপক্লেদ।
যে দেহে হরি হরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ॥
একই কলেবর হইলা হরি হর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুইরূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ॥

ভারতচন্দ্র বলপ্রয়োগের দ্বারা তাঁর কাব্যে শৈববৈষ্ণবের সাম্য ঘটাবার চেষ্টা যে করেছেন রামপ্রসাদের পদে তারই সুষ্ঠু শান্ত প্রকাশ দেখলাম। ধুয়া-উক্তির কথা না ভেবে বলা যায়, ভারতচন্দ্রের কথা পরিশীলিত শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতিধ্বনি। সেক্ষেত্রে রামপ্রসাদের সব কথাই তাঁর ভাবসমাহিত চিত্তের উপলব্ধি থেকে নির্গত।

রামপ্রসাদে যা দেখলাম, তাই উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা 'তত্ত্বমসি'র মধ্যে পাই। মনে রাখতে হবে, রামপ্রসাদ সাধারণ ধর্মীয় জীবনে শাক্ততান্ত্রিক ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় তান্ত্রিকতার ইতিহাসে আমরা দেখি, বৈষ্ণবপ্রভাবে এই তান্ত্রিকতা কিছুমাত্র কমে নি, উপরন্তু নানাভাবে তার শক্তি ও প্রকৃতির বৃদ্ধি ঘটেছে, নানা শাখা-প্রশাখায় তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর আরও বৃদ্ধি ঘটেছে। সকল ধনী, জমিদার, দেওয়ান এবং বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিগত জীবনে তান্ত্রিক ছিলেন। বামমার্গের তান্ত্রিক চক্রানুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি যে এ সময় ঘটে নি তা বলা যায় না।

অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"* গ্রন্থে বিবিধ চক্রানুষ্ঠানের যে পরিচয় তন্ত্রানুসারে বিবৃত হয়েছে, তাতে সুরুচি ও শ্লীলতার সীমা এমনভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখা যায় যে, যখন ভাবি এই চক্রক্রিয়ার আবর্তেই একদিন আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠান সাধারণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে স্থান লাভ করেছিল, তখন আমাদের সেই সময়কার সামাজিক অবস্থার সম্বন্ধে মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

রামপ্রসাদ একদিকে ধর্মীয়ক্ষেত্রে সমন্বয়ের বাণী প্রচার করে ধর্মকে সুস্থ পরিবেশে স্থান দিলেন তেমনি তাঁর সাধন বিষয়ক পদগুলিতে তন্ত্রাচারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। একদিন বৈদিক যজ্ঞাচারের প্রতিবাদরূপেই উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির যেমন সৃষ্টি হয়, রামপ্রসাদও তেমনি উগ্র ও গোড়া তন্ত্রাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দেবতাকে ধ্যানের মধ্যে স্থাপন করলেন, বহু দেবতাকে একের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন, মৃণ্ময় মূর্তির বদলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদি-অনন্ত রূপের মধ্যে তাঁর মাতৃমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

---

* লেখক অনেক তান্ত্রিক আচারের বঙ্গানুবাদ দেন নি অশ্লীল বলে। একস্থলে মন্তব্য করেছেন—"শাস্ত্রে যতদূর ব্যবস্থা আছে, মানুষে কি ততদূর নির্লজ্জ হইয়া ব্যবহার করিতে পারে? একবার কিছু গলাধঃকরণ হইলে না পারিবারই বা বিষয় কি?" (১২৮৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত—অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'—দ্বিতীয় ভাগ থেকে)। W. Ward এর The Hindoos গ্রন্থের (শ্রীরামপুর সংস্করণ) দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার এই মন্তব্যটুকু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"Painful as this is, it is not all : there is a numerous and growing sect among the Hindoos in Bangal and perhaps in other provinces, who, in conformity with the rules prescribed in the works called Tantric, practise the most abominable rites......The rules of this antras, but particularly in the Neelu, Roodru-yamulu, yonee, and Unnuda-kulpu. In these works the writers have arranged a number of Hindoo sects as follows : Vedacharees, Voishnuvacharees, Shoivacharees, Dukhinacharees, Vamacharees, Siddhantacharees, and Koulacharees ; each rising in succession, till the most perfect sect is the Koulacharee.

দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'নরবলি' প্রথা সপ্তম শতাব্দীর হিউয়েন সিয়াঙের সময় থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমানভাবে বজায় ছিল। "The Hindoos" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠায় W, Ward মন্তব্য করেছেন, "However shocking it may be, it is generally reported among the natives, that human sacrifices are to this day offered in some places in Bengal."

রামপ্রসাদ সেদিক দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর অনেক সুস্থ চিন্তার অগ্রদূত। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রহ্মচিন্তার বীজ রামপ্রসাদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

অনুমান, জনশ্রুতি ও স্মৃতির ওপর নির্ভর করে রামপ্রসাদের প্রথম জীবনীকার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় "রামপ্রসাদ," প্রবন্ধটি লিখে রামপ্রসাদের সম্পর্কে সকলকে সজাগ করে তোলেন। গুপ্তকবির প্রকাশিত অনেক তথ্য সম্বন্ধেই আমরা সন্দেহ প্রকাশ করেছি এবং যথাস্থানে সে সব সম্পর্কে যথাসম্ভব আলোচনা করেছি, কিন্তু সাধক কবি রামপ্রসাদের সাধনবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তার সারবত্তার স্বীকৃতি না জানিয়ে উপায় নাই। তাঁর মন্তব্যটি এখানে পুরোপুরিভাবে তুলে দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনায় সমাপ্তি টানছি। গুপ্তকবি লিখেছেন—

"রামপ্রসাদ সেনের অবস্থা ভেদের পদ্য সকল অতি চমৎকার, ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না, ইঁহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ হইয়াছে। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগ বিরাগী হইয়া সুপবিত্র প্রীতি-চিত্তে গীত ছলে পরম পূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন। রামপ্রসাদি পদের অধিকাংশই জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তি রসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদিরা "ব্রহ্ম" শব্দ উল্লেখ পূর্বক যাঁহার উপাসনা করেন ইনি কালী নাম উচ্চারণ করত তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী এই নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয় পক্ষেরি উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থ পক্ষে উভয়েরি মর্ম্ম ও অভিপ্রায় এক হইয়াছে।"

পদাবলীতে প্রসাদজীবনীর উপকরণ ও তাঁর সাধন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

॥ রামপ্রসাদের রূপকাশ্রয়ী পদ ॥

রামপ্রসাদের পদাবলীর দুটি বিশিষ্ট ধারার মাত্র পরিচয় দেওয়া হল এতক্ষণ। অন্যভাবে বলা যায়, রামপ্রসাদের সাধকপ্রকৃতির দুটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনাই এতক্ষণ ধরে করা হল। রামপ্রসাদের পদসমূহের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ সব পদগুলিকে একসঙ্গে ধরলে এই 'বৈচিত্র্য' বিশেষণটিই একমাত্র উপযুক্ত বিশেষণ মনে হয়।

রামপ্রসাদের বেশির ভাগ পদই রূপকাশ্রয়ী। তৎকালে প্রচলিত পাঁচটি খেলার রূপক তাঁর গৃহীত রূপকগুলির অন্যতম। খেলাগুলি হ'ল শতরঞ্চ, পাশা, দাণ্ডাগুলি, ঘুড়ি-ওড়ানো এবং ঘোড়দৌড়। এছাড়া নৌকার ও বাজিকরের রূপকও লক্ষ্য করা যায়।

এবার বাজি ভোর হ'ল।
মন কি খেলা খেলাবি বল ॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমার দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে ম'ল ॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটাল।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হ'ল ॥

স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, তখন 'দাবা' খেলার চলন ছিল। কবি দাবার প্রতীক নিয়েছেন, সাধনপথে আপনার অস্বস্তি বোঝানোর জন্য।

পাশার প্রতীক দুটি পদে দেখা যায় এবং কবি সাধনপথে বিঘ্ন ও অস্বস্তি বোঝানোর উদ্দেশ্যেই এই রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। বুদ্ধি ও ভাগ্য দাবা ও পাশা খেলার সঙ্গে যুক্ত, কবি সাধনার সঙ্কট বোঝাতেই তাই এই দুটি ক্রীড়ার রূপক সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। কবি যেন বিষণ্ণতার সঙ্গে গেয়েছেন—

ভবে এসে খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পলো ॥
* * *
ছ দুই আট ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজি ভোর হ'ল ॥

অন্য রূপকগুলির ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে। মনকে প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্যেই কবি ঘোড়দৌড়ের প্রসঙ্গে এসেছেন—

যুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময়শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে ॥

ব্যর্থতাসচেতন কবির কথা এই অসমাপ্ত পদটিতে প্রকাশিত—

কালীপদ আকাশেতে
মন ঘুড়িখান উড়তেছিল।
কলুষ কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ি
গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল ॥

কবি মনঘুড়িতে ভর করে মায়া-দড়ির বাঁধন কাটিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই পদটিতে—

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভবসংসার বাজারের মাঝে)
ঐ যে, মন ঘুড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়াদড়ি। ইত্যাদি

দাণ্ডাগুলি খেলার পদটিতে সাধকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরিচয় রয়েছে—

এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধূলা ধূলি।
আমি কালী নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি ॥

কৃষিকাজের রূপকের পদটি অতি জনপ্রিয়। 'মনরে কৃষি কাজ জান না' পদটিতে কবির দেবীবিশ্বাসের তীব্রতা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বাজিকরে'র রূপক অনেকগুলি পদে আছে। এই রূপকজাতীয় পদগুলি কবির নানা বিষয়ে কৌতূহল ও অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করছে। কবি তান্ত্রিকসাধক হলেও যে সংসাররসরসিক ছিলেন তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

রূপকধর্মী পদগুলিতে কতকগুলি পরিচিত সাধারণ প্রতীককে গ্রহণ করে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সুন্দরভাবে কবিত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কবির আন্তরিকতা, সাধকের বিশ্বাস, প্রতীক নির্বাচনের সার্থকতা ও রূপকপরিণতির সার্থক রূপায়ণ পদগুলিকে কবিত্ব মণ্ডিত করেছে। সাধনবিষয়ক এই পদগুলিরই একটি বড় অংশ হেঁয়ালিধর্মী। এগুলির হেঁয়ালিখোলসের অন্তরালে সাধকের সাধনসত্তা লুক্কাইত। কবির সাধন পদ্ধতির চেয়ে সাধনপথের নানা বাধাবিঘ্নের কথাই এগুলিতে ব্যক্ত। কবি ষড়রিপুর বাধার কথাই অধিকাংশ পদে বেশি করে বলেছেন। এখানে পদের বাহ্যিক অর্থের অন্তরালে দ্বিতীয় একটি অর্থ রয়েছে। প্রথম অর্থটি সাধারণ পরিচিত জগতের। কিন্তু এই আবরণের ভিতরে রয়েছে তন্ত্রসাধনার গূঢ় তত্ত্বনির্দেশ। কবির সাধক সত্তার পরিচয়ই এগুলিতে সুস্পষ্ট। এ জাতীয় একটি পদ—

ঘর সামলা বিষম লেঠা।
ঘরের কর্ত্তা সে যে নয়কো আঁটা ॥
যার ইচ্ছে সে তাই করে,
আপনা আপনি দেখে মোটা।
এ ঘর নয় ঘোরে পুড়ে,
করলে আমায় লাটাপাটা ॥
ঘরের গিন্নি পড়ে ঘুমায়,
দিবারাত্রে নাইকো উঠা।
সে মাগী কি সাধে ঘুমায়,
মিন্সের সঙ্গে আছে যোটা ॥
প্রসাদ বলে না নড়ালে,
সে ঘুমেতে জাগায় কেটা।
মাগী একবার জাগলে পরে,
ত্রাসে সবাই হবে কাঁটা ॥

আপাত অর্থে একটি বিশৃঙ্খল ঘরসংসারের চিত্র। কিন্তু এর সংকেতিত অর্থ সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত। এমনি আর একটি পদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ওরে সুরাপান করি না আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরু-দত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা!
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা,
খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥

একটি বাস্তব ইঙ্গিতের সূত্র ধ'রে কবির মন আধ্যাত্মিকতার অতলে তলিয়ে গেছে। এই জাতীয় ভাবই আধ্যাত্মিকতার আরও নিগূঢ় স্তরে পৌঁছেছে এই পদটিতে—

হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা;
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥ ইত্যাদি

তন্ত্রশাস্ত্রের নিয়ম নির্দেশ পদ্ধতি যা 'ষট্চক্রভেদে'র কবিতায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত এখানে রূপকের আবরণে তারই পরিচয় রয়েছে। এই জাতীয় পদগুলিতে বৈষয়িকতার ইঙ্গিত মাত্র নাই। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ পদ বলে অভিহিত করা যায়।

একটি 'ষট্চক্রভেদ' ও একটি 'শবসাধনে'র পদ আছে। এগুলিতে তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় পদ্ধতি ব্যক্ত হয়েছে। বর্ণনা তন্ত্রানুসারী এবং সাধকের অভিজ্ঞতার পরিচয়ও বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে।

শবসাধন প্রণালী সম্বন্ধে কবির অভিজ্ঞতা ও সচেতনতার পরিচয় আমরা অন্যত্র পাই। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে তন্ত্রসম্মতভাবে তন্ত্রসাধনার কথা বিস্তৃতভাবে বলেছেন। সেখানে কাব্যের নায়ক সুন্দরের তন্ত্রসাধনার বর্ণনায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার কথাই প্রকাশ করেছেন।

॥ পদে বাস্তব ঘটনার ছায়া ॥

প্রসাদ পদাবলীর অনেকগুলি পদে কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ রয়েছে বলে জীবনীকারেরা মনে করেন। এই রকম একটি বিখ্যাত পদ হল—

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া ॥
নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥

* * * *

কবি ঘরের বেড়া বাঁধছিলেন ঘরের ভিতরে থেকে এবং কন্যা বাইরে থেকে দড়ি যুগিয়ে যাচ্ছিল। কন্যা পিতাকে না বলে কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র যায়, কিন্তু পিতার কাজ অব্যাহতভাবে চলে। সাধক গান গাইতে গাইতে বেড়া বাঁধছিলেন এবং কালী স্বয়ং এসে ভক্তের গান শুনতে শুনতে কন্যার রূপ ধরে তাঁকে দড়ি যুগিয়ে দিয়েছিলেন। পরে কন্যার বিস্মিত প্রশ্নে সচকিত হয়ে সাধক সব বুঝতে পারেন এবং তারপরই এই পদটি রচনা করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। রামপ্রসাদের প্রথম জীবনীকার ঈশ্বরচন্দ্রও এই কাহিনীর কথা বলেছেন। তাঁর ভাষাতেই এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছি—

"রামপ্রসাদ সেনের শক্তিভক্তি বিষয়ক উক্তি সকল শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে কালীর বরপুত্র বলিয়া বাচ্য করিতেন, এবং তৎকালে তাবতেই বলিতেন 'অন্নপূর্ণা' প্রতি দিবসই কাশী হইতে আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া কথা কহিতেন, স্বপ্ন দিতেন আর কন্যার বেশ ধরিয়া গান শুনিতেন, রন্ধন করিয়া দিতেন, এ বিষয়ে অপর একটা অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কথা রাষ্ট্র আছে। যথা,

'একদিবস রামপ্রসাদ সেন বাটীর বেড়া বন্ধনের জন্য দড়ি, বাঁশ, বাঁকারি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, ক্ষণকালের পরেই ঘরামী লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বাঁশ, বাঁকারি, দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথাস্থানে সংলগ্ন হইয়া বেড়া বদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসি ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে কোলাহল শব্দ ঘোষণা হইয়া উঠিল "যে, কাশীপুরেশ্বরী অন্নদা স্বয়ং আসিয়া রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন।"

এই প্রকার চমৎকার চমৎকার ব্যাপার ঘটিত জনরব কত আছে যাহার বর্ণনা করিতে হইলে একখানা পুস্তক ভিন্ন কোন মতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই সকল ঘোষণা প্রসাদ স্বয়ং কখনই করেন নাই, কেননা তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার কোন কথা উল্লেখ থাকিত।"

গুপ্তকবি এখানে বলতে চেয়েছেন, অলৌকিক আবির্ভাব বা ঘটনামূলক কোন কথা কবি নিজে তাঁর রচনায় বলেন নি।

গুপ্তকবি বর্ণিত বেড়াবাঁধার ঘটনাটি কিন্তু প্রাপ্ত বেড়াবাঁধার কবিতাটির সঙ্গে

মেলে না। এ কবিতাটি বা বেড়াবাঁধার কোন পদই ঈশ্বরগুপ্তের সংগ্রহে তখনও আসে নি, কিন্তু ঘটনাটি জনশ্রুতির মধ্যে ছিল তাঁর বিবরণে জানা যায়।
আর একটি কথা এই উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল, রামপ্রসাদ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা রচিত পদে ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত ছিলেন।
গুপ্তকবি জানিয়েছেন গঙ্গাযাত্রার কালে সাধক কবি রামপ্রসাদ চারটি পদ রচনা করেন। পদগুলি হল—

(১) কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু তরণি ত্বরা করি চল বেয়ে। ইত্যাদি

(২) বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥ ইত্যাদি

(৩) নিতান্ত যাবে দীন, এদিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥ ইত্যাদি

(৪) তারা, তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন্ যেমন রাখলে সুখে, তেম্‌নি সুখ্ কি পাছে॥

* * * *

প্রসাদ বলে মন্ দড়, দক্ষিণার জোর বড়, মাগো।
ওমা, আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে॥

ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, " 'দক্ষিণা হয়েছে' এই উক্তি করিবামাত্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল, অর্থাৎ প্রপঞ্চ-শরীর পরিহার করিলেন। প্রাচীন লোকের মধ্যে অনেকেই কহেন তাঁহার মরণ সময়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়াছিল। এ বিষয়ের সত্যমিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।"

বস্তুতঃ জনশ্রুতি থেকেই অনেক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু অনেক পদেই সে সকল কাহিনীর আভায রয়েছে। কাহিনীগুলির আকার পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু তাদের অস্তিত্বকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উপরে উদ্ধৃত চারটি পদই মৃত্যুপথযাত্রী সাধক কবির কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক।
সাধক কবির একটি বিখ্যাত পদ হ'ল—

ওরে মন্ চড়কী ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে॥ ইত্যাদি

এই পদটির প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, "রামপ্রসাদ সেন চৈত্র সংক্রান্তির দিবস কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলেন, যখন চড়কী দেপাক্, দেপাক্ বলিয়া চড়ক গাছে ঘুরিতেছে; তখন কেহ কেহ কহিলেন, সেন মহাশয় দেখ কেমন ঘুরিতেছে" প্রসাদ তাহাতে হাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন "ভাই। এ কি এক সামান্য চড়ক দেখাইতেছ, আমি

দিবা নিশি যে চড়কে ঘুরিতেছি তাহার নিকট এ চড়ক কোথায় লাগে।" তাঁহারা কহিলেন সে কিরূপ চড়ক ভাই, তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ সহস্র ব্যক্তির সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে এই গান ধরিলেন।"

চড়ক বর্ণনার মাধ্যমে অসার সংসারখেলা বর্ণনার একটা বাস্তব কারণ অনুমান করা গেল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, "এক দিবস দিবাভাগে কবিরঞ্জন কুলক্রিয়া সমাধা করত কুমার-হট্টের বলরাম তর্কভূষণ নামক বিখ্যাত তার্কিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উক্ত অভিমানি পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন "দেখ মাতালব্যাটা যাইতেছে"। তৎকালে তৎস্থানে অনেক সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাহারা তটস্থ হইয়া দশনাগ্রে রসনা বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি করিলেন! রামপ্রসাদ সে অতি সাধু ব্যক্তি, তাহাকে মাতাল বলিয়া উপহাস করিলেন?" এই কথা কহিতে না কহিতেই রামপ্রসাদ সেন হাস্যবদনে "ও তার্কিক ভট্টাচার্য! কি বলিতেছ? এই বলিয়াই গান ধরিলেন।"

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট দুটি গান হ'ল—

(১) রসনে কালী রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে॥ ইত্যাদি

(২) সুরা পান করিনেরে।
সুধা খাই কুতূহলে॥
আমার মন্ মাতালে মেতেছে আজ, মদ্ মাতালে মাতাল বলে। ইত্যাদি

ঈশ্বরগুপ্ত আর একটি গানের উৎসের কথা এইভাবে বলেছেন—"কোন আত্মীয় ব্যক্তি এক দিবস কথায় কথায় রামপ্রসাদ সেনকে কহিয়াছিলেন "সেনজ এতদিন দুঃখে গেল, এইক্ষণে কিঞ্চিৎ সুখভোগ কর"। এই কথার তিনি অপর কোন উত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটি গান করিলেন, ঐ গীত তাহার প্রকৃত উত্তর হইল।"

গানটি হ'ল—

মন্ কোর না সুখের আশা।
যদি অভয়পদে লবে বাসা॥
হোয়ে দেবের দেব্ সদ্বিবেচক, তেঁইতো শিবের দৈন্যদশা॥ ইত্যাদি

ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন—"কোন রাজার সভায় বসিয়া রাজ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ এই গান রচনা করেন—

মন্ জাননা শেষে ঘটিবে কি লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ কোরে পথে দেবে কাঁটা॥

* * * *

প্রসাদ বলে মন্ জানতো, মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ি, বুঝাইব সেটা॥"

"আমায় দেও মা তবিল্‌দারী। আমি নিমক্ হারাম্ নই শঙ্করী॥"—পদটি ধনরক্ষকের গৃহে মুহুরির অধীনে খাতা লেখার সময় রামপ্রসাদ লিখেছিলেন বলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উল্লেখ করেছেন তাঁর 'রামপ্রসাদ' প্রবন্ধে। এই পদটি কবির প্রথম পদ বলেও প্রসিদ্ধি আছে। আমরা এই দুটি ধারণাতেই সন্দেহ করেছি এবং যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনাও কবেছি।

ঈশ্ববগুপ্ত আর একটি পদ "তারাব জমী আমার দেহ, ইথে কি আর আপদ্ আছে। ওযে, দেবের দেব, সুকৃষাণ হোয়ে, মহা মন্ত্রে বাজ্ বুনেছে॥" সম্বন্ধে বলেছেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বামপ্রসাদকে প্রদত্ত জমিতে তিনি কি রকম চাষ করেছেন জানতে চাইলে কবি এই পদটি বচনা করেন।

বামপ্রসাদের অনেকগুলি পদে কাশী-প্রসঙ্গ আছে। তাঁর কাশী যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই এগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে।

তখন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের যুগ, তাছাড়া দেশেও অন্নের জন্য হাহাকার। অন্নপূর্ণার স্থান কাশীর মহিমা এ কারণে কবির মনকে উদ্দীপ্ত কবে থাকতে পারে।

কিন্তু কাশীব স্বতন্ত্র মহিমাও আছে। কাশী হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। বাংলায় অন্নপূর্ণা পূজা প্রচলিত হওযার বহু পূব থেকেই বাঙালীহিন্দুর মনে কাশীদর্শন ও কাশীবাসের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। যোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম কালকেতুর বাপমাকে শেষ বয়সে কাশীতেই রেখেছেন।

বামপ্রসাদের সময়ে নতুন কবে বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে কাশীর সংযোগ ঘটেছিল। ঔবঙ্গজেবের ধ্বংসতাণ্ডবের পর কাশীর পুনর্গঠনকাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। রামপ্রসাদের সময়েই এ সব ঘটনা। রামপ্রসাদের মনোবাসনার কারণটুকু তাই আমরা বুঝতে পারি।

তখনকার দিনে তীর্থদর্শন ব্যাপারটি সহজ ছিল না। "রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে"—কথাটি তখনকার দিনের পক্ষেই প্রযোজ্য। আমরা 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের তীর্থযাত্রার বিবরণ পেয়েছি। কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৬৮ খৃঃ নাগাদ কাশী গিয়েছিলেন এবং সেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই গ্রন্থেই কাশীতে কয়েকজন বাঙালীর নাম তখনই শ্রদ্ধাভরে শ্রুত হচ্ছে দেখ্‌তে পাই—

"রাণী ভবানীব যশঃ না যায় কথন।
কত স্থলে কত ছত্র কত বিবরণ॥
* * *

কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণদত্ত, রাজবল্লভ রাজা।
চারিজন পুণ্যশ্লোক বলে কাশীর প্রজা॥"
(তীর্থমঙ্গল—নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, পৃঃ ১৫২)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতার পরিচয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দিয়েছেন, তাতে রামপ্রসাদ তাঁর সঙ্গেই কাশী যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন কি? ঈশ্বরগুপ্ত অন্ততঃ সে প্রসঙ্গে কিছুই বলেন নি। পরে নানা রকম কাহিনী সৃষ্ট হয়েছে।

কিন্তু মনে হয় রামপ্রসাদ কখনও কাশী যান নি। কুমারহট্টগ্রামের বাইরে একবারই হয়তো গিয়েছিলেন, জীবিকার্জনের জন্য। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে অর্থাৎ তাঁর সাধনপীঠ ছেড়ে তাঁর পক্ষে বেশিদিন বাইরে থাকা সম্ভব হয়েছিল কিনা বলা যায় না।

অবশ্য সবই নির্ভর করছে তাঁর জীবিকার্জন ব্যাপারটির সত্যতার ওপর। জীবিকার্জনের চেষ্টার কথা তাঁর পদে আছে, সুতরাং এরকম ঘটনা অবশ্যই ঘটেছিল অর্থাৎ তিনি কর্মব্যপদেশে কিছুকাল স্বগ্রামের বাইরে ছিলেন কিন্তু তিনি কখনও কাশী যান নি।

তাঁর অনেক পদে কাশী বা বারাণসীর উল্লেখ তাঁর কাশীগমন ঘটনাকে সমর্থন করে না। শ্রেষ্ঠ তীর্থ বারাণসী এবং তার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি দুর্বলতাই এতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ তীর্থদর্শনপ্রভৃতিতে পুণ্য হয় এককথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কাশীযাওয়ার অপ্রয়োজনীয়তার কথাই তাঁর কাশী সংক্রান্ত অধিকাংশ পদে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ধারণাটি এখানে সুস্পষ্ট—

হওরে মন কাশীবাসী।
দেখ্ হৃদ্‌কমলে বারাণসী॥

কবি রামপ্রসাদের কাশী যাওয়ার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য দুটি পদে সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে—

শমন কি ভয় দেখাও আসি।
আমি যাব কাশীনাথের কাশী॥
শেষে বম্ বম্ বব শিব' মুখে বলে হব সন্ন্যাসী।
বারাণসী থাকবো বসি, দূরে যাবে পাপরাশি॥ ইত্যাদি

অন্য পদে—

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে॥

এই পদ দুটিতে এবং আরও দুয়েকটি পদে কবির যে অভিলাষ প্রকাশিত হয়েছে, অনেকগুলি পদে আবার তা খণ্ডিত হয়েছে নানাভাবে। এমনি একটি পদ—

কালীপদ মরকত আলানে মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এটে।

* * * *

নানা তীর্থ পর্যটনে, শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল্ বুঝনারে দুঃখ চেটে॥ ইত্যাদি

অন্যত্র দেখি—

কাজ কি রে মন, যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥ ইত্যাদি

অথবা—

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃতকাশী, তত্ত্বরসি বিগলিতকেশী॥ ইত্যাদি

সাধকের রচনায় কাশী যাওয়ার ইচ্ছা যেমন প্রকাশিত, তেমনি তার সাধকোচিত বিরুদ্ধতাও বিদ্যমান। কিন্তু তিনি কাশী গিয়েছিলেন, এমন কথা কোথাও ব্যক্ত হয় নি। বরং একটি পদে বিপরীত কথাই শোনা যায়—

মাগো আমার কপাল দোষী।
(দোষী বটে গো আনন্দময়ী)॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী॥

॥ পদবৈচিত্র্যের অন্তরালে প্রকৃত প্রসাদজীবনী ॥

রামপ্রসাদের জীবনী তাঁর রচিত সাহিত্য থেকেই আমাদের সৃষ্টি করে নিতে হবে। অবশ্য তাঁর রচিত সব পদ ও অন্যান্য সমস্ত রচনা পেলে এবং তা কালানুক্রমে সাজাতে পারলেই তবে এই কাজ করা সহজ হবে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর রচিত পদকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সাজানোর চেষ্টা করেছেন। শ্রেণীগুলি হ'ল প্রথমাবস্থার পদ, মধ্যাবস্থার পদ ও শেষ অবস্থার পদ।

তিনি কি ভাবে এই অবস্থাভেদ জেনেছিলেন, বলা মুস্কিল। তিনি অল্প কয়েকটিমাত্র পদকে এভাবে সাজিয়ে রেখে গেছেন। এ বিভাগকে গ্রহণ করে বর্তমানে আলোচনা সম্ভব নয়।

কোন কোন সংগ্রহকারক কবিতার প্রকৃতি অনুসারে তাঁর পদাবলীর বিভাগ করেছেন। এভাবে পদের প্রকৃতিপরিচয় হতে পারে কিন্তু রচয়িতার রচনাধারার ক্রমনির্ধারণ সম্ভব নয়। অবশ্য এ নির্ধারণের ব্যাপারটি বর্তমান ক্ষেত্রে একেবারে অসম্ভব।

আমরা রামপ্রসাদের পদাবলীতে আরও কয়েকটি বিভিন্ন ধারার রচনার সন্ধান পাই। এই ধারাগুলি সংক্ষেপে বলা যায় এই ভাবে—রূপবর্ণনার পদ, অভিযোগ প্রকাশক পদ, মায়াবাদের পদ এবং সাধনার প্রকৃতিবিষয়ক পদ।

রূপবর্ণনা মা কালিকারই। এই রূপ প্রকাশের দ্বিবিধ ধারা পদাবলীতে লক্ষ্য করা যায়—মোহিনীধারা ও ভয়ঙ্করী ধারা। কবির মনে সাধকসত্তা থেকে মাকে যখন যেভাবে মনে হয়েছে, তখনই সেভাবে মায়ের রূপ বর্ণনা করেছেন। কখনও করুণাময়ী মাতৃরূপিণী, কখনও সৌন্দর্য-ঐশ্বর্যে পূর্ণ। কখনও বা সংহারময়ী ভয়ঙ্করী। এই বিভিন্ন রূপের পদগুলির মধ্যে বর্ণনাবৈশিষ্ট্যে কবির কবিত্বশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রামপ্রসাদের প্রসাদত্ব এগুলির মধ্যে মেলে না। এগুলি একজন কবির এবং যেকোনও একজন সাধক কবির পক্ষে লেখা সম্ভব। ভাষার ঐশ্বর্য এগুলির মধ্যে প্রবল।

কিন্তু রামপ্রসাদের প্রধান গুণ সারল্য। অকৃত্রিম আবেগে মনের আশানিরাশা, দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাসের চিত্র তিনি যে পদগুলিতে তুলে ধরেছেন, সেই পদগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ পদ এবং সেইগুলিতেই তাঁর প্রসাদত্ব। রামপ্রসাদের পদ বললে এক ডাকে আমরা এই গুলিকেই বুঝে থাকি।

রামপ্রসাদের পদ পাঠের সময় আরও কতকগুলি কথা মনে রাখতে হবে।

পূর্বে উদ্ধৃত ঈশ্বরগুপ্তের রচনা থেকে তাঁর গ্রামবাসীর পত্রে তার উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়ের কথা আমরা জানতে পারি। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে তিনি প্রথমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই শুনিয়েছিলেন। কিন্তু নবাব তাঁকে তার নিজস্ব সুরের গান শোনাতে বলেন। ঘটনাটির ঐতিহাসিকত্ব মানার ক্ষেত্রে নানা বাধা আছে। সিরাজদ্দৌলা নবাব হবার পরে তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রসমভিব্যাহারে এজাতীয় মিলনপর্ব একেবারেই অসম্ভব ছিল। মনে রাখতে হবে ১১৫৬খৃঃ থেকে ১৭৫৭খৃঃর কিছুকাল তিনি নবাব ছিলেন। এ সময়ে বা এর পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদের কোন নৈকট্য ঘটেছিল বলেই আমরা মনে করি না। তাঁকে ভূমিদানের ব্যাপার নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আমরা করেছি। তবে পূর্বোদ্ধৃত পত্রদাতার দুটি কথাকে মানতে আমাদের অসুবিধে নাই। তাঁর সঙ্গীত শাস্ত্রে জ্ঞান ছিল এবং তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন না।

রামপ্রসাদ সুকণ্ঠ ছিলেন না বলেই কি এই নতুন প্রসাদী সুরের সৃষ্টি? মনে হয় এটি প্রসাদীসুর সৃষ্টির কোন কারণই হতে পারে না। তবে এই সুরের যাদুই প্রসাদীসঙ্গীতে কণ্ঠের বাছবিচার ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে। এখানে সুরেই মাতিয়ে দেয়, কণ্ঠ কেমন তার কথা কেউ ভাবে না। প্রসাদী সুরের এইটিই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

রামপ্রসাদের পূর্বে প্রচলিত বৈষ্ণব কীর্তনগানের সুর ধরা যাক। খেতরীর উৎসবের পর (আনুমানিক ১৫৮২খৃঃ) থেকে দেবীদাসের মৃগঙ্গ ও গোকুলের গলায় এই কীর্তনগান প্রচলিত হল। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে 'কীর্তন' কথাটির অর্থ 'ঘোষণা'। রাধাকৃষ্ণের লীলারূপ ঘোষণা। কীর্তনগান একক ভাবে হয় না। বৈষ্ণববিশ্বাসমতেই তা হওয়া সম্ভব নয়। বৈষ্ণবধর্মে ভক্তের যোগ পার্শ্বচর হিসেবে। সেখানে নিত্যবৃন্দাবনে নিত্যলীলা চলছে। সেখানে ভক্ত হলেন পরিকর, দর্শক, সাথী। ভক্তভগবানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সেখানে নাই।

যদি ধরা যায় রাধাকে ভক্ত মনে করে নিয়েই বৈষ্ণব কবিরা এই গান গেয়েছেন, তবু তা শাস্ত্রসম্মত যে নয়, তা তো জানাই। "ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান" বা "যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল" এ সব তো রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যবর্ণনারই অঙ্গ। যে যত রাধায় মনের মধ্যে ঢুকে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তাঁর পদেই আমরা ততখানি মুগ্ধ হই। আমরা এখনকার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মুগ্ধ হই, মানবিকতার আলোকে এসব ভাবার চেষ্টা করি বলেই মুগ্ধ হই।

এই সমবেত সঙ্গীতধর্মী উপাসনায় কীর্তনের সুর যেমন বাঙলারই নিজস্ব, তেমনি প্রসাদীসুরও বাঙলার নিজস্ব।

রামপ্রসাদের সাধনা একক সাধকের সাধনা। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ধর্মগত দিক দিয়ে এখানেই প্রধান পার্থক্য।

দ্বিতীয় পার্থক্য, রামপ্রসাদী সাধনায় ভক্ত ও ঈশ্বর মুখোমুখি। তাই এখানে ঘোষণা নাই, শুধু প্রকাশ। এখানে ভক্ত নানাভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজের মনোভাবকেই প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরভক্তের পরস্পর নৈকট্য এই প্রকাশকে অভিনবত্ব দিয়েছে।

রামপ্রসাদের আবার সবই মাতৃভাবের সাধনা। তান্ত্রিকতার ক্রিয়া আর সঙ্গীতের প্রকাশ। একটি গুহ্য, অন্যটি সর্বজনের। তান্ত্রিকের গুহ্যসাধনাকে রামপ্রসাদ সর্বসাধারণের গোচরে নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে।

এ রকমটি কি করে ঘটলো? তাঁর সামনে তো এ রকম কোন দৃষ্টান্ত ছিল না?

দৃষ্টান্ত ছিল না ঠিকই, কিন্তু রামপ্রসাদ যা ছিলেন, তাঁর পূর্বের তান্ত্রিক সাধকরাও তা ছিলেন না।

চিকিৎসক বৈদ্যের সন্তান, পৈতৃক পেশা নিলেন না। অথচ সংসার বেড়েছে, পিতৃবিয়োগ হয়েছে, জীবিকান্বেষণে বেড়িয়ে পড়তে হ'ল। জীবিকার্জনে সাফল্যলাভ না করে গৃহে ফিরলেন। গৃহে স্ত্রী এবং সন্তানাদি স্বভাবতই ক্ষুব্ধ।

রামপ্রসাদের পৈতৃকপেশা গ্রহণ না করার মূলে কিন্তু তাঁর বৈষয়িক কর্মে অনীহা। অন্যথায় তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভালই জানতেন। কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁর ছিল না। জগজ্জননী যাঁকে ডাক দেন, শৈশব থেকেই তাঁর মনে সে

আহ্বান পৌঁছায়। রামপ্রসাদের এই ভক্ত মন তাঁকে কিশোর বয়স থেকেই দেবীর দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আপন মনে সঙ্গীত রচনা করে সেই দেবীকেই তিনি উৎসর্গ করেছেন।

কিছুকাল কর্মজীবনের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সাধনায় ছেদ পড়লো। কাজের মালিক তাঁর ভক্ত মনোভাবের পরিচয় পেলেন। সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে কর্মবিমুখ লোকটিকে তিনি ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

বাড়িতে চলছে সাধনা, চলছে সঙ্গীত রচনা। পারিবারিক অশান্তি বেড়েই চলেছে। কিন্তু বাইরে ভক্ত বলে নাম রটেছে। একের পর এক ভূসম্পত্তি লাভ করে চলেছেন। এই সময় স্ত্রী 'বিদ্যাসুন্দর' রচনায় প্রেরণা দিলেন। স্ত্রীই দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন বলে জানালেন।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের বার্তা এসে পৌঁছেছে। সাবর্ণ্যচৌধুরীর জমিদারীতে কৃষ্ণরাম-দাসের 'বিদ্যাসুন্দর'ও পরিচিত। গ্রাম্য জমিদারদের কাছে আর্থিক ক্ষেত্রে সুবিধেই হবে ভেবে রামপ্রসাদকে সহধর্মিণী 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লেখায় প্রবৃত্ত করলেন।

'বিদ্যাসুন্দরে' বারংবার স্ত্রীর স্বপ্নাদেশলাভ ও স্ত্রীভাগ্যের কথা যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং পাশাপাশি তাঁর সিদ্ধির বিলম্ব বা অসাফল্য এবং শবসাধনা প্রভৃতি যেভাবে বর্ণিত দেখি তাতে এমনি অনুমান করাই স্বাভাবিক।

সাংসারিক ক্ষেত্রে এই রচনার দ্বারা কি সুফল হয়েছিল জানা যায় না। শুধু দেখি কৃষ্ণচন্দ্র রাজার ভূমিলাভ করলেন, দেখি পূর্ব সাহায্যকারী বিশিষ্ট দেওয়ান রাজকিশোর রায়ের নির্দেশে 'কালীকীর্তন' রচিত হল। অনুরূপ আরও অনেক রচনা হল। কিন্তু পদ রচনা সমানেই চলেছে।

মনে হয় কৈশোরে ও যৌবনপ্রারম্ভে কবির মনের দ্বন্দ্বই তাঁকে তাঁর আরাধ্য দেবীর কাছে মনের কথা খুলে বলায় প্রথম প্রেরণা যুগিয়েছে সঙ্গীতের মধ্যে। একদিকে দেবীর টান, অন্যদিকে বৈষয়িক দুর্ভাবনা ও কর্মের তাগিদ। একদিকে বিদ্যাশিক্ষা কিছু হয়েছে, অন্যদিকে তন্ত্রশিক্ষা হয়নি। একদিকে পূজার ঝোঁক, অন্যদিকে পূজার উপকরণ নাই। সাধারণ তান্ত্রিক সাধক হবার কোন সুযোগই রামপ্রসাদ পেলেন না। শাস্ত্রজ্ঞান যখন হল, তন্ত্রমতে সাধনা আরম্ভ করলেন কিন্তু সংসারের বাঁধন কাটালেন না। গৃহে থেকেই সাধনা শুরু করলেন এবং স্বভাবতঃই সে গৃহের পরিবেশ সুস্থ ছিল না। অধিক বয়সে তাঁর শেষ সন্তানের জন্মদান সংসারের সঙ্গে বরাবর নিকট সম্পর্কেরই প্রমাণ দেয়। মনে সম্পূর্ণ বৈরাগী কিন্তু বাইরে ঘোর সংসারী। এই দ্বন্দ্ব তাঁর আজীবন চলেছে। তাই সঙ্গীত রচনাও কোনদিন থামে নি। শুধু জীবনের স্তরে স্তরে এই সঙ্গীতের প্রকৃতি পাল্টে পাল্টে এসেছে।

রামপ্রসাদের সাধনা মায়ের সাধনা। এই মা আবার তাঁর কল্পনার, তাঁর ধ্যানের। সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন পরস্পরের কথা হয়, দূরবর্তী লোকের সঙ্গে সেভাবে কথা জমে না। প্রসাদী সুরে তাই দূরবর্তীকে আহ্বানের সুর পরিস্ফুট। গ্রাম-বাংলার উদাসী ভাটিয়ালীর সঙ্গে এই আহ্বানের সুর মিশ্রিত হয়ে রামপ্রসাদের নিজস্ব সুর সৃষ্টি হয়েছে। প্রসাদী সুর আয়ত্ত করা তাই এত সহজ।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে আহ্বানের সুরের সঙ্গে আহ্বানকারীর আন্তরিকতার গভীর সংযোগ ঘটেছে। এই সংযোগে কোন ফাঁক নাই। এই ফাঁক না থাকার কারণ রাম-প্রসাদের সাধকত্ব।

সন্তান ও জননীর যত প্রকার সম্পর্ক আছে, কবি তাঁর আরাধ্যা জননীর সঙ্গে সংলাপে সমস্তই প্রকাশ করেছেন। জননী সম্মুখবর্তী না হলে এবং ইচ্ছাপূরণে বিলম্ব ঘটলে স্বভাবতঃই সন্তানের অভিযোগই পরিমাণে বেশি করে প্রকাশ পায়। রামপ্রসাদের পদাবলীতে এই অভিযোগ প্রকাশক পদের সংখ্যাই তাই বেশি। কতকগুলির মধ্যে বৈষয়িক অভাবঅভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে, সেগুলির আলোচনা পূর্বেই করেছি।

কিন্তু কবির প্রধান অভিযোগ অন্য কারণে। কবি মাতৃপদ-আকাঙ্ক্ষী, দিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেই মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটছে না, তাই কবির মনে অভিযোগ উত্তাল হয়ে উঠছে। তিনি বলেন—

বাঁচিতে সাধ আর নাই মা তারা।
আমি 'তারা তারা তারা' বলে ধনেপ্রাণে হলেম সারা॥ ইত্যাদি

কিংবা—

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত॥ ইত্যাদি

কিংবা—

মর্‌লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে॥ ইত্যাদি

অভিমানের উত্তাপে পূর্ণ—

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে গো মা-খেকো ছেলে॥ ইত্যাদি

কিংবা—

কই তারা তোর বিবেচনা।
তাই বলি গো শ্যামা ত্রিনয়না॥
যাব ভবপারে কেমন করে, কি আছে তোর সম্ভাবনা॥ ইত্যাদি

কিংবা—

কাজ কি সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে তোর ধন বিহনে॥ ইত্যাদি

কিংবা—

কি ধন দিবি আর তোর কি ধন আছে।
তোর যত ছিল ধন সম্পত্তি, শিব আগে বুকে রেখেছে॥ ইত্যাদি

কিংবা

কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই।
থাকলে আসি দেখা দিত, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥ ইত্যাদি

মাত্র কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। সুধী পাঠককে সবগুলি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। তবে উদ্ধৃত পদগুলি থেকে কবিব অভিযোগের ধাবা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হবে।

রামপ্রসাদের কতকগুলি পদে মাযাবাদ সুস্পষ্ট।

ভাই বন্ধু দাবা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসি, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া॥
অঙ্গেতে যত আভবণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চার কোণা মাঝখানে ফাড়া॥

এ পদটিতে দুঃখের সুর সুস্পষ্ট—

মন তোমারে করি মানা।
তুমি পরের আশা আর করো না॥
তুমি বা কার কেবা তোমার ভেবে মর কার ভাবনা।
ওরে তোর ভাবনা কেউ ভাবে না, ভাব দেখে কি যায় না জানা॥ ইত্যাদি

কিংবা—

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি নারে মনের ঠেঁটা॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোটা॥ ইত্যাদি

এমনি আর একটি পদ—

ধন-জন-পরিবার, যাদের পেয়ে বড় খুসি।
তারা সময় কালে কেউ কার নয়,
একা যাই আর একা আসি ॥

অনেকগুলি পদেই সংসারের প্রিয়জনদের অসারতার প্রসঙ্গ এনেছেন, তা যে তাঁর পার্থিব অনিত্যতাচেতনা থেকেই এসেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন কোন পদ পড়লে স্পষ্টতঃই মনে হয়, তাঁর সাংসারিক জীবন সুখের ছিল না। সুখের না থাকার সম্ভাবনার কারণ আমরা পূর্বে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

রামপ্রসাদজীবনের সঙ্গে পরিচয়ের স্বল্পতার জন্যই আমরা তাঁর রচনা থেকে বিভিন্ন অবস্থা ও ভাবের পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে, রামপ্রসাদ সাধক ছিলেন। যেখানে পার্থিব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই পার্থিবত্ব-টুকুও দেবতাব সঙ্গে সম্পর্ক বৈচিত্র্যের রূপক কিনা বলা যায় না। তাঁর সৃষ্ট কবিতার মধ্যে তাঁর সাধকের দৃষ্টিটিকে বসিয়ে নিয়ে বিচার কবাই কর্তব্য। এখন এই দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বোঝা যায় কি করে ?

কবিদৃষ্টি ও সাধকদৃষ্টির মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য হল কবি সসীমকে অসীম কবে দেখেন আর সাধক অসীমকে সসীমতার মধ্যে ধরে ফেলেন। তাই কবির মধ্যে চির অতৃপ্তি আর ব্রহ্মাস্বাদধন্য সাধক নিত্যানন্দে বিভোব।

একজন জাগতিক তুচ্ছতার বা বিরূপতার কথা ভেবে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কল্পনায় স্বর্গলোক রচনা করেন। আর একজন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুর মধ্যেও সেই পরমেশ্বরের সন্ধান লাভ করেন। যেহেতু তিনি পরমেশ্বরকে ভালবাসেন তাই তাঁর সৃষ্ট সব কিছুকেই তাঁর ভাল লাগে। সব কিছুর মধ্যে তিনি তাঁর হাতের স্পর্শ অনুভব করেন। তাঁকে সর্বঘটে বিরাজমান দেখতে পান। সাধকের এই দৃষ্টিকেই mystic দৃষ্টি বলে। সাধক কবি রামপ্রসাদ এই দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

এই পরমেশ্বর তাঁর কাছে জননীরূপে চিহ্নিতা। তিনি সব কিছুর মধেই মাতৃহস্তের স্পর্শ অনুভব করেছেন। তাই তাঁর পক্ষে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয়ের কথা বলা সম্ভব হয়েছিল, তাই তিনি সর্ববিধ পূজার উপকরণকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন, তাই জগতের করুণা, সৌন্দর্য ও ভয়ঙ্করের মধ্যে এই মাকেই দেখেছিলেন, তাই তাঁর সব রূপকবর্ণনার কেন্দ্রস্থলে জগজ্জননী মা, তাই সব অভাবঅভিযোগ বৈষয়িকতা, মায়াবাদ মাকেই কেন্দ্র করে ঘোষিত হয়েছে। এই ঘোষণায় mystic সাধকের বিশ্বাসের দৃঢ়তাই আন্তরিকতার স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে। তাই তাঁর পদ এমনই প্রাণবন্ত।

এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর যে সমস্ত পদের কথা বলা হয়েছে সেগুলিতে মাটির পৃথিবীর সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। কবি নিজে মাটির মানুষ, ঘরের মানুষ, নানা অভাব অভিযোগের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত মানুষ। তাঁর সমস্ত আশা নিরাশা, ব্যর্থতাবেদনা, আশঙ্কা অভিযোগ তাঁর সাধকদৃষ্টির সম্মুখে জীবন্তরূপিণী মায়ের কাছেই তিনি পেশ করেছেন। মায়ের কাছে বেশি স্নেহ টেনে নেবার জন্যই ছদ্ম মানঅভিমানের সৃষ্টিও সন্তান করে থাকে। মায়ের সঙ্গে সাধককবির এই সম্পর্কটি বড় মধুর, বড় জীবন্ত, বড় আকর্ষণীয় রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু সাধক কবির আর এক শ্রেণীর পদ আছে, যেখানে কোন অভাব অভিযোগের কথা, মানঅভিমানের, দুঃখবেদনার কথা নাই। সেখানে শুধু মায়ে-সন্তানে ভাববিনিময়। সেখানে শুধু মাকে পাবার উপায় বর্ণনা। সেখানে শুধু সন্তানের জীবনে মায়ের স্থান কতখানি তারই কথা। সেখানে মাকে ছাড়া সন্তানের চলতে পারে না তারই ঘোষণা। এখানে রামপ্রসাদের পরিণত সাধকদৃষ্টির পরিচয় পাই।

মনে হয় পূর্বের সমস্ত আলোচিত পদগুলি কবির প্রথমাবস্থা ও মধ্যাবস্থার পদ। সেখানে পূর্বরাগ, মানঅভিমান, অভিসার, মিলন, আবার বিরহ। সেখানে মিলনে দুঃখ, বিরহে হাহাকার, অভিসারে বেদনা, মান-অভিমানে তিক্ততা। কিন্তু তখন মনে হয় কবির পূর্ণসিদ্ধি ঘটে নি। মনে হয় তিনি তখন সাধন পথের পথিক।

কিন্তু তাঁর শেষাবস্থার সাধনবিষয়ক পদ বলে যেগুলিকে মনে করি সেগুলি যেন ভাব-সম্মিলনের পদ। এখানে সাধককবির সর্বপ্রকারে মাতৃচরণে সমর্পিত এক অপূর্ব প্রাণের পরিচয় পাই। এই অপূর্বতা তাঁর উপাসনা পদ্ধতির সরলীকরণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়। কবি বলেছেন—

ওরে মন বলি ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগরে ফিরে মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামামারে॥
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র রটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ওরে, আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে॥

ঈশ্বরারাধনার এমন সরল রূপ কোন দেশের কোন ধর্মের মধ্যে দেখা যায় বলে জানি না। এখানে শুধু সাধকের বিশ্বাসের ও উদারতার গভীরতায় স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সাধনার কোন স্তরে পৌঁছুলে এ জাতীয় উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে—ভাবলে সাধকের প্রতি শ্রদ্ধায় অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সাধকের আত্মনির্ভরতার সুরটি কিরূপ সরলভাবে এই পদটিতে প্রকাশিত হয়েছে দেখুন—

তোমার কে মা বুঝবে লীলা।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে॥
তুমি দিয়ে নিচ্ছো তুমি
বাছ রাখ না সাঁঝ সকালে।
তোমার অসীম কার্য্য অনিবার্য্য
মাপাও যেমন যার কপালে॥ ইত্যাদি

কবির মন্ত্র শুধু কালীর নাম জপ—

কালী তারার নাম জপ মুখেরে।
যে নামে শমন ভয়ে যাবে রে দূরে॥ ইত্যাদি

কিংবা—

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা॥ ইত্যাদি

তীর্থ-পর্যটন সব মিথ্যা। কেবল "দিবানিশি ভাবরে মন, অন্তরে করাল বদনা।" সাধকের নিবেদন—

ভাব না কালী ভাবনা কিবা
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥ ইত্যাদি

কিংবা—

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥ ইত্যাদি

কিংবা—

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে॥ ইত্যাদি

সাধককবি রামপ্রসাদের সাধনায় সমন্বয়বাদ ও উপকরণশূন্যতার কথা পূর্বে আমরা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সাধনার এই বিশ্বাস ও সরলতার ধারাটি মিশিয়ে নিলেই রামপ্রসাদের কবি ও সাধকজীবনকে উপলব্ধি করা সহজ হবে।

॥ আজু গোঁসাই ও প্রসাদীপদের প্যারডি ॥

আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই আমরা রামপ্রসাদের জীবনী-উপকরণ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করছি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর "রামপ্রসাদ" প্রবন্ধে বিষয়টি এইভাবে উত্থাপন করেছেন—

"রাজা (অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র) যখন কুমারহট্টে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন এবং অজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ সেন কবীন্দ্র ছিলেন, অজু গোঁসাই আদ্‌-পাগ্‌লা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তি বিষয়ে পদ বিন্যাস করিতেন, ইনি তখনি রহস্য ছলে তাহারি উত্তর করিতেন।"

রামপ্রসাদের পরবর্তী জীবনীকারেরা 'অজু গোঁসাই' সম্বন্ধে আরও পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। এই সব পরিচয় থেকে দেখা যায়, 'অজু গোঁসাই' রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী একজন প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল অযোধ্যারাম বা রাজু-গোস্বামী। নামটি বিকৃত হয়ে দাঁড়ায় আজু গোঁসাই। ইনি রামপ্রসাদের সম-সাময়িক ও বৈষ্ণব ছিলেন। ছড়া, গান ইত্যাদি বাঁধার শক্তি আজু গোঁসাইয়ের ছিল। তাঁর গানগুলি বিদ্রূপাত্মক ও হাস্যোদ্দীপক। তবে তিনি একেবারে কবিত্ব-শক্তিহীন ছিলেন না। তিনি সুপণ্ডিত ও ভাবুকও ছিলেন।

রামপ্রসাদের সমসাময়িকরূপে আজু গোঁসাইয়ের উপস্থিতি তৎকালে শাক্তবৈষ্ণবের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অস্তিত্বেরই প্রমাণ দেয়। রামপ্রসাদ অবশ্য সমন্বয়বাদী উদারপন্থী, তাই তাঁর সঙ্গে বৈষ্ণবের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাই ওঠে না। কিন্তু তবু এ জাতীয় কিছু ঘটেছিল এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই আজু গোঁসাইয়ের রচনারাজি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শাক্তপ্রাধান্যের যুগে রামপ্রসাদের মত সাধক কবির কবিতার ব্যঙ্গরূপ রচনা করে রামপ্রসাদের থেকে হীনতর প্রতিভার কবির পক্ষে কালোত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব ছাড়া আর কি বলা যায়। তবু রামপ্রসাদের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যই তাঁর নাম আজ আমাদের শ্রুতিগোচর হচ্ছে। তাঁর parody জাতীয় রচনাগুলি চমৎকার। আজ থেকে অন্ততঃ দুশো বছর পূর্বে বাংলায় রচিত এই ব্যঙ্গকবিতা-গুলি আমাদের মনে বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহল উদ্রেক করে। আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'রামপ্রসাদ' প্রবন্ধ এবং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "সাধককবি রামপ্রসাদ" গ্রন্থ থেকে তাঁর রচনাগুলি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

রামপ্রসাদের বৈষ্ণবদের প্রতি কটাক্ষসূচক "কর্ম্মের ঘাট, তৈলের কাঠ, আর পাগলের ছাট মোলেও যায় না।"—এই উক্তির প্রত্যুত্তরে আজু গোঁসাই রচনা করেন—
"কর্মডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মলেও যায় না।"

রামপ্রসাদের একটি বিখ্যাত সঙ্গীত—

এই সংসার ধোঁকার টাটি
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি ॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু, জল্, শূন্যে এত পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অলঙ্কারে লক্ষ কোটি ॥ ইত্যাদি

এই সঙ্গীতের উত্তরে আজু গোঁসাই রচনা করলেন—

এই সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি॥
ওরে যার যেমন মন তার তেমন ধন মন কররে পরিপাটি।
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি॥
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী।
রমণীরে বিষ ভেবেছ তাতেও তো দেখিনা ত্রুটি॥
তুমি ইচ্ছা সুখে খেলে পাশা কাঁচিয়েছ পাকাগুটি।
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া ভাবছো মায়ার বেড়ি কাটি॥
তবে শ্যামের পদে অভেদ জেনো শ্যামামায়ের চরণ দুটি॥

বৃদ্ধ বয়সে রামপ্রসাদের সন্তান জন্মের ইঙ্গিত এই ব্যঙ্গাত্মক কবিতাটিতে আছে বলে ধরা হয়।

রামপ্রসাদের আর একটি বিখ্যাত পদ—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥ ইত্যাদি

এই পদের উত্তরে আজু গোঁসাই রচনা করলেন—

বোলেছে রামপ্রসাদ কবি।
আয় মন বেড়াতে যাবি॥
তার কথায় কোথাও যেওনারে।
সাধকের মনের ভাব সে কি জানেরে॥
কেন মন বেড়াইতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাস্‌নেরে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে কোত্তে পারিস মাঝগাঙেতে ভরাডুবি॥
বাঁশ বনে গিয়ে ডোমকাণা হয় এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
শেষে কল্পতরুর তলায় গিয়ে কি ফল নিতে কি ফল নিবি॥

এই ব্যঙ্গ কবিতাটিতে রামপ্রসাদের অতিরিক্ত মদ্যপানাসক্তির প্রতি কোন ইঙ্গিত আছে কি না বলা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন রামপ্রসাদের পদ "সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।" পদটি নাকি এই ব্যঙ্গের উত্তরেই লেখা।

রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তনে' একাম্রকাননে ভগবতীর গোচরণ প্রসঙ্গে বর্ণনা আছে—

গিরিশ-গৃহিণী গৌরী, গোপ-বধূ বেশ।
কষিত কাঞ্চন কান্তি, প্রথম বয়েস ॥
সুরভীর পরিবার, সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে, শুনে মার বেণু॥
জগদম্বারে, যব পূরে বেণু। যব পূরে বেণু,
ধায় বৎস ধেনু। উড়ে পদ রেণু। রেণু
ঢাকে ভানু। ভাবে ভোর তনু। ইত্যাদি

এর উত্তরে আজু গোঁসাইয়ের রচনা—

না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হোয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে ॥

রামপ্রসাদ গাইলেন—

শ্যামভাবসাগরে ডোবোরে মন, কেন আর বেড়াও ভেসে।

গোঁসাই উত্তর করলেন—

একে তোমার কোপো নাড়ী।
ডুব্ দিওনা বাড়াবাড়ী ॥
হোলে পরে জরজাড়ি।
যেতে হবে যমের বাড়ী ॥

রামপ্রসাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতি কোন ইঙ্গিত এখানে থাকলেও থাকতে পারে।

রামপ্রসাদ গাইলেন—

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটার একটা করে যাব ॥ ইত্যাদি

এর উত্তরে আজু গোঁসাই গাইলেন—

সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি।
সর্বাঙ্গে নয় উভয় গালে ভূষোকালা মেখে যাবি।
আবার কালেরে দেখাতে কলা নিজে যে কলা দেখিবি।

রামপ্রসাদ গাইলেন—

কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ, মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে শ্মশানবাসী॥

আজু গোঁসাই গাইলেন—

পেসাদে তোর যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথায় গিয়ে দেখ্‌বিরে তোর মেসো আর মাসী॥
ঘরে বসে থাকিস্‌ যদি, ধরবে তোরে যক্ষ্মা কাশী।
এই বেলা নে তল্‌পি বেঁধে পথের সম্বল রাশি রাশি॥

রামপ্রসাদ গাইলেন—

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধিভাতি।
ওরে, জাননা কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥ ইত্যাদি

আজু গাইলেন—

হয়ো না মন পড়াপাখী।
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী॥
পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বল্‌বে পরের বুলি পরম তত্ত্বের জানিবে কি॥
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে সে ফলে উড়ে খাওগে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর, শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি॥

রামপ্রসাদের বিখ্যাত পদ "আমায় দেওমা তবিলদারী"র উত্তরে আজু গোঁসাই গাইলেন—

কেনে চাস্‌ ভাই তবিলদারী,
ওকাজে আছে ঝুঁকি ভারি।
দু'দিনকার মুহুরী হয়ে তাইতে এত বাড়াবাড়ি॥
পেলে তবিল, ভাঙতে এক তিল, তোমার আর সবে না দেরি।
পদরত্নভাণ্ডার লোটে তাইতে কেন হিংসে আড়ি।
দাতা যে বিলাচ্ছে সে ধন, পেট ফুলে মরে ভাঁড়ারি॥
কর্ম্ম অনুসারে পদ শ্যামার সরকার সুবিচারী।
বাপ দাদার নজির এখানে, হবে না হে কার্যকরী॥

হেথা যে যেমন লায়েক, সেই মোতাবেক পদের বিচার হয় হে তারি।
তোমার যেমন কর্ম্ম, তেমন কর্ম্ম, পদ পেলে কর্ম অনুসারী॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর আর, সাধে কি শিবের মাইনে ভারি।
সে সকল ছেড়ে ঐ পদে যে বিকিয়েছে হয়ে ভিখারী।
আগে, বিন্‌মাইনে কাজ শেখে সবাই, হয়ে পদের অধিকারী।
যদি পদ পেতে চাও, কর্ম শেখ, শেষে হবে মাইনে ভারি॥

তৎকালীন চাকরিবাকরির প্রকৃতি ও নির্বাচন ব্যবস্থার কোন ইঙ্গিত এতে আছে কিনা বলা যায় না।

"হয়ো না মন পড়াপাখী" পদে আজু গোস্বামীকৃত parodyর একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়—

প্রসাদ করো স্তুতি নতি যতনে পড়াচ্চো কাকে?
বিনে শুক সালিখ কি কালীকৃষ্ণ পড়ালে পর পড়ে কাকে।
তোমার মন এখনো কাক রয়েছে, সেই স্বভাব তার কর্মপাকে॥
তুমি বল, পোড়তে আত্মারাম, সে স্বভাবে কা কা হাঁকে।
ওহে চোরেখেকো পাখীকে কেউ যদিও পিঞ্জরে রাখে তাতে
মন ভোলে না, পোষ মানে না, খাঁচার কাঠি কাটতে থাকে।
ওহে শুকের প্রকৃতি কখন্ বল্লেই কি তা ধরে কাকে?
পিটলে পড়ে গাধা কখন, ঘোড়া কি হয়ে থাকে?

শাক্তবৈষ্ণবের চিরকালীন দ্বন্দ্বের সমাপ্তিসূচক রেশটুকু এই ব্যঙ্গকবিতাগুলির মধ্যে ধরা আছে। ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বের পরিণতি ঘটেছে ব্যক্তিগত আক্রমণেতে এবং তাও একপক্ষীয়। কিংবা হয়তো এ জাতীয় গুরুত্ব দিয়ে ভাবাব বিষয়ও নয় এগুলি। নিছকই রঙ্গতামাসা হয়তো এ সব রচনার লক্ষ্য।

রামপ্রসাদের পদসংখ্যা ও বিভিন্ন রামপ্রসাদের কথা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পৌষ ১২৬০এর সংবাদপ্রভাকরে লিখেছেন—"অপিচ এমত জনরব যে কবিরঞ্জন একলক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে অপর কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল তাঁহার প্রণীত একটি পদ সাক্ষি স্বরূপ হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যথা—

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
ফুকারে ফরেদী দাদী, না হয় সঞ্চার রে॥

আরজ্ বেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাষ্য কিবে, মাগো।
ওমা, দেওয়ান্ দেওনা নিজে, আস্তা কি কথার রে।
লাক্ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া, মাগো।

* * * *

রামপ্রসাদ সেন লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, অনেকাংশে সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত পদ বিন্যাসে বিরত হয়েন নাই। মনে যাহা উদয় হইয়াছে তাহারি কবিতা করিয়াছে।"*

দয়ালচন্দ্র ঘোষ** তাঁর "প্রসাদ-প্রসঙ্গ" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ২৩ পৃষ্ঠায় (প্রমথনাথ চৌধুরী সম্পাদিত) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"রামপ্রসাদ অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

"লাখ উকিল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া।"

কবিরঞ্জনের এই বাক্যে কেহ কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন না। কোন জীবনাখ্যায়ক ইহাকে অসম্ভব প্রমাণ করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন ইহা প্রমাণিত না হইলেই বড় ক্ষতি হইল, এ মনে করি না। তিনি লক্ষ সঙ্গীতই রচনা করিয়াছিলেন এমনও প্রমাণ করিতে চাই না; অন্যেরা যেমন "বহু সংখ্যক" বলিয়াছেন, আমিও তাহাই বলিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁহারা যে কারণে অসম্ভব বলিয়াছেন, তাহা আমার নিকট তদুপযোগী বোধ হয় নাই। প্রত্যহ পাঁচটি সঙ্গীত রচনা করিলে ৫৪ বৎসর ৯ মাস ২০ দিবসে এক লক্ষ সঙ্গীত প্রস্তুত হয়। রামপ্রসাদ ৫৪ বৎসরের কম বাঁচিয়াছিলেন, এবং অশিতি বৎসরেরও অধিক জীবিত ছিলেন তার প্রমাণ কি? আবার রামপ্রসাদের সাধনার এক দিবসকে অন্যের দুই দিবস ধরিতে হইবে। কারণ, তিদি অহোরাত্র শক্তির ধ্যান ও মহিমাকীর্ত্তনে রত থাকিতেন।......যিনি কথায় কথায় সঙ্গীত রচনা করিতেন, সেই রামপ্রসাদ সারা জীবন অহর্নিশি সঙ্গীত সাধনা করিয়া লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিবেন অসম্ভব কি?...'লাখ উকীল করেছি খাড়া' একথা যে অনুমানে বলিয়াছেন তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই। যিনি কখনও সঙ্গীতকে পত্রস্থ করিতেন না, তাঁহার পক্ষে এরূপ নিশ্চয় সংখ্যা দেওয়া অসম্ভব।"***

---

* ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী"—পৃঃ ৬৩

** দয়ালচন্দ্র ঘোষ রামপ্রসাদের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য জীবনীকার।

*** "রামপ্রসাদ" গ্রন্থে যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "রামপ্রসাদ একটি সঙ্গীত কখনও দুইবার গাহিতেন না। এইজন্য তাঁহার গানের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য।" (পৃঃ ৬৫, ৩য় সংস্করণ)।

দয়ালচন্দ্র ঘোষের রামপ্রসাদপ্রীতিই এ জাতীয় আলোচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর "রামপ্রসাদ" প্রবন্ধে জানিয়েছেন "নানা স্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাহারা সংকীর্ত্তনাদি নানা বিষয়ক গীত লইতে আসিত তাহারা কালীর ও কবির প্রণামি স্বরূপ অনেক অর্থ ও বহু প্রকার দ্রব্যাদি অর্পণ করিত।"

এভাবে রামপ্রসাদের পদ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ঈশ্বরগুপ্ত এই প্রবন্ধেরই একস্থলে বলেছেন—

"পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সেরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে "বাসিকাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরক যাইতে হইবেক।"

স্নানকালে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে তিনি সঙ্গীত রচনা করে গাইতেন। নৌকারোহী যাত্রী এবং নাবিকেরা নৌকা থামিয়ে তা শুনতো। এই ভাবেই মনে হয় দূরে নিকটে তাঁর গান ছড়িয়ে পড়ে। গানে সত্তাধিকারীর ছাপ মাত্র ঐ নাম চিহ্নিত ভণিতাটুকু। এই ভণিতা আরও বিশেষিত বা রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়। অন্যের রচনাও এই ভণিতায় পরিচিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সবই ঘটেছে। তাই তাঁর পদের বহুবিধ ভণিতা দেখা যায়।

প্রসাদ, রামপ্রসাদ, ভিষক্‌প্রসাদ, দীন রামপ্রসাদ, দ্বিজ রামপ্রসাদ, শ্রীরামপ্রসাদ, প্রসাদ দীন, শ্রীনাথ, রামপ্রসাদ দাস, শ্রীকবিরঞ্জন, প্রসাদ দাস, কবি রামপ্রসাদ, কবিরঞ্জন, কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন, কবি রামপ্রসাদ দাস, রামপ্রসাদ কিঙ্কর প্রভৃতি বিচিত্র ভণিতার পরিচয় মেলে। এদের মধ্যে 'প্রসাদ' আর 'রামপ্রসাদ' ভণিতার পদই অধিকাংশ। ভণিতায় নাম নাই এমন পদ সংখ্যাধিক্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। আবিষ্কর্তা বা রক্ষকের সাক্ষ্য থেকেই সেগুলিকে সাধককবি রামপ্রসাদের পদ বলে গ্রহণ করা হয়।

প্রসাদ চিহ্নিত পদও যে দখলীসত্বে সব সময় প্রতিষ্ঠিত নয় "তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি" ভাবপ্রকাশক তাঁর সুবিখ্যাত পদটি তার প্রমাণ। ত্রিপুরার দেওয়ান ঈষৎ রূপান্তরিত আকারে এই পদটির একজন দাবিদার।

আবার শ্রীরামপ্রসাদচিহ্নিত "জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজী" পদটি শ্রীরামদুলাল ভণিতায় পাওয়া যায়। অনেকে এটিকে রামদুলাল নন্দীর পদ বলে গ্রহণ করতেই রাজি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শাক্তপদাবলী'তে একে রামদুলাল নন্দীরই পদ বলা হয়েছে। অথচ ভাবসাদৃশ্যে একে রামপ্রসাদের বলেও গ্রহণ করা যায়।

হুবহু এই ভাবেরই পদ রামপ্রসাদের একাধিক আছে তবে এখানে প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে যে ছটফটানি আছে, তাতে পদটি রামপ্রসাদের হাত থেকে বেরোন সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। রামপ্রসাদের পদে ভাষা বেরিয়ে আসে অন্তর থেকে, কলম থেকে নয়। তিনি কলমে পদ লিখতেনই না।

পদে হিন্দী, ফারসী বা ইংরেজি শব্দের ব্যবহার দেখে একসময়ে রামপ্রসাদের পদ নয় বলে কেউ কেউ মনে করতেন। রামপ্রসাদ কুমারহট্টে বাস করে হুগলী বা কলকাতায় চাকরি করে এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ইংরেজি শব্দের সঙ্গে একেবারে পরিচিত ছিলেন না, একথা ভাবা যায় না। আর পারস্য ভাষা তিনি নিজেই জানতেন। তাঁর হিন্দীর সঙ্গেও পরিচয় ছিল ধরে নেওয়া যায়।

তিনি চিকিৎসকের সন্তান ছিলেন, সুতরাং ভণিতায় 'ভিষক' ব্যবহার অস্বাভাবিক কিছু নয়। দেবীর দাস বলে মনে করে ভক্তিবিনয়ে 'দাস' ভনিতার ব্যবহারে বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই।

ভণিতায় 'শ্রীনাথ' কথাটির ব্যবহার এবং নানাস্থানেই 'শ্রীনাথ' এর তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দেখে 'শ্রীনাথ'কে রামপ্রসাদের গুরুর নাম বলে অনেকে মনে করেন। বস্তুতঃ অনুমানটি ঠিক নয়। তান্ত্রিক সাধকদের কাছে শ্রীনাথ শব্দটি কেন এত মূল্যবান বলতে পারি না, তবে কমলাকান্তের পদেও 'শ্রীনাথে'র একই ভাবে ব্যবহার আছে। যেমন—

কালী সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি কি না রাখবি সেটা॥

(১২৮৭ বঙ্গাব্দে হৃদয়লাল দত্ত প্রকাশিত "পদাবলী" পৃঃ ৭৮ দ্রঃ)

রামপ্রসাদের গুরুর নাম জানা যায় না। অনেকে নানারূপ অনুমান করেন। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "রামপ্রসাদ" (৩য় সংস্করণ-১৩৫৭) গ্রন্থে বলেছেন, রামপ্রসাদ প্রথমে কুলগুরু মাধবাচার্যের নিকট তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন (পৃঃ ১১)। তারপর তাঁকে তান্ত্রিকমতে শিক্ষিত করে তোলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। (পৃঃ ১২)

কেউ কেউ রামপ্রসাদের গুরুর নাম অনুমান করেন 'কৃপানাথ'। এরূপ অনুমানের কারণ 'কালীকীর্তনে'র একটি ভণিতা—"কৃপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ, প্রাণ দান দিয়া লৈতে চায়।"

'বিদ্যাসুন্দরে' সুন্দরের মুক্তিলাভের সংবাদ পেয়ে বিদ্যা কৃতজ্ঞচিত্তে দেবীসম্বোধন করে বলেছে—'তুমি কৃপাময়ী মা গো কৃপানাথ ভর্ত্তা।' সুতরাং গ্রন্থের উল্লেখ থেকে 'কৃপানাথ' রামপ্রসাদের গুরুর নাম কিনা বলা যায় না।

॥ দ্বিজ রামপ্রসাদ ॥

সাহিত্যক্ষেত্রে ঝড় তুলেছে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতা নিয়ে। এই ঝড়ের ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন প্রথমে দয়ালচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'প্রসাদ-প্রসঙ্গে'র ভূমিকায় একটি মন্তব্য করে। তিনি লিখলেন—"এক্ষণ আর একটি গুরুতর গোলের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ব-বাঙ্গালার অনেকেরই এরূপ অবগতি সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ "দ্বিজ" ছিলেন। কিন্তু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যে দ্বিজ ছিলেন না, ইহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। দ্বিজ শব্দের রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করিয়া মূল অর্থে কবিরঞ্জনকেও অবশ্য দ্বিজ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক মানবাত্মাকে মুক্তির পূর্বে দ্বিজ হইতে হইবে। মানবাত্মা সেই পর্য্যন্ত মৃত যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরেতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া "দ্বিজ" হয়! এই মূল অর্থে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদই কোন কোন সঙ্গীতে দ্বিজ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন কিনা ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন। আমার বোধ হয় তিনি এরূপ করেন নাই। তাঁহার সঙ্গীতগুলি গভীর ভাবাত্মক। কিন্তু "দ্বিজ রামপ্রসাদ" নামে যে সকল সঙ্গীতে ভণিতি ছিল, সে সকল অপেক্ষাকৃত অনেক লঘুতা প্রকাশক। ...."দ্বিজ রামপ্রসাদ" ভণিতিযুক্ত সঙ্গীত পাওয়া গেল বটে, কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ বাস্তবিক একজন ছিলেন কিনা? যদি ছিলেন, তাঁহার বাড়ী কোথা? তিনি কোন শতাব্দীর লোক? কি করিয়াই বা জীবন নির্বাহ করিয়াছিলেন? ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানা গেল না। দ্বিতীয়, "কবিরঞ্জনের কাব্য সংগ্রহে" যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে তাহারও কোন কোনটি দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। এমন কি কবিরঞ্জনের জীবন সম্বন্ধে যে তিনটি আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ আছে, সেই তিনটিই দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তৃতীয়, এই সকল সঙ্গীতের সুর ও রচনার বিভিন্নতা অতি অল্প। কেবল দুই এক স্থলে ভাবের কিঞ্চিৎ গুরুতা ও লঘুতা দৃষ্ট হয়।......অথচ যে পর্য্যন্ত দ্বিজ রামপ্রসাদ বিষয় বিশেষরূপে জানা না যায়, সে পর্য্যন্ত সঙ্গীতগুলি কবি রামপ্রসাদের নয় ইহাও বলিতে পারি না।" (প্রসাদ-প্রসঙ্গ—১ম সংস্করণ, প্রমথনাথ চৌধুরী সম্পাদিত, পৃ ১৫-১৬)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পূর্বোদ্ধৃত একটি অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি, রামপ্রসাদের পদাবলী পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শ্রদ্ধার সঙ্গেই সাধারণ মানুষ সেগুলি গ্রহণ করে-ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দয়ালচন্দ্র ঘোষের পূর্বোদ্ধৃত দ্বিজ রামপ্রসাদ সংক্রান্ত ঘোষণাটির ওপর নির্ভর করে "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন" গ্রন্থের পরিশিষ্টে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখলেন—

"কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত একাধিক ব্যক্তির রচনা রামপ্রসাদী গানে মিশিয়া গিয়াছে। কবিরঞ্জনের গান লোকসাহিত্যের আসরে যে এক অপূর্ব সৃষ্টি

করিয়াছিল, তাহার অনুকরণে বাঙ্গলার সর্বত্র গান রচিত হইতে লাগিল। এ জাতীয় গীতিকাব্যের সংখ্যা শতাধিক হইবে—উত্তম, মধ্যম ও অধম। অথচ এই গীতিসাহিত্য মামুলী পুথি নিবদ্ধ সাহিত্য নহে, অধিকাংশই মুখে মুখে প্রচারিত। অনুকরণকারীদের মধ্যে দুই একজন "রামপ্রসাদ" ছিলেন—নীলু রামপ্রসাদের দলভুক্ত ঈশ্বর গুপ্তের প্রায় সমকালীন কলিকাতা সিমল্যা নিবাসী ব্রাহ্মণ বংশীয় কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ঠাকুর অন্যতম বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক, গুপ্তকবির সংগৃহীত রামপ্রসাদী কবিতার মধ্যে একটিও কবিওয়ালার নহে—গুপ্তকবির সময়ে কবিওয়ালার পদ "সর্বশ্রেষ্ঠ" কবির পদের সহিত মিশ্রিত হইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনাই ছিল না।…

ঈশ্বর গুপ্তের পর প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া যাঁহারা নানাভাবে সংগ্রহ করিয়া রামপ্রসাদের গান বিপুলায়তন করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা কেহই গুপ্তকবির ন্যায় পরিশ্রম, সাবধানতা ও গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। তাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ শক্তিসাধক ও সঙ্গীতকার 'দ্বিজ রামপ্রসাদে'র জীবনী ও তাহার রচনার সমুচিত আলোচনা বাঙ্গালা সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাস হইতে বাদ পড়িয়াছে। রামপ্রসাদী গানের প্রায় চতুর্থাংশ এই দ্বিজরচিত এবং তিনি নিশ্চিতই কবিরঞ্জনের পরবর্তী বা অনুকারী ছিলেন না। কবিরঞ্জনের জীবনীর এক স্থলে গুপ্ত কবি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন—"পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই।…" আশ্চর্য্যের বিষয় এই অনুচ্ছেদের প্রতি অদ্য পর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই। দয়াল ঘোষ লিখিয়াছিলেন—"পূর্ব্ব বাঙ্গলার অনেকেরই এরূপ অবগতি, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ দ্বিজ ছিলেন।"…..তিনি তাঁহার বাড়ীর সন্ধানও পাইয়া লিখিয়াছিলেন—"কেহ বলিল, তাঁহার বাড়ী মহেশ্বরদি পরগণায়,"…এবং কোন্ গান কবিরঞ্জনের রচিত ও কোন্ গান দ্বিজের রচিত, তাহারও বিভাগ একমাত্র তিনিই অবগত হওয়ার অনেকটা সুযোগ পাইয়াছিলেন। একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন :—

"কবিরঞ্জনের 'কাব্যসংগ্রহে' যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও কোন কোনটা দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন।"…এই সকল মূল্যবান্ প্রমাণসূত্র অর্ব্বাচীনের মত উপেক্ষা করিয়া দয়াল ঘোষই দ্বিজ রামপ্রসাদের বিবরণাদি বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছেন। ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় সামান্য অনুসন্ধান করিলেই রামপ্রসাদের বিষয়ে বহু তথ্য তৎকালে জীবিত প্রাচীনদের নিকট তিনি জ্ঞাত হইতে পারিতেন। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে কয়জন লেখক দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়াছেন,

তন্মধ্যে কেহই পরিশ্রমসাধ্য কিছুমাত্র সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই, কেবল সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া গবেষণার ক্ষেত্রকে কলুষিত করিয়াছেন।...রামপ্রসাদের মালসী গানের ভাব, ভাষা ও সুর কবিরঞ্জনের তুল্য এবং তাঁহার যোগৈশ্বর্যের মধ্যে "বেড়া বাঁধা" ঘটনাটি অতি প্রসিদ্ধ।..কবিরঞ্জন সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রচারিত আছে —গুপ্তকবি তদুপরি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এই সকল ঘোষণা প্রসাদ স্বয়ং কখনও করেন নাই, কেন না তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার কোন উল্লেখ থাকিত।"

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য অতি কষ্ট স্বীকার করে মহেশ্বরদি পরগণার চীনীশপুরের দ্বিজ রামপ্রসাদ বা রামপ্রসাদ ঠাকুর বা পেদুঠাকুরের বংশাবলী উদ্ধার করেছেন এবং বলেছেন—"সিদ্ধিলাভের পর বেশী বয়সে পুনঃ বিবাহ করিয়া রামপ্রসাদ প্রায় ১৭৪৫-৫০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে চীনীশপুরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি কবিরঞ্জন অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।"

এই দীর্ঘ গবেষণায় দীনেশবাবুর গবেষণা নিষ্ঠার পরিচয় নিঃসন্দেহে মিলছে কিন্তু তাঁকে কবিরঞ্জনের এক চতুর্থাংশ পদের অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার কোন সদুত্তর মিলছে না। সর্বোপরি তিনি দয়ালচন্দ্র ঘোষকে 'অর্বাচীন' আখ্যা দিয়ে গবেষণা-ক্ষেত্রে নিজেই বিষ ছড়িয়েছেন বলে মনে হয়।

কুমারহট্টের পার্শ্ববর্তী গ্রাম কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী হয়ে ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রামপ্রসাদের জন্ম সময়, জীবিকার্জন প্রভৃতি ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে পারলেন না, আর দয়াল ঘোষ আরও কুড়ি বছর পরে কবিরঞ্জনেরও বয়োজ্যেষ্ঠ একজন কবির সম্যক পরিচয় সংগ্রহ করতে পারলেন না বলে দোষী হবেন কি করে বোঝা গেল না। তাছাড়া দীনেশবাবু ঈশ্বরগুপ্তের বিবরণের কি যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন ?

ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত পদগুলি এখানে পাওয়া যায় না বলায় পূর্ব-বঙ্গের পদগুলি রামপ্রসাদেয় নয় একথা কোথাও বলেন নি। রামপ্রসাদি পদের রক্ষায় ও প্রচারে নানা বিশৃঙ্খলার উল্লেখ ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় আছে। রাম-প্রসাদের পদ লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তো। নাবিকদের মুখে মুখে তা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি!

কুমারহট্ট গঙ্গার তীরে, আর পদ্মা দিয়ে নদীপথে হুগলী, চন্দননগর, কলকাতা প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তী বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যবন্দরে কুমারহট্টের পাশ দিয়েই আসতে যেতে হত। তৎকালীন ঐতিহাসিক চিত্রটি মনে রাখলে এ জাতীয় ধারণায় কোন অসুবিধেই হয় না।

দীনেশবাবু ঈশ্বরগুপ্তের এই উক্তিটিকে যেমন গুরুত্ব দিলেন, তেমনি অন্য উক্তিকে অগ্রাহ্য করলেন। কুমারহট্টের বেড়া বাঁধার জনরবটি ঈশ্বরগুপ্ত মনে হয় বানিয়ে লিখেছিলেন, কেননা তাহলে চীনীশপুরের দ্বিজ রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধা ঘটে না। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এই ঘটনা এবং অনুরূপ আরও ঘটনা সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছিলেন, দেখা যাক। "রামপ্রসাদ" প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, "এই প্রকার চমৎকার চমৎকার ব্যাপার ঘটিত জনরব কত আছে যাহার বর্ণনা করিতে হইলে একখানা পুস্তক ভিন্ন কোন মতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই সকল ঘোষণা প্রসাদ স্বয়ং কখনই করেন নাই, কেননা তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার কোন উল্লেখ থাকিত।"

ঈশ্বর গুপ্তের এ মন্তব্য তাঁর সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে, শুধু 'বেড়াবাঁধা'র ব্যাপারটি ছেঁকে বের করে নিলে অন্যায় হবে।

তাছাড়া আমরা পূর্বে দেখেছি, ঈশ্বরগুপ্তের সমস্ত বর্ণনাই অনুমাননির্ভর এবং এ অনুমানের মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। ঈশ্বরগুপ্ত মাত্র ৭৭টি রামপ্রসাদি পদ প্রকাশ করেছিলেন। দয়ালচন্দ্র ঘোষ অনেক অনুসন্ধান করে ২৬২টি রামপ্রসাদি পদ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার মধ্যে মাত্র ১৫টি পদের ভণিতায় "দ্বিজ রামপ্রসাদ" পাঠ দেখা যায়। ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদের 'অসীম' রচনার উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু তার কতটুকু তিনি দিয়ে যেতে পারলেন? পূর্ববঙ্গে প্রচারিত পদগুলিকে তিনি কবিরঞ্জনেরই রচনা বলে মনে করতেন।

দীনেশবাবু "প্রায় শত বৎসরের পুরাতন একটি পত্রে" যে পদটি আবিষ্কার করলেন—

মাগো তারা সুরেশ্বরি,
কেন অবিচারে আমার তরে করেন দুক্ষের ডিগিরিজারি॥ প্রভৃতি

তা বহু পূর্বেই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'প্রসাদ পদাবলী'তে ১৬নং গানরূপে প্রচারিত ছিল এবং সূচনায় ছিল "মা গো তারা ও শঙ্করী"। ত্রিপুরায় কবিতাটির ভাষাগত রূপান্তর ঘটে শুধু। এই কবিতায় ব্যবহৃত ভাষা ও প্রসঙ্গের সঙ্গে চীনীশপুরের এমন কি পূর্ববঙ্গের কোন কবির বিন্দুমাত্র যোগ থাকাই সম্ভব নয়।

পদটি সেখানে পরিবর্তিত আকারে প্রচারিত রয়েছে। রামপ্রসাদের গান এমনি ভাবেই লোক মুখে ছড়িয়ে প'ড়ে অনেক সময়েই রূপান্তরিত হত। না হলে কি ধরতে হবে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বয়োজ্যেষ্ঠ কবি দ্বিজ রামপ্রসাদের পদটিকে এখানে শুনে 'কৃষ্ণচন্দ্র' ও 'কৃষ্ণপান্তি' কথাগুলি বসিয়ে দিয়ে নিজের করে নিয়েছিলেন?

সাধক সিদ্ধপুরুষ ব্যক্তিদের রচনা নিয়ে এজাতীয় আলোচনাই অশ্রদ্ধেয়। আমরা শুধু এ প্রসঙ্গে পাঠককে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত "সাধক কবি রামপ্রসাদ" (১৯৫৪) গ্রন্থ-

খানির 'সতেরো' পরিচ্ছেদ বা ২০০ পৃষ্ঠা থেকে ২৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। এখানে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সকল মন্তব্যের অতি যুক্তিসহ সদুত্তর আছে। "দ্বিজ রামপ্রসাদ" ভণিতাযুক্ত পদগুলি দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে স্বতন্ত্র কবিসাহিত্যিকের রচনা বলে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এগুলিকে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনা বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত হবে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রামপ্রসাদের সিদ্ধিলাভপূর্বজীবনে "দ্বিজ রামপ্রসাদ" ভণিতা গ্রহণের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শুধু 'প্রসাদ' চিহ্নিত পদগুলিই সিদ্ধিলাভপরবর্তী রচনা হতে পারে। সিদ্ধিলাভের পর উপাধি বা বিশেষণের কোন মূল্য বা প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

দয়ালচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতার পদগুলির ভাবগভীরতা কম। বয়স ও অভিজ্ঞতার অল্পতাই এই অগভীরতার কারণ। এগুলি তাঁর প্রথম দিকের পদ বলে গৃহীত হতে পারে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখায় একটি মূল্যবান ঘটনার পরিচয় পাই—"হালিসহরে ও কাঁচড়াপাড়ায় একশত বৎসর পূর্বে বৈদ্যেরা ও ব্রাহ্মণেরা পরস্পরকে নিজেদের হুঁকা দিতেন অর্থাৎ একহুঁকায় তামাক খাইতেন। ঐ স্থানে বৈদ্যগণকে কেহ অদ্বিজ মনে করিত না। ইহারা সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণদের মতো বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতেন।" (পৃ ২১৭)

বিশ্বকোষপ্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু আর এক প্রকার অনুমান করেছেন। বিশ্বকোষের তৃতীয় খণ্ডের ৩৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—রামপ্রসাদের সময়ের কিছু পূর্ব হতে বাঙ্গালায় বৈদ্যসমাজ নিজেদিকে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলে প্রমাণ করে উপবীত গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন এবং অশৌচকাল কমিয়ে দেন। রামপ্রসাদ কি এই আন্দোলনে পড়ে দ্বিজ নামে নিজেকে অভিহিত করেন ?

নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য করেছেন, রামপ্রসাদ কখনই ব্রাহ্মণদের প্রতি অসম্মান দেখিয়ে হুজুগে মাতবার মত তরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন না।

।। কবিওয়ালা রামঠাকুর ।।

"কলিকাতার সিমলা নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রায় সমসাময়িক" রামপ্রসাদ চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এড়িয়ে গেছেন। "দ্বিজ প্রসাদ" ভণিতার তিনিও একজন দাবীদার হতে পারেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর পদ বাদ দিতে পারেন কিন্তু তাঁর পরে রামপ্রসাদের অনেক পদ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই রামপ্রসাদ বিখ্যাত কবিওয়ালা নীলুঠাকুরের দলে গান বাঁধতেন। বিশ্বকোষে নীলুর

দলের গান রামপ্রসাদ ঠাকুরের রচনা বলেই বিখ্যাত। নীলু পাটনীর পর তিনিই দলটিকে রাখতেন। রাম বসু কৃত একটি গানে রামঠাকুরের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

নীলু ঠাকুরের পর রামপ্রসাদ যখন তাঁর দলের কর্তা তখন কলকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়ি দুর্গোৎসবের সময় এক আসরে রামবসুকে শ্লেষ করে একটি লহরের ছড়ায় গেয়েছিলেন—

নেই কো রামবোসের এখন সেকেলে পৌরোষ।
এখন দল করে হয়েছেন রাম বোস
রামকামারের......কোষ ॥

রামবসুও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন—

(মহড়া) তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন্।
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটি দিন ॥
(চিতেন) যেমন রাতভিখারীর ধামাবওয়া থাকে এক একজন ;
হরিনাম বলে না মুখে পিছু থেকে চাল কুড়ুতে মন ;
কর্মে অকর্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্মা,
নন কাজের কাজি ঠাটর বাজী (ভাইরে)
ঠিক যেন ধোবার বিশকর্ম্মা ;
যেমন বিদ্যাশূন্য বিদ্যাভূষণ সিদ্ধিবস্তু বস্তুহীন ॥
(অন্তরা) নীলমণি মলে নীলমণির দলে,
ঢুকলো শিংভাঙ্গা এঁড়ে বাছুরের পালে,
যেমন নবাব ম'লে নবাব হ'ল উজীরালী আড়াইদিন,
মরি হায় কি সুরৎ, ঠিক যেন বজরার মুরৎ,
খাড়া আছেন খাপ খুলে রাতদিন ॥
যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জাঁক,
দুনিয়ার কর্মেতে কুড়ে ভোজনে দেড়ে বচনে পুড়িয়ে করেন খাক,
তেমনি শ্রীছাদ, এই পেটকো মুলুক চাঁদ,
ধ'রে কৃষ্ণপ্রসাদ.........তরেন রামপ্রসাদ ?
যেমন জন্মে কভু হাত পোনে না দোলে লবেদার আস্তীন ॥

(বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩২৫)

কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ভাল গাইতে পারতেন না* এবং যা রচনা করতেন তাও

* দ্রষ্টব্য "রামপ্রসাদ"—যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৩য় সংস্করণ, পৃ ২৮৪)

কবিওয়ালাসুলভ তরলতাপূর্ণ, সাধক কবি রামপ্রসাদের পদের সঙ্গে এই রামপ্রসাদ চক্রবর্তীর পদ মিশে যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

বিভিন্ন রামপ্রসাদ নামের কোন সমাধানই সম্ভব নয়। রামপ্রসাদের পূর্বে উল্লিখিত সব ভণিতার পদসমূহ আলোচনা করে দেখা যায়, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সুনিশ্চিত রচনা বলে গ্রহণ করা যায়, এমন পদ সব ভণিতাতেই আছে। বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন অবস্থার, বিভিন্ন ভাবের পদসকলের আলোচনা করে রামপ্রসাদ জীবনীতে কি ভাবে তাদের সুসামঞ্জস্য সাধন করা যায়, তার চেষ্টা পূর্বে বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। পাঠককে আলোচনাগুলি প'ড়ে নিজের মত গঠন করতে অনুরোধ করি। কবিওয়ালা রাম ঠাকুরের পদ যখন চিনতে পারছি না, দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতার পদ যখন চীনীশপুরের রামপ্রসাদের রচনা বলে সুনিশ্চিতরূপে গ্রহণ করতে পারছি না, তখন আপাততঃ রামপ্রসাদ নামের সঙ্গে যুক্ত সকল পদকেই কুমারহট্টের রামপ্রসাদের পদ বলে গ্রহণ করাই বোধহয় সমীচীন হবে।

পূর্বে বলেছি, এখনও বলছি, রামপ্রসাদের পদ আলোচনায় মনে রাখতে হবে, রামপ্রসাদ কখনও পদ লিখে রাখতেন না, মুখে মুখে রচনা করতেন। অনুরোধ বা প্রাণের তাগিদে সব সময়ই নতুন নতুন পদ রচনা করে গাইতেন। সে গান নানাভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো। গায়কের খেয়ালখুসী মত তা পরিবর্তিত রূপও গ্রহণ করতো। অনেক সময় অশিক্ষিত লোকের স্মৃতিশৈথিল্য ও বুদ্ধিহীনতাই নানারূপ বিকৃতি ঘটানোর জন্য দায়ী। অনেকে আবার নিজের রচনায় প্রচারসুবিধার জন্য প্রসাদভণিতা জুড়ে দিত। রামপ্রসাদ রচনার অধিকারী নিয়ে এই জন্যই নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আবার এ জটিলতার পাক কোনদিন খুলবে বলেও মনে হয় না।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য

॥ ঘটনা ও দুর্ঘটনা ॥

রামপ্রসাদের জীবৎকাল ১৭২০ খৃঃ থেকে ১৭৮১ খৃঃ পর্যন্ত। এই সময়কার বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা থাকা চাই। পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক অবস্থা প্রসঙ্গে আমরা সাধারণভাবে তার কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি।

রামপ্রসাদের জীবৎকাল শুরু হয় মুর্শিদকুলী খাঁর নবাবী আমলে এবং সমাপ্ত হয় ওয়ারেণ হেস্টিংসের গভর্ণরিকালে।

মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭১৭ খৃঃ থেকে ১৭২৭ খৃঃ পর্যন্ত বাংলা উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন।

১৭২৭ খৃঃ থেকে ১৭৩৯ খৃঃ পর্যন্ত তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন প্রথম বাংলা ও উড়িষ্যা এবং পরে (১৭৩৩ খৃঃ থেকে) বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মালিক ছিলেন। তারপর কিছুকাল তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ শাসন ক্ষমতা পান। তাঁর পর ১৭৪০ খৃঃ থেকে ১৭৫৬ খৃঃ পর্যন্ত নবাব আলিবর্দীর শাসনকাল। ১৭৫১ খৃঃ থেকে উড়িষ্যা আলিবর্দি খাঁর হাতছাড়া হয়।

শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার শাসনকাল শেষ হয় ২৩শে জুন, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ। সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফর গদি লাভ করেই ইংরেজকে উপঢৌকন হিসেবে ২৪ পরগণা জেলা দিয়ে দেন। ১৭৬০ খৃঃতে মীরকাসিম নবাব হয়ে মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার সঙ্গে বর্ধমান জেলাও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়ে দিলেন।

১৭৬৫ খৃঃতে কোম্পানী নিজেই সমগ্র রাজ্যের দেওয়ানীর ভার গ্রহণ করে এবং নামতঃ দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সত্বর তারও অবসান হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভের সাময়িক অনুপস্থিতিকালে ভান্সিটার্ট কলকাতার গভর্ণর হন। ক্লাইভের পর ১৭৬৭ খৃঃ থেকে ১৭৬৯ খৃঃ পর্যন্ত ভেরেলেস্ট্ এবং ১৭৬৯ খৃঃ থেকে ১৭৭২ খৃঃ পর্যন্ত কার্টিয়ার কোম্পানীর গভর্ণর হন। ১৭৭২ খৃঃ তে ওয়ারেণ হেস্টিংস গভর্ণর হন এবং তাঁর মেয়াদ চলে ১৭৮৫ খৃঃ পর্যন্ত। এঁর শাসনকালেই রামপ্রসাদের তিরোধান ঘটে।

আমাদের আলোচ্য সময়ের পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা দুটি—দেবীসিংহের বিদ্রোহ ১৬৯৫-৯৬ এবং ১৭০৭ খৃঃতে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু। দুটি ঘটনারই বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

আলোচ্য সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তিনটি—বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪২খৃঃ-১৭৫১ খৃঃ) ব্রিটিশপ্রভুত্বের সূচনা (১৭৫৭ খৃঃ) এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬ ও ইংরেজি ১৭৬৯ খৃঃ)।

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন এই তিনটি ঘটনারই দর্শক ছিলেন। তিনটি ঘটনাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক জীবনে গভীর রেখাপাত করে। স্বভাবতঃই আমরা আশা করবো সাহিত্যিক ও সাধক রামপ্রসাদের রচনায় তিনটিরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন। আমাদের আশা পুরোপুরি সফল হয় নি।

রামপ্রসাদের পদে বর্গীর হাঙ্গামার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই, অথচ রামপ্রসাদ তখন কুমারহট্টে অবস্থান করছিলেন। গঙ্গার পূর্বপারের কুমারহট্ট বর্গী-অত্যাচার মুক্ত ছিল বলেই কি রামপ্রসাদ এই জাতীয় দুর্ঘটনাটিকে এড়িয়ে গেছেন?

আসল কারণ মনে হয় তা নয়। এ সময়টি রামপ্রসাদের সাধক ও কবিজীবনের সূচনাযুগ। রীতিমত বাস্তবসচেতন কবিও এ সময়ে একান্ত চিন্তায় তন্ময় ছিলেন

বলে মনে হয়। সাংসারিক দায়দায়িত্বের চিন্তা তাঁকে এখনও বিপন্ন করে নি। ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য ঘটনাটি তাঁর রচনায় উল্লিখিত হল না কিন্তু এর পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই তাঁর রচনায় পড়েছে।

অন্য দুটি ঘটনার প্রভাবের পরিচয় তাঁর বৈষয়িকচেতনাসম্পন্ন পদগুলিতে কিভাবে পড়েছে, পূর্বে সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে এবং কিছুকাল পর পর্যন্ত বর্গীর হাঙ্গামার প্রভাবে বাংলাদেশের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে যে বিপর্যয় দেখা দেয় তা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের বহুলোক গঙ্গা ও পদ্মা পার হয়ে পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গে চিরকালের জন্য বাস করতে চলে যায়। ফলে ঐ দুটি স্থানের জনসংখ্যা রীতিমত বেড়ে ওঠে এবং জনজীবনেও পারস্পরিক প্রভাবে ভাঙ্গাগড়া শুরু হয়।

কলকাতায় কোম্পানীর আশ্রয়েও বহুলোক জমা হয়। ফলে কলকাতার জনসংখ্যা খুব স্ফীত হয় এবং স্বভাবতঃই এই বিদেশী বণিকগুলির ওপরেই বেশি নির্ভরতার ভাব দেখা দেয়। পলাশীর যুদ্ধের পর অত সহজে বিদেশী শক্তি বিনা বাধায় যে এতগুলি লোকের দেশ দখল করে নিতে পেরেছিল, তার সম্ভাবনা এই বর্গীরাই করে রেখে যায়।

দেশীয় সাহিত্যে এবং বিদেশীদের বর্ণনায় মুসলমান-শাসনে অস্বস্তির পরিচয় রয়েছে এই সময়কার জনজীবনে। ভারতচন্দ্র ও গঙ্গারাম বর্গীর হাঙ্গামার কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই অস্বস্তিরই পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বর্গীরা যা করেছিল, তারও বর্ণনা গঙ্গারামের লেখাতেই আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রীয় আদর্শ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে এই মহারাষ্ট্রীয় দস্যুরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। নারী-নির্যাতনের এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনার বিবরণ অন্যত্র দুর্লভ। ফলে জাতীয় নৈতিক মর্যাদায় প্রচণ্ড লগুড়াঘাত করেছে এই বর্গীর হাঙ্গামার ঘটনাটি। অষ্টাদশ শতাব্দীর নৈতিকতার মান সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে এই ঘটনাটির কথাও বিচার্য।

দেশের লোকের ব্যবসাবাণিজ্য, পৈতৃক রুজিরোজগারের সমস্ত ব্যবস্থা চরম সর্ব-নাশের সম্মুখীন হয়েছে। ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে লোকের হাতপা কেটে ভিটেছাড়া করে সব রকম অর্থনৈতিক পেশায় যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঘনিয়ে ওঠে তার পাশ কাটিয়ে উঠতে দেশবাসীর দীর্ঘসময় লেগেছে।

মানুষের নৈতিক চেতনায় এই অর্থনৈতিক চাপটি যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে-ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নদার মহিমা জেনেও তাঁর কাছে বর চাইলে—

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

এতে পাটনীর সারল্যের পরিচয় অবশ্যই আছে, এবং ভাতের চাহিদার পরিচয়ও এতে

সুস্পষ্ট, কিন্তু দেবীমহিমার মূল্য যে জনজীবনে কমেছে, তাও বোঝা যাচ্ছে। অন্নদামঙ্গলের প্রথমখণ্ডে হরিহোড়ের মায়ের চিত্রে দেখি—

'মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড় ॥'

কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য কুলমর্যাদা ধূলোয় লুটোচ্ছে, তাই তাকে বলতে শুনি—

এমন দুখিনী আমি আমারে কে ডাকে।
সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে ॥

রামপ্রসাদ আরও স্পষ্ট করে এই কথাই তাঁর পদে বলেছেন—

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী ॥
জ্ঞান-ধর্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান-ধর্ম তদুপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরা পারে, যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী ॥

বিষয়বুদ্ধিহীন সাধককে তাই অনেক কথা শুনতে হয়—

বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী ॥

কবিকে অনেক সময়েই সংসারের তাগিদে অর্থ চিন্তায় রত হতে হয়—

প্রভাতে দাও অর্থ চিন্তা, মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তা।
সায়াহ্নে দাও অলস চিন্তা, বল মা তোরে কখন ডাকি ॥

বলবানের শক্তির প্রভাব তখন কত প্রবল, তাই বুঝি—

অল্পে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আ'লে বারি ধায়,
যে জন হয় শক্ত, তার ত্রিকালমুক্ত জোর-জবরে।
চোখে আঙুল না দিলে পর,
দেখবি না মা বিচার করে ॥
ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে;
যে দুকথা শোনাতে পারে,
যে জনা হেতের ধরে;
তার হয়ে আশ্রিত সদা
থাকিস্ মা পরাণের ডরে ॥

রামপ্রসাদের পদে যে দৈন্য ও দারিদ্র্যের চিত্র আছে, তার কতক এই বর্গীর হাঙ্গামার ফল, কতক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়া। "অন্ন দে অন্ন দে অন্ন দে গো অন্নদা" পদের মধ্যে সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষেরই হাহাকার যেন শুনতে পাই।

কবি রামপ্রসাদ অত্যন্ত বাস্তবসচেতন ছিলেন। সাধকসত্তা সত্ত্বেও তাঁর চোখকান যে সবদিকে খোলা থাকতো, তাঁর রচনায় তার বিস্তর প্রমাণ রয়েছে। তাঁর পরিবেশই তাঁকে ব্যক্তিতে, কবিতে, সাধকে মিলিয়ে এরূপ অপূর্বভাবে সৃষ্টি করেছিল কিনা তা ভেবে দেখার মত।

॥ সমসাময়িক বিদ্যাচর্চা ॥

রামপ্রসাদের যুগের সমাজের দিকে তাকালে দেখি, তখন সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষার যুগ। জ্ঞানোন্নতির জন্য চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কৃতে।

কিন্তু রাজসরকারে চাকরির জন্য পারসী শিক্ষার প্রয়োজন খুব। ভারতচন্দ্র প্রথমে সংস্কৃত শেখার জন্য পরিজনদের কাছে তিরস্কৃত হন এবং পরে পারসী শিখে জাতে ওঠেন।

জমিদারী সেরেস্তায়, নবাবের দপ্তরে পারসীর প্রাধান্য এবং নবাব মুর্শিদকুলি হিন্দুর কাছে এই দপ্তরের দরজা যে অবারিত করে দিয়েছিলেন, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। নতুন ইজারাদারও তিনি হিন্দুদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করতেন। সুতরাং হিন্দু জমিদারদের সংখ্যা বাড়ায় তাদের সেরেস্তায় পারসী জানা লোকের প্রয়োজনও বেড়েছিল।

তাছাড়া ছিল বিদেশী বণিক। নবাব সরকারের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানের জন্য তাদেরও পারসী জানা লোকের খুব দরকার হচ্ছিল। মুন্সী নবকৃষ্ণের ভাগ্যও এই প্রয়োজন থেকেই কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা আমরা জানি। বিদ্যাশিক্ষার আর্থিক মূল্য তাই অনুভূত হচ্ছে।

রামপ্রসাদ লিখেছেন—

যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে জাননা কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥

আবার অন্যত্র লিখেছেন—

পড়েশুনে বিদ্যারত্ন, ভিক্ষারত্ন উপজীবী।

অর্থাৎ লেখাপড়া শিখে 'চাকরি' করার ইঙ্গিতটি এখানে সুস্পষ্ট।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরে' বর্ধমানের বর্ণনায় বিদ্যাশিক্ষার পীঠস্থানরূপে বর্ধমানেব যে চিত্র পাই তা অবশ্যই তৎকালীন নবদ্বীপের বা কৃষ্ণনগরের। চিত্রটি হ'ল—

পরম পবিত্র রাজ্য, পরস্পর পুণ্যকার্য
সুরাচার্য সদৃশ অনেক।

কল্পতরুতুল্য ভূপ, আধিপত্য নানারূপ,
দীন নাহি সে দেশে জনেক ॥
চৌদিকে চৌপাড়িময়, পাঠ চায় পড়ুয়াচয়,
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহুত বাড়ী, বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি,
আগমন বিদ্যা অভিলাষী ॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই, অতিথির সীমা নাই,
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।
বেদবক্তা আগমজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যৎ-প্রাজ্ঞ,
স্বধর্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত ॥

তখন জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা বিশেষ প্রবল ছিল 'ভূত-ভবিষ্যৎ-প্রাজ্ঞ' লোকের অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায়। কবি নিজেও বিদ্যার বারমাস্যার বর্ণনায় মাসের নামের বদলে রাশিনাম ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন পদেও কবির জ্যোতিষজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

'বিদ্যাসুন্দরে' সুন্দরের পুত্র পদ্মনাভের পাঠ্যতালিকার পরিচয় এইভাবে দেওয়া হয়েছে—

পঞ্চম বৎসরে কর্ণবেধ করে
বিদ্যারম্ভ শুভ দিনে।
সপ্তদিন মাত্র লেখে তালপত্র
পঞ্চাশৎবর্ণ চিনে ॥
বালক ত্বরায় ব্যাকরণ সায়
ভট্টি অভিধান গণ।
রঘুকুমারাদি সাঙ্গ হল যদি
অলঙ্কারে দিল মন ॥
কৃপান্বিতা চণ্ডী পাঠ করে দণ্ডী
তদনু কাব্যপ্রকাশে।
ন্যায়শাস্ত্রে ঘুণ কত কব গুণ
কবিচিত্তে মহোল্লাসে ॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল সাংখ্য পাতঞ্জল
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র।
কোন ক্ষোভ নাই, জননীর ঠাঁই
নিল একাক্ষরী মন্ত্র ॥

এই বর্ণনাটি তৎকালীন শিক্ষা পদ্ধতির একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে।

রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত একটি বিখ্যাত পদে "কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে" উক্তিটি পাওয়া যায়। তখন চৌতিশা-স্তোত্রের যুগ, কবি নিজেও চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীবন্দনা করেছেন মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসারে। অথচ কবি পঞ্চাশৎ বর্ণের অস্তিত্বের কথা স্পষ্ট করে বলায় তৎকালে প্রচলিত সংস্কৃত বর্ণমালার বর্ণ সংখ্যার পরিচয়টি পাওয়া গেল। কবির নিজের পড়াশুনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে বিদ্যার গন্ধর্ববিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনায়। পদ্মনাভের পাঠ্যতালিকার উল্লেখে স্বভাবতই তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুন্দরপুত্র "ন্যায়শাস্ত্রে ঘূর্ণ্য' হওয়ায় 'কবিচিত্তে'র উল্লাসের কারণটি সহজেই বোঝা যায়। তখনও বাংলাদেশে ন্যায়শাস্ত্র চর্চার ব্যাপক প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা ছিল। রামপ্রসাদ সমসাময়িককালে রচিত 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থে বাঙালীর ন্যায়চর্চার প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের কাশীতে শিবস্থাপন উপলক্ষ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের পণ্ডিত ন্যায়ালঙ্কার সমবেত কাশীর পণ্ডিতদের ন্যায়ের তর্কে পরাজিত করেন। কবি বিজয়রাম এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

বেদান্ত পুরাণের যদি হইত বিচার।
বাঙালি করিবে বিচার কিবা শক্তি তার ॥*

॥ বিদ্যাসুন্দরে বাস্তব চিত্র ॥

বিদ্যাসুন্দরের দুটি সুন্দর বাস্তবচিত্রের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এবার তার একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, রামপ্রসাদের সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বিশেষ সুখের ছিল না। সুন্দর-অন্বেষণে কোটাল তার সহচরদের নানাবিধ ছদ্মবেশে নানা-স্থানে নিযুক্ত করে। এদের বর্ণনায় কবি তৎকালীন মানুষের সাধুদুর্বলতা এবং সাধুদের কপট আচরণের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথমেই যাদের কথা বলেছেন তারা ব্রজবাসি-বেশে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী। কবির যে বিন্দুমাত্র বৈষ্ণববিদ্বেষ ছিল না তা মেনে নিয়েই এ বর্ণনা পড়তে হবে। কবি লিখেছেন—

দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ।
কত সব চুল কত মুড়াইল কেশ ॥
কটিতে কৌপীনমাত্র তাহাতে গিরস।
সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস ॥

*নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "তীর্থমঙ্গল" (বিজয়রাম সেন)—পৃঃ ১৪৪

গৌড়রাজ্যে গোড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে বাটে ॥
খাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকণ-গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে ॥
মুঞ্জ গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া-ভাব ॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে থান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী ॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উটে ছুঠে পায় পড়ে করে দণ্ডবত ॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ॥
গোষ্ঠীশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পাত্র শেষ চাটে ॥
বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায় ॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী ॥

বর্ণনাটি রামপ্রসাদের যে মনোভাবই প্রকাশ করুক না কেন, সমাজতাত্ত্বিকের কাছে এটি বিশেষ মূল্যবান। এর পর লিখেছেন—

শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী।
অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি ॥
পাঁচ হাতিয়ার বাঁধা বিষম দুরন্ত।
জনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত ॥
দেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাড়ু।
ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু ॥

মার পিটে ধুমধাম করয়ে লহর।
ভয় নাই লুট্যা খায় রাজার সহর॥
কেহবা বিষম বাঁকা জালালি ফকির।
কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির॥
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা।
কান্ধে ঝুলি গলে কত তর তর মালা॥
যার বাটী যায় তার নাকে আনে দম।
কত ফেকেতে চুরচুর নদারদ গম॥
কত অবধোত কত যতি ব্রহ্মচারী।
হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী॥

এ ছাড়া কাঙ্গালী আর মেয়ে হরকরার চিত্রও আছে।

ধর্মনির্ভর সমাজের একাংশের জীবন্ত চিত্র যে রামপ্রসাদ তুলে ধরেছেন তা নিশ্চিত।

এরপর সুড়ঙ্গ খননের চিত্র। প্রজাসাধারণের অসহায়তার একটি ইঙ্গিত প্রথমেই মেলে—

খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম।
সহরে পড়িল বড় বেগারের ধূম॥
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়।
পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়॥
তখনি হাজার তিন আনিল কোদালী।
মজুরের নিখাবানা পাঁচ শত ঢালী॥
খোষ তত্ত্ব কোতোয়াল ঘন ঘন ডঙ্কা।
নগর নিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা॥

এমনি সন্ত্রাসের রাজত্বই দেশে এক সময় ছিল। কিন্তু এর পরই চিরন্তন গুজবপ্রিয় বাঙ্গালীর চিত্র।

কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা।
কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছা॥
সহরে গুজব ওঠে একে একশত।
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় বস্যে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
এক সরা ভরা টিকা হুঁকা চলে দুটা।
পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু ঢেঁকী-কুটা॥
কেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচার॥

হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে।
চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে॥
পরম রূপসী তারা স্বর্গ বিদ্যাধরী।
বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী॥
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে।
সেই ক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাতে॥

এই কৌতুকচিত্রের পাশেই সাধারণের দুর্দশার চিত্র। সুড়ঙ্গের গতিপথে ওপরের মাটি খোড়া হচ্ছে। ফলে—

এথায় খন্দক খনে মজুর সকল।
বড় বড় গৃহস্থের বাড়ী গেল তল॥
সীমা মুড়া পর্যন্ত কাটিল খাই যদি।
দেখিয়া ডরায় লোক যেন এক নদী॥
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা।
শুনি নাহি জন্মে কভু হেন কহে তারা॥
* * *
কেহ কহে সে যে হোক এ বড় লহর।
খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর॥

রামপ্রসাদ তাঁর কবিকর্ম সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। একটি পদে লিখেছেন—

লোকে বলে রামপ্রসাদ পাগল,
ভাষা কবি আমি করি।
আমার এ যে ভাষা কি তামাসা,
বলে না বুঝাতে পারি॥

'বিদ্যাসুন্দরে' এ বিষয়ে অধিকতর সচেতনতার পরিচয় পাই। "সুন্দরের বন্ধন মোচন সংবাদে বিদ্যার উল্লাস" পরিচ্ছেদে লিখেছেন—

রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশতি সুধা॥
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে।
গবাগণ গুপ্তে গো ভঙ্গিমা করে হাসে॥
অরসিক নিকটে রসস্থ নিবেদন।
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম হয় যে মরণ॥
গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে।
মা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে॥

তবে কি কবি তাঁর কবিজীবনের প্রথমে দুর্মুখ সমালোচকের বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন? কবির ইঙ্গিতটি তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যত্র লিখেছেন—

পরম সংস্কৃত বিদ্যা গুরুরতিগম্যা।
বীর্যবন্ত সাধকজনার মনোরম্যা ॥
সল্লোকপথগামী সেই পথে পথ।
কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত ॥

ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে সম্বোধন করে প্রথম কবিতা কে লিখেছিলেন জানি না, তবে রামপ্রসাদের পদে ভারতবর্ষকে জন্মভূমিরূপে উল্লেখের পরিচয় আছে। কবির "মাগো আমার কপাল দোষী" পদের শেষ তিনটি লাইন হ'ল—

জনমি ভারতভূমে মা, কি কর্ম করিলাম আমি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ভাব্‌তে নারি দিবানিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে, দুর্গা নামে দিব ফাঁসি ॥

॥ সামাজিক সমস্যা ॥

কবি রামপ্রসাদের যুগে হিন্দুর সামাজিক জীবনে তিনটি সমস্যা গুরুতররূপে বিদ্যমান ছিল বলে মনে হয়। সমস্যা তিনটি হল—নারীগণের বৈধব্য ও বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহপ্রথা।

Alivardi and His Times (Dr. K. K. Dutta) গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় প্রথম সমস্যাটির ইঙ্গিত আছে। রানী ভবানী তাঁর বিধবা কন্যা তারার একাদশীব্রত পালনের কঠোরতায় কাতর হয়ে এই কঠোরতা হ্রাস করার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে আবেদন জানান। কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নি।

ঢাকার বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ তাঁর বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন (১৭৫৬)। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের এই বোধহয় প্রথম উদ্যোগ। অনেক পণ্ডিত তাঁকে সমর্থনও করেন। কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সভাস্থ পণ্ডিতদের প্রভাবিত করে রাজার ইচ্ছায় বাদ সাধলেন।

ভোলানাথ চন্দ্রের "Travels of a Hindu" গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায় ১৭৬০খৃঃতে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত এক সামাজিক বিচার সভার উল্লেখ আছে। এই বিচার সভায় ক্লাইভ ও ভেরেলস্ট উপস্থিত ছিলেন। নিষিদ্ধ মাংসের ঝোল খেয়ে এক ব্রাহ্মণের জাত যায়। সে জাতে ওঠার আবেদন জানায়। যদিও রঘুনন্দনের 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে' বলপূর্বক

জাতিক্ষয় হলে তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তার পুনরুদ্ধারে সম্মত হলেন না। ভগ্ন হৃদয়ে লোকটি মারা গেল।

W. Ward এর "The Hindoos" গ্রন্থের (শ্রীরামপুর সংস্করণ) ১ম খণ্ডের ২৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ আছে। Ward বলেছেন, এ ঘটনাটি "believed by a great number of the most respected natives of Bengal".

ঘটনাটি হল, এক ব্রহ্মচারী সিদ্ধিলাভের জন্য স্বপ্নে নরবলির প্রত্যাদেশ পায় সে এই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্য চায় এবং পুণ্যের ভাগ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কৃষ্ণচন্দ্র একটি বড় মাঠের মধ্যে বাড়ি নির্মাণ করে ব্রহ্মচারীটিকে রাখেন এবং কর্মচারীদের দিয়ে উপযুক্ত লক্ষণসম্পন্ন মানুষ সংগ্রহ করে বলির ব্যবস্থা করে দেন। ২।৩ বছর ধরে এই অবস্থা চলে এবং প্রায় হাজারখানেক লোক বলি হয়ে যায়। শেষে রাজার চেতনা হয় ও বলি বন্ধ হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চার সমাজের (নদীয়া, শান্তিপুর, কুমারহট্ট, ভাটপাড়া) পতি ছিলেন। তাঁর ধর্মীয় গোড়ামী এবং সামাজিক বিচারের ব্যাপারে নৃশংসতা ও নানাবিধ সঙ্কীর্ণতার আরও নানা পরিচয় পাওয়া যায়। সাধক কবি রামপ্রসাদ এরূপ এক ব্যক্তির অনুরাগী ছিলেন ভাবাই যায় না। কৃষ্ণচন্দ্রের মত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে কবি কখনও বলতেন না—"গবাগণ গুপ্তে গো ভঙ্গিমা করে হাসে।"

বিদ্যাসুন্দরেই একস্থলে কবি লিখেছেন—

"ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম খোয়ায় খোসামোদে ॥"

এরূপ মনোভাবের অধিকারী কবি কখনও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত কবি হতে পারেন না।

রামপ্রসাদ কোথাও স্পষ্ট করে বৈধব্য সমস্যার কথা বলেন নি। তবে বিধবার ক্লেশের ভয়াবহতার উল্লেখ দু-এক জায়গায় আছে।

সতীদাহপ্রথা দীর্ঘকালের এবং সমাজে এক সময় প্রবলরূপেই বর্তমান ছিল। J. N. Dasgupta র "Bengal in the 16th Century" গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় বিদেশী পর্যটক Ralph Fitch এর ষোড়শ শতাব্দীর যে ভ্রমণ-বর্ণনা আছে, তাতে দেখি Fitch বলছেন, "The wives here do burn with their husband when they die, if they will not, their heads be shaven, and never any account is made of them afterward."

সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীর এই সতীদাহপ্রথা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। আকবর-রাজত্বের ২৮তম বছরের "আকবর নামা"য় এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট

নির্দেশ আছে। "...inspector had been appointed in every city and district, who were to watch carefully over these two cases : to discriminate between them, and to prevent any women being forcibly burnt. (J. N. Dasgupta, পৃ: ৪৪)

W. Wardএর "The Hindoos" গ্রন্থে সতীদাহ প্রথার ভয়াবহ সব দৃষ্টান্ত আছে এবং এ সব বেশির ভাগ অষ্টাদশ শতাব্দীর। তবু মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই প্রথার খুব প্রকোপ ছিল না। রামপ্রসাদ-সমসাময়িক সময়ের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত গ্রন্থ Alivardi and His times গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় দেখি—Sati was forbidden under certain circumstances. The burning of a pregnant woman was not allowed by the Sastras ; and when the husband died at a distance from his wife, she could not burn herself, unless she could procure her husband's girdle and turban to be placed on the funeral pyre. (Craufurd) Serafton remarks that "the practice (of Sati) was far from common, and was only complied with by those of illustrious families." Stavorinus also notes that it was prevalent among "some castes."

Thus, it would be wrong to suppose that in all cases women sacrified themselves under the pressure of social conventions and the expostulation of the priests and their relatives.

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরে' একবার মাত্র সতীদাহের উল্লেখ আছে বিদ্যার মুখে। বাঁ পায়ে খন্দক পার হতে অনুরোধ জানিয়ে বিদ্যা সুন্দরকে বলছে—

"নহে শাস্ত্র-সম্মত সসত্বা সহমৃতা।
দুরাত্মা দুর্বোধ বিবেচনা শূন্য পিতা॥
অপমৃত্যু হবে তায় যে করুন কালী।
তুমি তো পণ্ডিত প্রভু এ কি ঠাকুরালী॥"

গর্ভবতী নারীর সহমরণ নিষিদ্ধ জানা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সুন্দরের প্রাণদণ্ড হলে বিদ্যাও অবশ্যই প্রাণত্যাগ করবে। ফলে অপমৃত্যু বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য ঘটবে। রাজবাড়িতে সহমরণ চালু ছিল তাও বোঝা যায়। কিন্তু কবি আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন নি। তাঁর হীরামালিনী, বিদু ব্রাহ্মণী নির্বিবাদে ঘুরে বেড়ায়।

॥ আগমনী ও বিজয়া ॥

সামাজিক বাল্যবিবাহের ব্যাপারটি মনে হয় কবির প্রাণে খুব লেগেছিল। 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র পদগুলি এই ব্যথা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। স্বতন্ত্রভাবে রামপ্রসাদের

'আগমনী ও বিজয়া'র পদ সংখ্যায় খুব কম। পদগুলি 'কালীকীর্তনে'র অংশরূপে সৃষ্ট কিনা বলা যায় না। 'কালীকীর্তনে'র 'গৌরচন্দ্রী' পদ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরে প্রকাশ করেন। 'আগমনী ও বিজয়া'র পদকেও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করেছেন তবে 'কালীকীর্তনে'র সঙ্গে সম্পর্কের কোন ইঙ্গিত করেন নি। অথচ অনুরূপ ভাব কি 'কালীকীর্তনে' প্রকাশিত হয় নি? এখানে রাণীর কণ্ঠে কবি বলেছেন—

রাণী বলে ওগো জয়া কুস্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে।
গত ঘোরতর নিশি রাহু যেন ভূমে খসি,
গিলিতে ধায়্যাছে মুখচাঁদে॥
শুনেছি পুরাণে বহু, মুখখানা বটে রাহু,
শরীরের সংজ্ঞা বটে কেতু।
এ রাহুর জটা মাথে দারুণ ত্রিশূল হাতে,
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু॥

"কালীকীর্তন" গ্রন্থটি সম্পূর্ণ আকারে মেলে নি। ঈশ্বর গুপ্তের "গৌরচন্দ্রী" পদের পরবর্তী আবিষ্কারই তাব প্রমাণ। আমরা পূর্বে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভগবতীর রূপ বর্ণনার কথা এইভাবে বলেছেন, "কবিরঞ্জন কালীকীর্তনের বাসলীলার স্থলে ভগবতীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।" (সংবাদ প্রভাকর, পৌষ, ১২৬০—বামপ্রসাদ)

"বাসলীলার স্থলে ভগবতীর রূপ" গুপ্তকবি কিভাবে জানলেন? কোথায় উল্লেখ পেলেন রাসলীলা বর্ণনার ইচ্ছা ছিল রামপ্রসাদের? যেহেতু রাধাকৃষ্ণ লীলায় রাসলীলা থাকে, অতএব এতেও থাকবে ধরে নিয়েই কি ঈশ্বরগুপ্ত 'রাসলীলা' কথাটি অনুমান করে নিয়েছেন? না কি তিনি 'কালীকীর্তনে'র 'রাসলীলা'র প্রসঙ্গ কোথাও শুনেছিলেন? প্রশ্নগুলির উত্তর হয়তো কোন কালেই মিলবে না, কিন্তু আর একটি প্রশ্ন আপনা থেকেই এসে যায়, 'কালীকীর্তন' কি শ্রীকৃষ্ণের 'বাল্যলীলা' বা 'রাধাকৃষ্ণ' লীলার অনুসরণে লেখা?

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বা রাধাকৃষ্ণলীলার অনুসরণে যে 'কালীকীর্তন' লিখিত হয় নি, 'কালীকীর্তন' গ্রন্থখানি একবার পড়লেই তা বোঝা যায়। কৃষ্ণলীলার অনুসরণ কবির লক্ষ্য নয়, কালীমহিমার নবরূপায়ণ তাঁর লক্ষ্য। তাই এখানে নায়ক-নায়িকার লীলা বর্ণিত হয়নি। এখানে গোচারণে দেবীর অপার্থিব মহিমাই প্রকাশিত, পশ্চাদপটে যশোদার বাৎসল্যনির্ঝর নাই। এখানে বাঁশীতে দেবীর কেউ মনোহরণ করেন নি, এখানে দেবীই তপস্যায় শিবকে আকর্ষণ করেছেন। এখানে কবির কৌতুহল মিশ্রিত প্রশ্ন—

একবার ভুলাইয়াছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখ ধেনু॥

আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা।
এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্যা ॥

"কালীকীর্তন" বস্তুতঃ রামপ্রসাদের সমন্বয়বাদপ্রচারেরই আর একটি প্রচেষ্টা। পদাবলীতে যা বলেছেন, এখানেও তাই রয়েছে।

রামপ্রসাদের 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' পদগুলির বাৎসল্য বৈষ্ণবপদাবলীর বাৎসল্য থেকে স্বতন্ত্র।

বৈষ্ণবপদাবলীর বাৎসল্য মাতৃস্নেহদুর্বলতার একটি সুকোমল প্রকাশ এবং সম্পূর্ণভাবে ভাবাশ্রিত। আগমনী-বিজয়ার বাৎসল্যে একটি কঠোর বাস্তবের ছবি বিদ্যমান এবং সম্পূর্ণরূপে করুণাবিগলিত। কবির সঙ্গে তাঁর আরাধ্যা পরমেশ্বরীর সম্পর্কটিও এই মাতাপুত্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত। আগমনী-বিজয়ায় জগজ্জননীকে সন্তানের ভূমিকা দিয়ে তারপর কবি নিজে সেই ভূমিকাটি কেড়ে নিয়েছেন।

বাঙালীর সংসারে গৌরীদান প্রথার জন্য ছোট কন্যাসন্তানটির বিবাহ দিয়ে চিরকালের জন্যই প্রায় সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হত। তখন যোগাযোগের দুর্যোগের জন্য পুনরায় দেখা-সাক্ষাতের আর সম্ভাবনাই থাকতো না। এব উপর ছিল কন্যার সপত্নীযন্ত্রণা এবং নিষ্কর্মা স্বামীর জন্য দারিদ্র্য। একান্নবর্তিপরিবারপ্রথাও সংসারে মেয়ের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করতো। কন্যার অবস্থাবিপাকের কথা ভেবে এবং তার সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগের অভাবের জন্যই মাতৃহৃদয়ের যে ব্যাকুলতা, 'আগমনী-বিজয়া'য় তারই অভিব্যক্তি। ক্বচিৎ স্বল্পকালীন সাক্ষাৎসৌভাগ্য এবং অচিরেই তা মিলিয়ে যাবার আশঙ্কা পদগুলিকে কারুণ্যে মণ্ডিত করেছে।

পারিবারিক সীমার এই সঙ্কট ক্রমে ক্রমে জগৎব্যাপী নানা সঙ্কটের মুখোমুখি করে দিয়েছে কবিকে। কবি তখন নিজেই সন্তানের স্থান দখল করে মায়ের কাছে তাঁর অভিযোগ পেশ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। এই অভিযোগের চিত্রই তাঁর অধিকাংশ পদে। আগমনী-বিজয়ার পদ কবির এই বৃহত্তর উদ্যোগের প্রথম সোপান। যেমন কবির সমস্ত পদে তেমনি এই প্রারম্ভিক আগমনী-বিজয়ায় একটি বাস্তবমনস্কচিত্তের পরিচয় পাই, যা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে অভিনব এবং পরবর্তী সাহিত্যের প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন।

'আগমনী-বিজয়া'র পদ বা 'বাল্যলীলা'র পদ রামপ্রসাদের খুবই কম, কিন্তু পরবর্তী কবিরা বিশেষ করে সাধক কবি কমলাকান্ত এর খুব বেশি অনুশীলন করেছেন। বাঙালীহিন্দুর মনের একটি চিরন্তন ব্যথার স্থান সহজেই এতে স্পৃষ্ট হয় বলে এই শ্রেণীর পদ নানাভাবে বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে এক সময় বাংলাসাহিত্যাকাশ ছেয়ে ফেলেছিল।

।। প্রসাদী পদের প্রভাব ।।

রামপ্রসাদী পদের অনুকরণে যে সাহিত্যধারা প্রবর্তিত হল তার সংখ্যাপ্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত হতে হয়।

মনে হতে পারে বৈষ্ণবপদও তো অনেককাল ধরে অনেক কবির দ্বারা অনেক বিচিত্র আকারে রচিত হয়েছে।

তা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি ধর্মের আদর্শ ও অনুশাসন ছিল। বৈষ্ণবপদ বৈষ্ণবধর্মানুষ্ঠানেরই অঙ্গ। কিন্তু শাক্তপদের সঙ্গে শাক্তধর্মানুষ্ঠানের সম্বন্ধ কই? এ শুধু এক সাধকের আনন্দবোধের অভিব্যক্তি। এখানে পদরচনায় কোন শাস্ত্রের বা ধর্মের নির্দেশ নাই। রামপ্রসাদের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা এতে প্রমাণিত হয়।

প্রসাদীসুরে পদ কে রচনা করে নি? রাজা, জমিদার, দেওয়ান, সাধু, সাধারণ মানুষ, ভিক্ষুক সকলেই এক সময় এই পদকে আশ্রয় করেছে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পুত্রদ্বয় শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্রের নামে পদ আছে, বর্ধমানের রাজা মহাতাব্‌ চন্দ পদ লিখেছেন, মহারাজ নন্দকুমার, দেওয়ান রঘুনাথ ও রামদুলাল এবং অনেক পরবর্তী কালে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও লিখেছেন।

বহু সাধক এই সুরের তরণীতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তাঁদের সাধকজীবনকে ধন্য করেছেন। সাধক কমলাকান্তের নামই এই অনুসরণকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। গুণের বিচারেও রামপ্রসাদের পরই তাঁর স্থান। তাঁর রচনায় মৌলিকতার যথেষ্ট প্রমাণ থাকলেও দু-একটি পদে এই অনুসরণ-প্রচেষ্টা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যেমন সাধক কমলাকান্তের পদ—

তাই কালোরূপ ভালবাসি।
কালী জগমন্মোহিনী এলোকেশী ॥
মাকে, সবাই বলে কাল কাল, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।

* * * *

কমল বলে কাশী যেতে কভু নাহি ভালবাসি,
শ্যামা মায়ের যুগল পদে গয়াগঙ্গা বারাণসী ॥

কিংবা—

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনমোহিনী।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেওমা করতালি,

* * *

অশান্ত কমলাকান্ত দিয়া বলে গালাগলি।
এবার সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দুটাই খালি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই লিখেছেন, "পূর্বে রামপ্রসাদি পদ সম্বল করত ব্যবসায় দ্বারা কত লোক কত সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং এইক্ষণেও কত মনুষ্য এই উপলক্ষে ভিক্ষা করিয়া সমূহ সুখে দিনপাত করিতেছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর" (রামপ্রসাদ-প্রবন্ধ)

এই প্রসঙ্গে অবান্তর হলেও একটি রামপ্রসাদী পদের উল্লেখ না করে পারছি না। পদটি হল—

নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে,
হাট ক'রে বসেছি ঘাটে,
ওমা, শ্রীসূর্য বসিল পাটে নায়ে লও গো॥
দেশের ভরা ভরে নায়, দুঃখীজনে ফেলে যায়,
ও মা তার ঠাঁই যে চায়, সে কোথায় পাবে গো॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে,
আসন দে না ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে
ভবার্ণবে গো॥

রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কবিতাটি একবার স্মরণ করে দেখন, দুটি কবিতার কি আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্য ।

রামপ্রসাদের সুরের আকর্ষণ, ভাবের আন্তরিকতা তাঁর সাধকধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সময়ে যে বাঙলার জনচিত্তকে জয় করে নিয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কবির রচনাই তখন কবির জীবনীতে পরিণত হয়ে গেছে, তাই বাস্তব মানুষটির জীবন আজও ঘন রহস্যান্ধকারে আবৃত।

রামপ্রসাদের একটি পদে অতি সাধারণ অথচ অতি প্রয়োজনীয় এক শ্রেণীর মানুষের চিত্র বোধহয় সর্বপ্রথম সাহিত্যআসরে রূপলাভ করলো। পদটি হ'ল—

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে॥
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে।
পরের জামিন হলে পরে, সে না দিলে আপনি ভরে॥
যখন দিনে নিড়াই করে, শিকারী সব রয় না ঘরে।
জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে॥
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে।
যদি সে নিড়াতে পারে, অঝোরে কাঞ্চন ঝরে॥

দরিদ্র কষ্টসহিষ্ণু কৃষকের চিত্রটি লক্ষণীয়। মনে হয় কবির কৃষিকার্যের সঙ্গে যোগ ভালই ছিল। চাষ-বাসের প্রতীক নানাভাবেই এসেছে। যেমন—

ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালী চাপা সিকত নদী, তাতেও মহাল আছে তাজা ॥

অথবা—

দেহ জমীর জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি।
মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হলে, আনন্দ সাগরে ভাসি ॥

'বিদ্যাসুন্দরে'র কবি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরাম দাস

বিদ্যাসুন্দর প্রণয়প্রধান কাহিনীকাব্য। এর একটি রূপ গোপন প্রণয়, মনে হয় প্রাচীন প্রণয়কাহিনীর এইটিই অবশেষ। অন্যরূপে কালীর অনুগ্রহপুষ্ট প্রণয়ী যুগলের প্রথমে গোপন প্রণয় ও মিলন এবং অখ্যাতি, পরে দৈবী সহায়তায় গৌরব-পূর্ণ স্বীকৃতিতে ধন্য।

দেবীর মহিমা-আরোপটি ঘটেছে প্রাণরাম চক্রবর্তী থেকে। মঙ্গলকাব্যের খাঁটি রূপ ধারণ করেছে কৃষ্ণরাম দাসের হাতে। রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামকেই অনুসরণ করেছেন।

দ্বিজ শ্রীধরের কাব্যে সুন্দরের পিতার নাম গুণসার, মাতা কলাবতী, রাজ্যের নাম বিজয়ানগরী রত্নাবতী। বিদ্যার পিতা বীরসিংহ, মাতা সুশীলা, রাজ্যের নাম কাঞ্চী। কাব্যের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দী।

সপ্তদশের প্রথমার্ধে রচিত সাবিরিদ খাঁনের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরের জন্মস্থান রত্নাবতী নগরী, পিতার নাম গুণসার, মাতা কলাবতী। বিদ্যার জন্মস্থানের নাম উজানী নগর কাঞ্চীপুর, পিতার নাম বীরসিংহ। (সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা-৪৪ এবং ভারতবর্ষ ১৩২৫ এর আষাঢ় সংখ্যায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণরামের গ্রন্থে সুন্দরের বাড়ি কাঞ্চন নগর বা কাঞ্চি, সুন্দরের পিতা গুণসিন্ধু রাজা। বিদ্যার পিতা বীরসিংহ, মাতা কাঞ্চপী, দেশ বীরসিংহপুর বা গৌড়। রামপ্রসাদে মাত্র দুবার প্রথম দিকে বর্ধমানের উল্লেখ আছে। এখানে বিদ্যার পিতা বীরসিংহ (আবার বিদ্যার পিতা 'বৃষকেতু' বলেও একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে), সুন্দরের পিতা গুণসিন্ধু, রাজ্য কাঞ্চীদেশ। উভয় গ্রন্থেই ভাটের নাম মাধব, কোটালের নাম বাঘাই। বিদ্যাসুন্দরের পুত্র উভয় গ্রন্থেই পদ্মনাভ।

কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে এবং মাধব ভাটের মুখে বিবরণ শুনে সুন্দর বিদ্যার অন্বেষণে পিতামাতার অগোচরে বীরসিংহপুর বা বর্ধমান বা গৌড়দেশ যাত্রা করে। পথে দেবী ছলনা করলেন তার ভক্তির জোর পরীক্ষার জন্য। তারপর বীরসিংহপুরে

উপস্থিতি ও নগর বর্ণনা। এ পর্যন্ত কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদে কাহিনী একরূপ। ভারতচন্দ্রে স্বপ্নাদেশ নাই, দেবীর ছলনাও অনুপস্থিত।

কৃষ্ণরামে মালিনী বিমলা, রামপ্রসাদে হীরা ভারতচন্দ্রের অনুসরণে।

মালিনীর কাছে সুন্দর বিদ্যার রূপযৌবনের পরিচয় পেলে, মালিনীর ঘরে আশ্রয়ও মিললো। প্রভাতে মালিনীর মালঞ্চ অসময়ে অভাবিতভাবে ফুলে ফুলে ভরে উঠলো। এ বিস্ময়কর ঘটনাটি ভারতচন্দ্রে নাই। তবে মালিনীর সঙ্গে সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটলো ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদে বকুলতলায় কিন্তু কৃষ্ণরামে কদম্বমূলে।

মালিনী গেল বেসাতিতে আর সুন্দর মালা গড়লো বিদ্যার জন্য। ভারতচন্দ্রের সুন্দর "চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কুম্ভাপাতে। নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে॥" কৃষ্ণরামের সুন্দর কেতকী ফুলে নিজের সমাচার লিখলে, আর রামপ্রসাদের সুন্দর 'প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজে।' কেউই শ্লোক লিখলে না।

ভারতচন্দ্রে মালিনীর মধ্যস্থতায় বালাখানার সামনে রাখা রথের পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দর বিদ্যাকে দেখলে, বিদ্যাও সুন্দরকে। রামপ্রসাদে দর্শন ঘটলো স্নানের ঘাট থেকে। কৃষ্ণরামে পূর্বদর্শন নাই।

এরপর সুড়ঙ্গপর্ব। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদে দেবীর অনুগ্রহে হঠাৎ সুন্দর ও বিদ্যার ঘরের সংযোগ-সুড়ঙ্গ তৈরী হয়ে গেল। কৃষ্ণরামে দেবী সুন্দরকে বললেন—

হইল আকাশবাণী সদয় অভয়া।
সুখে গিয়া কর বিয়া রাজার তনয়া॥
বিদ্যার মন্দির আর বিমলার ঘর।
হইল সুড়ঙ্গ-পথ অতি মনোহর॥
চন্দ্রকান্ত মণি কত জলে ঠাঞি ঠাঞি।
রজনী দিবস তুল্য অন্ধকার নাই॥

রামপ্রসাদে দেখি—

ভয় নাহি বচ্ছ ইহা কোন তুচ্ছ
সুখে কর পরিণয়॥
অপরূপ কথা অকস্মাৎ তথা
হইল সুড়ঙ্গ পথ।

রামপ্রসাদের সুড়ঙ্গ "আলো করে আন্ধারে আপন অঙ্গচ্ছবি।" অর্থাৎ সুন্দরের সৌন্দর্য ও বেশভূষাতেই পথ আলোকিত হয়ে উঠলো।

ভারতচন্দ্রে একেবারে অভিনব ঘটনা। সেখানে—

স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥

তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হইতে সিঁদকাঠি দিলা ফেলাইয়া॥
পূজা করি সিঁদকাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়।
অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁদকাঠি বিঁধ কর কালিকা কহিল॥
*   *   *   *
সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।
হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজ্ঞায়॥

W. Wardএর The Hindoos গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (শ্রীরামপুর প্রকাশিত) ১২০ পৃষ্ঠায় "সিঁদকাঠি" মন্ত্রের পরিচয় আছে। মন্ত্রটি "চৌরপঞ্চাশিকার" শ্লোক। ভারতচন্দ্রের মন্ত্র হুবহু তারই অনুরূপ। চোরেদের আরাধ্যা দেবী কালী যেভাবে মন্ত্রপূত সিঁদকাঠি দেন, এখানে তারই অনুরূপ বিবরণ রয়েছে। কালী যেন চৌর্যকর্মে সুন্দরকে সাহায্য করলেন। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদে ভক্তকে দেবী অনুগ্রহ করেন।

এরপর বিদ্যাসুন্দরের মিলন পর্ব এবং এ পর্বে ভারতচন্দ্রের চাতুর্য, অভিনবত্ব ও কলা-কৌশল অত্যন্ত নিপুণভাবে বিলম্বিত লয়ে প্রকাশিত। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদে বর্ণনা একরূপ—সংক্ষিপ্ত ও গতানুগতিক।

বিদ্যার গর্ভ সঞ্চার হল এবং রাণী ও রাজার কাছে সে বার্তা পৌঁছে গেল।

তারপরই সুন্দর অন্বেষণ পর্ব। এ পর্বেও কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ পরস্পর ঘনসন্নিকটবর্তী, ভারতচন্দ্র দূরবর্তী ও অভিনব।

ভারতচন্দ্রের কোটাল ধূমকেতু রাজার মুখে বিদ্যার ঘরে চুরির কথা শুনলে, সাতদিন সময় চাইলে; তারপর কাজে লেগে গেল। কি চুরি গেছে জানার দরকারই হল না। সে অনুমানেই বুঝে ফেলেছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে সবাই বুদ্ধিমান, কোটালও। আগেই বিদ্যার ঘর তল্লাস করলে। বিছানার তলায় সুড়ঙ্গপথ দেখলে। সঙ্গে সঙ্গে এই পথে চোরের আগমন ঠিক করে নিয়ে দলবলসমেত নারীবেশে চোরের অপেক্ষায় রইল এবং মহাভারতের কীচকের মত সুন্দর ধৃত হল।

ভারতচন্দ্রে চোরধরা পর্বটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু কৌতুকরস যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরামে প্রথমে কোটালপত্নী চুরিটি কি জেনে এল। তারপর কৃষ্ণরামে কলাবতী ব্রাহ্মণী ও রামপ্রসাদে বিদুব্রাহ্মণী পুরুষটি কে জানার জন্য প্রেরিত হল। দীর্ঘ অনুসন্ধান পর্ব চললো। নগরবাসী সকলে অস্থির হয়ে পড়লো।

এই অনুসন্ধানের বর্ণনা কৃষ্ণরামে খুবই সংক্ষিপ্ত, রামপ্রসাদে অতি দীর্ঘ, বাস্তব এবং বিচিত্র রূপ পেয়েছে। উভয়েই বিদ্যার বিছানায় সিঁদুর মাখিয়েছেন, ধোবার বাটীতে

বস্ত্র পেয়েছেন, মালিনীর ঘরে সুড়ঙ্গ দেখেছেন এবং তারপর সুড়ঙ্গের ওপরের মাটি কাটতে কাটতে বিদ্যার গৃহে হাজির হয়েছেন। রামপ্রসাদের বর্ণনা দেখেছি। কৃষ্ণরামে আছে—

বড় গাছ কাটি ভাঙ্গে কত শত ঘর।
নদী যেন খন্দক হইল পরিসর॥
দেখিতে হইল লোক হাজার হাজার।
গণনা না জায় যত ভাঙ্গিল বাজার॥
পড়িতে পড়িতে বেগে ধায় রড়ারড়ি।
যুবা আছুক কাজ লড়ি ভরে বুড়ি॥

রামপ্রসাদ এই বর্ণনার ইঙ্গিতটুকুই বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করেছেন।

সুন্দর পালিয়ে গেছে বিদ্যার ঘরে। বিদ্যার অনুরোধে নারী সেজেছে। তারপর নালা কেটে কোটাল বাঁ পায়ে মেয়েদের পার হতে বলেছে।

কৃষ্ণরামে বিদ্যার সখি সুলোচনা, শকুন্তলা, শশিকলা, কমলা, বিমলা, কলাবতী, রেবতী, রোহিণী, উমা, প্রভাবতী, মনোরমা, পার্বতী, মালতী, রতি, সতী, উর্ব্বশী, ভবানী, পদ্মিনী, প্রিয়ম্বদা, শশিমুখী প্রভৃতিরা বাঁ পায়ে পার হয়েছে।

রামপ্রসাদে বিদ্যার সখিরা হল—

শশিমুখী শকুন্তলা সত্যবতী শশিকলা
সর্ব্বানী সুশীলা সত্যভামা।
রাধিকা রুক্মিণী রমা রাজেশ্বরী রম্ভা উমা
অপর্ণা অম্বিকা উষা শ্যামা॥
জয়ন্তী যশোদা জয়া মহেশ্বরী মহামায়া
হৈমবতী হীরা হরিপ্রিয়া।

কৃষ্ণরামে বাঁ পায়ে খন্দক পার হওয়ার জন্য বিদ্যা অনুরোধ করেছে সুন্দরকে। বিদ্যা বলেছে—

আমার মরণ সত্য তোমার বিহনে।
নারীবধ মহাপাপ তাহা নাহি মনে॥

রামপ্রসাদের বিদ্যা বলেছে—

ধরা গেলে কাটা যাবে নৃপতি দুর্জ্জন।
তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ॥

রামপ্রসাদ যুগসচেতন কবি, তাই অতিরিক্তটুকু হল—

নহে শাস্ত্র-সম্মত সসত্ত্বা সহমৃতা।
দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনাশূন্য পিতা॥

রামপ্রসাদের এই অংশটুকুতে পৌরাণিক প্রভাব—বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রামপ্রসাদ পণ্ডিতকবি ছিলেন। তাঁর বিদ্যা, বিদ্যার সখীরা কেউ পৌরাণিকজ্ঞানে কম নয়। রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী কবি কৃষ্ণ-রামেও পৌরাণিক প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

রামপ্রসাদ যে কৃষ্ণরামের অনুসরণকারী তাঁর বিদ্যাসুন্দর রচনার ক্ষেত্রে, তাঁর ওপরে পৌরাণিক প্রভাব থেকেই তা বোঝা যায়। অনেক পৌরাণিক নাম, দৃষ্টান্ত উভয় গ্রন্থেই একরূপ।

ভারতচন্দ্রে যদি ধর্মীয় প্রভাব কিছু থাকে তাহলে তা তান্ত্রিক প্রভাব ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তান্ত্রিক কবি রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের অ[illegible] পৌরাণিক প্রভাবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন গ্রন্থের নানা বর্ণনার অঙ্গরাগ হিসেবে। একেবারে শেষে শব-সাধনার চিত্র এঁকে তাঁর শিক্ষানবীশী তান্ত্রিকতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

ভারতচন্দ্রে প্রথম চেষ্টাতেই দ্রুত চোর ধরা পড়ে গেল। তারপর চোরের নিগ্রহ। রামপ্রসাদের সুন্দর যে সত্যই কালীর বরপুত্র তার ছোট একটু প্রমাণ ধৃত হওয়ার পরেই পাওয়া গেল। কবি দেখিয়ে দিলেন সুন্দর ইচ্ছে করলেই কোটালের কবল-মুক্ত হতে পারতো।—

কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে।
ঢেকা মেরে দূরেতে ফেলিল নিশীশ্বরে ॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে।
চুল ছিল এলো শীঘ্র দুই করে বাঁন্ধে ॥
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে।
মনসাধে ধরা দিল ভর্ৎসিতে রাজারে ॥

বিদ্যার বিলাপ, মায়ের মনস্তাপ ও নগরবাসীদের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামে একরূপ।

ভারতচন্দ্র নারীগণের প্রতিক্রিয়াকে তাদের পতিনিন্দার কাজে লাগিয়েছেন। ঝরে পড়েছে অজস্র কৌতুকরস। তৎকালীন সরকারী কাজে নিযুক্ত অনেক মানুষের কার্যবিবরণী ও স্বভাবের পরিচয় পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো। গ্রন্থের সবচেয়ে করুণ অংশটুকু এভাবে রঙ্গরসিকতার অন্তরালে মারা গেল।

তারপর সুন্দরের রাজসাক্ষাৎকার এবং মশানে নীত হওয়ার ঘটনা।

এ অংশের বর্ণনাও ভারতচন্দ্রে অন্যরূপ। ভারতচন্দ্রের সুন্দর "পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া।" ভারতচন্দ্রের চতুর লেখনীর স্পর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট। সুন্দর মশানে এমন সময় বীরসিংহ শুকসারীর কথোপকথনে সুন্দরের পরিচয় পেলেন। তাদেরই

নির্দেশে গঙ্গাভাটকে আনালেন, পরিচয় যাচাই হল, সুন্দরকে ফিরিয়ে আনতে শ্মশান যাত্রা করলেন।

ইতিমধ্যে শ্মশানেও অভিনব কাণ্ড ঘটে গেছে। সুন্দরের চৌতিশা শুনে তার সাহায্যার্থে দেবী কালিকা দলবল নিয়ে মশানে নেমে এসেছেন এবং কোটাল ও তার অনুচরদের বেঁধে ফেলেছেন।

রাজা মশানে উপস্থিত হয়ে দৈবীমহিমা সব দেখলেন। তাঁর অনুরোধে সুন্দর তাঁর অঙ্গস্পর্শ করে দিব্যজ্ঞান দিলেন। জামাই নিয়ে শ্বশুর বাড়ি এলেন। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলো না। বিদ্যা পুত্র প্রসব করলো। তারপর সুন্দর স্বদেশ ফেরার ইচ্ছা জানালে। বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকক্রিয়া আরও চলেছে। তারা সন্ন্যাসী সেজে বেড়িয়েছে। বিদ্যা সুন্দরকে বারমাসের বার্তা [illegible]য়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্যা সুন্দরের দেশে গেছে। সেখানে সুন্দরের পূজা পেয়ে দেবী কালিকা তাদের স্বর্গীয় পরিচয় দিয়েছেন এবং শেষে রাজা ও রাণীকে কাঁদিয়ে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে স্বর্গে চলে গেছে।

এ সব অংশও খুব দ্রুত রচিত হয়েছে।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদে অন্তচিত্র। সেখানে বিদ্যা ও রাণীর শোকে এবং শেষে রমণীদের দুঃখপ্রকাশে আন্তরিকতার সুর শোনা যায়। পতিনিন্দার দিক দিয়েও যায় নি। সুন্দর ও রাজায় সাক্ষাৎকার উভয়ের রচনায় প্রায় একরূপ এবং গতানুগতিক কাহিনী অনুযায়ী। শ্মশানে সুন্দবের প্রার্থনায় দেবী ভরসা দিয়েছেন কিন্তু স্বয়ং আসেন নি। পূর্বে বিদ্যাও এই ভরসা পেয়েছে।

উভয় গ্রন্থেই সুন্দরের কষ্ট শেষ হয়েছে নাটকীয়ভাবে। কাঞ্চীদেশ ফেরৎ মাধবভাট মশানের পথ দিয়ে নগরে ঢুকতে গিয়ে দেখে ফেললে সুন্দরের নিগ্রহ। কাঞ্চীদেশের রাজকুমারকে সে চিনে ফেললে। কোটালকে সুন্দরের পরিচয় দিয়ে তিরস্কার করলে। কোটাল গ্রাহ্য করলে না।

তখন মাধবভাট রাজাকে গিয়ে সুন্দরের প্রকৃত পরিচয় জানালে। রাজা শ্মশানে এসে সুন্দরকে মুক্ত করে বাড়ি নিয়ে গেলেন। আবার বিবাহ দিতে হবে কিনা উভয় গ্রন্থেই সে প্রশ্ন উঠলো। গন্ধর্ব বিবাহের মূল্য উভয় স্থলেই স্বীকৃত হল। উভয় গ্রন্থেই বিদ্যার পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় সুন্দরের পিতৃগৃহে।

শ্বশুরালয়ে প্রমোদে বাস করছে সুন্দর। গর্ভধারিণী মায়ের বেশে স্বপ্নে কালিকা তাকে সচেতন করে তুললেন। স্বপ্নশেষে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল, সুন্দর কান্নাকাটি করতে লাগলো। বিদ্যা সান্ত্বনা দিলে কিন্তু সুন্দর স্বদেশ ফেরায় অটল।

বিদ্যা 'বারমাস্যা' শোনালে। রামপ্রসাদের বারমাস্যায় মাসের নামের স্থলে রাশির নাম ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণনায় ইতরবিশেষও আছে। কিন্তু মোটামুটি বক্তব্য ও পরিকল্পনা উভয় গ্রন্থেই একরূপ।

এরপর বিদায়ের পালা। সুর উভয় গ্রন্থেই একরূপ। সেই মায়াবাদ, সেই বাৎসল্য, সেই ছেড়ে যাওয়ার বেদনা—সব একরূপ। কৃষ্ণরাম বলেন—"জায়াপুত্র পরিবার, যতেক যাহার আর, জেন যেন জলবিম্বগণে।" রামপ্রসাদ বলেন—

কার পুত্র কার কন্যা কার মাতা পিতা।
সর্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র দুহিতা॥

এরপর গুণসিন্ধু রাজার দেশ।

কালী মহিমা প্রচারের জন্য গ্রন্থের সৃষ্টি। সুন্দরকে দিয়ে উভয় গ্রন্থেই পূজাপ্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেবীর মন্দির নির্মিত হয়েছে, মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নানা বলিদানে ও উপচারে পূজা হয়েছে এবং পূজার বরাবরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু শেষে রামপ্রসাদে সুন্দর নিজে শবসাধনা করেছে। কৃষ্ণরামে মার্কণ্ডেয় পুরাণের কিছু কিছু কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সেখানে তারাবতীর শবসাধনা করে দেবীর বর লাভের কথা আছে। এই তারাবতীই পরে বিদ্যারূপে জন্মেছে।

গ্রন্থ শেষে উভয় গ্রন্থেই বিদ্যাসুন্দর পুত্র পদ্মনাভের হাতে রাজ্যভার দিয়ে কৈলাস চলে গেছে। কৃষ্ণরামের পদ্মনাভ কেঁদে বলে—

এককালে জনক জননী যার মরে।
সেহ কি সংসার সুখ হেতু প্রাণ ধরে॥

আর রামপ্রসাদের পদ্মনাভ বলে—

এককালে পিতামাতা বিয়োগ যাহার।
পৃথিবীতে জীয়া সুখ কি ছার তাহার॥

আশা করি, এতক্ষণে বোঝা গেল, ভারতচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদের সম্পর্ক কি রকম দূরবর্তী। রামপ্রসাদের গ্রন্থের আদর্শ যেমন কৃষ্ণরাম তেমনি কৃষ্ণচন্দ্রের স্থলে সাবর্ণ্য-চৌধুরীরা হতে বাধা কি?

রামপ্রসাদের কাব্য ঘরোয়াভাবের কাব্য। এ বিষয়ে কৃষ্ণরামই অগ্রণী। তবে উভয়ের মধ্যে গ্রন্থ রচনাকালের ব্যবধান ৭০।৭৫ বছরের এবং শিক্ষা ও অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই ছিল। তাই কৃষ্ণরামে যা আভাবে আছে, রামপ্রসাদে তাই সম্যক পরিস্ফুট। কৃষ্ণরামে যার সূচনা, রামপ্রসাদে তারই সমাপ্তি। ঘরোয়াভাবের বিচারেও কৃষ্ণরামের আকর্ষণ কম, রামপ্রসাদের আকর্ষণ সমধিক।

ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্য, বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা, কৌতুকরসের প্রচণ্ডতা, চাতুর্যের তীব্রতা কিছুই রামপ্রসাদে নাই। অথচ রামপ্রসাদে যা আছে, ভারতচন্দ্রে তার স্পর্শটুকুও নাই।

রামপ্রসাদে চরিত্রগুলি জীবন্ত, আমাদের ঘরোয়া জীবনেরই স্বাদ যেন তাতে বিদ্যমান।

বাঘাই কোটাল হিন্দী জানে এবং রেগে গেলে স্থান কাল ভুলে হিন্দী বলে। হীরামালিনীকে সে বারবার হিন্দীতে তিরস্কার করেছে। আবার হীরাও রেগে হিন্দী বলে ফেলেছে। রেগে গেলে মাতৃভাষা ভুলে যাওয়া সাধারণ বাঙালীস্বভাব—যেমন সেকালে তেমনি একালে।

রাজা কোটালকেই বিদ্যার গৃহের চোর বলে ধরেছে। কোটাল স্ত্রীর মারফৎ প্রকৃত তথ্য জেনেছে। তখন তার সসঙ্কোচ ধিক্কারটুকু অপূর্বভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সে বলেছে—

গ্রামের সম্বন্ধে যারে যা বলিয়া ডাকে তারে
[illegible]ই ভাব কারণ কর্ত্তব্য।
এ আমি [illegible]কে পালা হায় হায় এ কি জ্বালা
রাজা বেটা বড়ত অভব্য॥

একটি সুন্দর গ্রাম্যচিত্রও এতে ফুটে উঠেছে। কোটালের স্ত্রীর মুখ দিয়ে অভিযোগের সুরটি লক্ষণীয়—

ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে।
অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে॥

বিদু ব্রাহ্মণী কোটালকে দেখে বলে—

কোন্ ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই।
বৌও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই॥

বিদু ব্রাহ্মণীর মুখে তার পীড়নের বর্ণনা—

যে জাতীয় দুঃখ দিল নৃপতির ঝি।
মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আর কি॥
সেঁটে ধরে আঁটে কিল মর্মে পাই পীড়া।
কর্মকারে পিটে যেন বড় লোহা ভিড়া॥

কোটাল ব্রাহ্মণীকে 'বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল দুটি।'

হীরা মালিনীর শাস্তিচিত্রও বাস্তব—

মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে।
বুকে হাঁটু দিয়া ঠেঙ্গ তুলে বান্ধে ঘাড়ে॥
তখনি কাঁদিয়া কহে ভাই রে বাঘাই।
নারী হত্যা করিও না জল দেরে খাই॥

স্থান বিশেষে কবির গভীর অনুভূতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যার প্রবোধ-বচন শোনার পর রাণী বলছে—

কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্রনীত।
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত ॥
জল-শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির।
ক্ষণেক বিবেক ক্ষণেক বিদরে শরীর ॥

কিংবা সুন্দর শ্বশুরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে—

অপরাহ্নে তরুচ্ছায় অতি দূরতর যায়
সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্যতম ভাব পাছে মানস তোমার কাছে
থাকিল গমন সেই তুল।

এর চেয়ে ভাল সান্ত্বনা বাক্য আর কিছু কি হতে পারে ?
কত সহজ কবিত্বের পরিচয় রয়েছে পুত্রদর্শনে সুন্দরের মনোভাব বর্ণনায়—

নিজ দেহচ্ছবি নিরখিয়া কবি
তনয়তনু নেহালে।
মন্দ মন্দ হাসে এই মনে বাসে
যেন দীপে দীপ জ্বলে ॥

কন্যার বিদায়কালে রাজা বীরসিংহের ব্যথাতুর পিতৃহৃদয়ের চিত্রটিও মনোরম—

হৃদয়ে পরম ব্যথা কহে কথা যায় কোথা
কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল।
স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা
শোকশেল হৃদয়ে পশিল ॥

রামপ্রসাদের কতকগুলি প্রবচনতুল্য বাক্য উদ্ধার করে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

(১) জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার।
(২) খুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কালসাপ ॥
(৩) ভাল বটে জীয়ন্ত মাছেতে পোকা পাড়।
(৪) কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত।
(৫) লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়া ঢাকি।
(৬) আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে।
(৭) কুকুরে প্রশ্রয় দিলে কান্ধে চড়ে এক তিলে।
(৮) বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয়।
(৯) জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা।
(১০) দৈবের নির্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়।
(১১) প্রাণ গেলে সল্লোকে কি করে দুষ্ট ক্রিয়া।

(১২) হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র।'
(১৩) দুঃসময়ে ধীর যেবা তারে নিন্দা করে কেবা
(১৪) বৃদ্ধকালে নানা জাতি সেবা করে সুত।
কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত॥
(১৫) মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে।

উপসংহার

আমরা এতক্ষণ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবনী, উপাধিলাভ, পৃষ্ঠপোষকতা, রচনা প্রভৃতির নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সকল সমস্যারই সমাধান রচনার চেষ্টা করেছি। রামপ্রসাদভণিতাযুক্ত সমস্ত রচনার একমাত্র রচয়িতারূপে কুমারহট্টের কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকে ধরে নিয়ে রামপ্রসাদরচনার ইতিহাসগত, কৃষ্টিগত, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাহিত্যিক নানা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। আমাদের ধারণায় যে ফাঁক থেকে যাচ্ছে, তারও স্বীকৃতি যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে। এই ফাঁক যে কিরূপ ব্যাপক হতে পারে, ডক্টর সুকুমার সেনের এই মন্তব্যটি থেকে তা বোঝা যায়—"কিন্তু এ গানগুলি—সব অথবা একটি—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের লেখা বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। মনে হয় গানগুলি একাধিক কবির রচনা, *এখন একত্র হইয়াছে রামপ্রসাদ সেনের নামে। তবে বিশিষ্ট সুরটি কবিরঞ্জনের সৃষ্টি হইতে পারে।*" (*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ১৯৬৫, পৃঃ ৪৯৫) পদরচয়িতা রামপ্রসাদ ও বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ এক ব্যক্তি ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে ডক্টর সেন সংশয় প্রকাশ করেছেন।

কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে রামপ্রসাদের যে সব পরিচয় বিবৃত হয়েছে সেগুলিকে অবলম্বন করে বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা রামপ্রসাদকে সহজেই কুমারহট্টের অধিবাসী বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং তাঁর একটি সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন এবং ধারাবাহিক বংশপরিচয়ও নির্ণয় করা যায়। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। সমস্যা শুধু পদাবলীর রামপ্রসাদকে নিয়ে। অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের রামপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নিয়ে। এটিকে সমস্যা মনে করলে সমস্যা আবার সমস্যার আকারে গ্রহণ না করলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। তবে সমস্যার আকারে যখন বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, তখন তার আলোচনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে যে ভূমিদান করেন, তার দানপত্রে রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' উপাধির উল্লেখ নাই, আমরা পূর্বে তা দেখেছি। এই উপাধির

অনুল্লেখ থেকে একই স্থানে দুজন রামপ্রসাদের অস্তিত্বই অনুমান করা যায়। তবে এ সম্বন্ধে আমাদের যা সিদ্ধান্ত তা হ'ল—

(১) কৃষ্ণচন্দ্র যদি রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়ে থাকেন, তাহলে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার বহু পূর্বে তা দিয়েছিলেন ;

(২) কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ 'বিদ্যাসুন্দর' রচনাকে ১৭৫৮র বহু পরে নিয়ে যাওয়া যায় না। ১৭৫৮র আগেই এই উপাধিদান পর্ব ঘটে ;

(৩) স্বগ্রামের জমিদারগণ এই উপাধিটি তাঁর কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে দিয়েছিলেন এবং তারপর কবির স্ত্রীর প্রেরণায় বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি রচিত হয়।

(৪) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আপনার আভিজাত্যঅহঙ্কারে গ্রাম্যজমিদার প্রদত্ত উপাধিটির ভূমিদানদলিলে স্বীকৃতি দেন নি।

পূর্বে এ সব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে, সুতরাং সংক্ষেপে এখানে সেগুলির উল্লেখ করা হল শুধু।

ডক্টর সেনের পুর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের একটি অংশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—"তবে বিশিষ্ট সুরটি কবিরঞ্জনের সৃষ্টি হইতে পারে।"

অর্থাৎ প্রসাদী সুরের আবিষ্কারক অবশ্যই পদরচয়িতা ছিলেন।

রামপ্রসাদের একটি পদে তাঁর কুমারহট্টে অবস্থানের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গেছে এবং পূর্বে তা উল্লেখও করেছি। অবশ্য এই পদটিতে 'কবিরঞ্জন' উপাধির উল্লেখ নাই। কিন্তু তবুও প্রসাদী সুরের আবিষ্কারক কুমারহট্ট নিবাসী 'কবিরঞ্জন' উপাধিধারী রামপ্রসাদকে পদাবলীরচয়িতা বলে গ্রহণ করতে বাধে না। 'বিদ্যাসুন্দর' রচয়িতা 'কবিরঞ্জন' উপাধিধারী রামপ্রসাদ সেনই যে পদাবলীরচয়িতা একমাত্র কবি, আর একটু তলিয়ে দেখলেই তা উপলব্ধি করা যায়।

রামপ্রসাদ আবিষ্কারক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিভাবে রামপ্রসাদ-তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, কাঁচড়াপাড়ার কবির কুমারহট্টের সঙ্গে যোগাযোগ যে কত সহজ ছিল, কালগত ব্যবধানের স্বল্পতার জন্য রামপ্রসাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে বাল্যে গুপ্তকবির যোগাযোগ ঘটা যে কত স্বাভাবিক ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। গুপ্তকবির সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণকে এই আনুমানিক সন্দেহের ভিত্তিতে কি অস্বীকার করা যায় ?

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন যেমন বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা, তেমনি তাঁর লেখনী থেকেই 'কালীকীর্তনে'র জন্ম। 'কালীকীর্তনে'র কুড়িটি ভণিতানামের মাত্র তিনটিতে 'কবিরঞ্জন', তিনটিতে শুধু 'কবি' বিশেষণযুক্ত রামপ্রসাদ, সাতটিতে 'রামপ্রসাদ দাস' পাওয়া যায়। বিদ্যাসুন্দরের ছিয়াশিটি ভণিতার পঁয়তাল্লিশটিতে 'কবিরঞ্জন' ভণিতা, তিরিশটিতে

'প্রসাদ', পাঁচটিতে শুধু 'রাম' পাওয়া যায়। অবশিষ্টগুলির মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটিতে 'রামপ্রসাদ' ভণিতা আছে। একটিতে 'প্রসাদ কবি' ভণিতাও আছে।

রামপ্রসাদের নামে পরিচিত পদগুলির অন্ততঃ ছটিতে 'কবিরঞ্জন' ভণিতা মিলেছে। এদেরই একটিতে 'কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন' ভণিতা আছে। 'কবি' বিশেষণযুক্ত রামপ্রসাদ ভণিতার অন্তত চারটি পদ রয়েছে। লক্ষণীয় 'ভিষক' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে একটি পদে এবং সেখানে নাম শুধু 'প্রসাদ'। 'দাস' উপাধি অন্ততঃ চারটি পদে লক্ষ্য করা যায়। একশটির মত পদে 'রামপ্রসাদ' বা 'শ্রীরামপ্রসাদ' ভাণতা মিলছে। শুধু 'প্রসাদ' ভণিতার পদ সংখ্যায় সর্বাধিক।

ভণিতাসাদৃশ্যের পরই বিষয় বা ভাবসাদৃশ্যের প্রসঙ্গ আসে।
'বিদ্যাসুন্দর' ও 'কালীকীর্তন' দুই কবির রচনা বলে স্বীকৃত, অথচ উভয়ের মধ্যে ভাবগত বৈসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।
'বিদ্যাসুন্দরে' কবি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যধারার অনুসরণে বিদ্যাও সুন্দরের আদিরসাত্মক প্রণয়লীলা বর্ণনা করেছেন। 'কালীকীর্তনে' দেবীর প্রণয়লীলা বর্ণনা করতে গিয়েই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন। বলেছেন—

যদি বল অনূঢ়া কালের এই কথা।
শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছে কোথা॥

বিদ্যাসুন্দরে দুইএকস্থলে বৈষ্ণবদের প্রতি কবির উষ্মার ভাব কিছু প্রকাশ পেয়েছে, যদিও আমরা জানি বৈষ্ণবধর্মবিরোধিতা কবির লক্ষ্য নয়। অথচ 'কালীকীর্তনে' ভাগবতীয় ধারায় দেবীর জীবন বর্ণনার প্রয়াসে কবির বৈষ্ণবদুর্বলতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কবির মনোভাব লেখাতেই সুস্পষ্ট—

একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা সনে দ্যাখো ধেনু॥

'কালীকীর্তনে'র কুড়িটি ভণিতার সাতটিতে 'দাস' উপাধির ব্যবহার কবির মনোভাব পরিবর্তনের কি পরিচায়ক নয়?
পার্থক্য শুধু এইটুকুই।
'বিদ্যাসুন্দর' কবির যৌবনপ্রারম্ভে লেখা আর 'কালীকীর্তন' রচিত প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে এসে। একটিতে স্ত্রীর প্রেরণা ও গ্রাম্যজমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রীর প্রেরণার প্রমাণ রয়েছে বারবার স্ত্রীর স্বপ্নাদেশলাভের উল্লেখের মধ্যে। আর অন্য পৃষ্ঠপোষকতা যে ছিল, তার প্রমাণও রয়েছে তাঁর উক্তিতে—

যে গাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল।
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল॥

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মত বড় পৃষ্ঠপোষক যে তাঁর নয় কবির 'গবাগণ গুপ্তে গোভঙ্গিমা করে হাসে' মন্তব্যেই তা সুস্পষ্ট।

এই পার্থক্যগুলি ছাড়া মিল সর্বত্রই।

প্রথমেই ধরা যাক, ভক্তিভাবের কথা। বিদ্যাসুন্দরের সব আদিসমাচার সত্ত্বেও গ্রন্থে ভক্তির প্রাধান্য সর্বত্র সুস্পষ্ট। এ সম্বন্ধে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কালীকীর্তন ও সমগ্র পদাবলী সম্বন্ধে একই কথা খাটে। বিদ্যাসুন্দরের কবির আদিত্বটুকুর অস্তিত্ব 'কালীকীর্তনে' এসেই লোপ পেয়েছে, পদাবলীতে তার আবির্ভাব স্বাভাবিক কারণেই ঘটে নি।

কবিরঞ্জনের 'বিদ্যাসুন্দরে' সাধনবিষয়ক কথা আছে। তান্ত্রিকসাধনার বিশিষ্ট ধারা 'শবসাধনা'র তত্ত্বগত রূপ সুন্দর ও বিদ্যার ধর্মীয় [illegible]র মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বেশ উপলব্ধি করা যায়, এখনও কবির শিক্ষানবীশী কাল। সিদ্ধি যে ঘটে নি কবির এই উক্তিই তার প্রমাণ—

কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা॥

আবার সাধনার বিষয় যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাতে তাঁর সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পরিচয় নাই। কবি বলেছেন—

জ্ঞাত নহি ব'লে কেহ না করিবা হেলা।
বিষয় বিষম কালসর্প নিয়া খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
ভঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু ক'রে যাই॥
অকর্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে।
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে॥

কবি তাঁর অভিজ্ঞতার অভাবকে আরও সুপ্রকট করেছেন—

নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে।
ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা ব্যক্ত বটে॥

তা ছাড়া সুন্দর—

ষড়ঙ্গন্যাসাদি যত কৈল প্রাণায়াম॥

আর প্রথমেই 'দক্ষিণ কালিকা মূর্ত্তি-সংস্থাপন' উপলক্ষ্যে সুন্দর নিবেদন করলে—'অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ নানা বলি।'

এ সমস্তই কবির যৌবনপ্রারম্ভের সাধনবিষয়ক অনুশীলনপর্বের কথা।

কবি কিন্তু বিদ্যাসুন্দর রচনার পূর্ব থেকেই পদ রচনা করছেন। সে পদে জনপ্রিয়তা

অর্জিত হয়েছে, তাই সুন্দরের শবসাধন প্রসঙ্গে বেশি তত্ত্বকথা বলতে গিয়েই কবি নিজেকে সতর্ক করেছেন এই বলে—

'গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত ॥"

কবির উপাধিপ্রাপ্তিও এই কবিত্ব খ্যাতির জন্য বিদ্যাসুন্দর রচনার পূর্বেই ঘটে। সুন্দর তখনও জানে না যে সে এবং বিদ্যা যথাক্রমে শাপভ্রষ্ট হারাবতী এবং মালাধর এবং 'মম পূজাপ্রকাশার্থ হইয়াছ নর।" তবু যখন দেবী বলেন 'বরং বৃণু' 'বরং বৃণু'— তখন সুন্দর জবাব দেয়—

নাহি চাহি কুঞ্জরালি বাজিরাজি রাজ্য।
জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য ॥
মনভৃঙ্গ কংসপাদপদ্মে বিহরতু।
অঙ্গীকার কৈল মাতা তথাস্তু তথাস্তু ॥

অথচ কবি বৈষয়িক চিন্তামুক্ত ছিলেন না। অধিকাংশ পরিচ্ছেদের অন্তে সন্তানপরিজনদের জন্য দেবীর কাছে পার্থিব মঙ্গলভিক্ষা চেয়েছেন। কবি নিজেও 'শবসাধনা' বর্ণনার সূচনায় ব্যক্ত করেছেন—

"স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।"

আবার পৌরাণিক রীতি অনুসারে দেশ ও জাতির সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তাতে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয়ও রয়েছে। কবির বাস্তবসচেতনতাও এতে সুস্পষ্ট। একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রাণবন্ত—

কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি।
সবেমাত্র ত্বরা এক বর্ণ ভবিষ্যতি ॥

আবার কবির কণ্ঠে মায়াবাদও ধ্বনিত হয়েছে—

কার মাতা কার পিতা কার অধিকার।
বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার ॥

কবির একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য হল—

ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ়জন প্রাজ্ঞহীন ॥

বিদ্যাসুন্দরের কবির দৃষ্টিভঙ্গী কালীকীর্তনে প্রসারতা লাভ করে পদাবলীতে শুদ্ধতর রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু পদাবলীর আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার পূর্বে ও পরে তাঁর পূর্ব আলোচিত রূপকাশ্রয়ী পদ, বৈষয়িক চিন্তাবিষয়ক পদ, মায়াবাদ-প্রকাশক পদগুলি রচিত হয়।

রূপক ও সঙ্কেতের আড়ালে ব্যক্ত সাধনার সমস্ত কথাই তাঁর সাধক ও কবিজীবনের প্রথম দিকে রচিত পদগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। কালীকীর্তনের যুগে তাঁর সমন্বয়বাদের পদ-

গুলি বেশিমাত্রায় রচিত হয়েছে। তাঁর প্রবীণ বয়সের পদগুলি শুধু আত্মনিবেদনের ঘোষণায় পূর্ণ। এগুলিতে প্রকাশিত তাঁর ধর্মীয় মতগুলি সবই তাঁর সাধক জীবনের অভিজ্ঞতাজাত। এগুলির মধ্যে কোন দ্বিধাসংশয় নাই। Mystic সাধকের অধ্যাত্ম-দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে স্থান পেয়েছে। কবির বিবিধ রচনার মধ্যে সঙ্গতি দেখানোর জন্য সংক্ষেপে কথাগুলি পুনরুল্লিখিত হল।

পরিশেষে শুধু বক্তব্য, রামপ্রসাদের সমস্ত রচনাকে একটি সামগ্রিক ঐক্যবোধের দৃষ্টিতে দেখলে, কুমারহট্টের কবিরঞ্জনকে চিনতে ও বুঝতে অসুবিধে হয় না। 'বিবিধ রামপ্রসাদ' সমস্যাও বিশেষ মস্তিষ্ক পীড়ার কারণ হয় না। তবে রামপ্রসাদের পদাবলীতে আর কারো পদ মিশে যায় নি এমন ধারণাও ভ্রমাত্মক। কিভাবে এই মিশ্রণ ঘটতে পারে এবং আদৌ ঘটেছে কিনা সে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নতুন আলোকের প্রথম কবি। তিনি যুগের ও যুগান্তরের। তাঁর জীবনী-উপাদানের অনুসন্ধান যেমন কাম্য তেমনি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাঁর রচনারও বিশ্লেষণ আবশ্যক। তিনি শুধু যেমন কবি নন, তেমনি শুধু সাধক বলে তাঁকে গ্রহণ করে তাঁর সব কিছুর মধ্যে সাধক সত্তাকে খুঁজতে যাওয়াও বাতুলতা। তাঁর দৃষ্টি নিকট থেকে দূরে প্রসারিত। এখানে তিনি কবি। আবার এই কবিত্ববস্তুটির সঙ্গেই তাঁর সাধকত্ব জড়িয়ে রয়েছে। কবিদের দূরপ্রসারী দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে অনিশ্চয়তা সংশয় এবং অতৃপ্তি। কামনার মাপ সম্বন্ধে চেতনার অভাব সেখানে সুস্পষ্ট।

রামপ্রসাদ অতৃপ্ত এবং তৃপ্ত। কাছের এবং দূরের সর্ববিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে অটল। দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে যা দেখেন তাতে কোন অস্পষ্টতা নাই। আবার কাছের বস্তু-গুলিতেও সেই দূরের মায়াঅঞ্জন লাগিয়ে দেন। যাতে অতৃপ্তি তাতেই আবার তৃপ্তির বন্যা বয়ে যায়। তাঁর কবিসত্তা সাধকসত্তার দ্বারা পরিশীলিত। 'নারী' বিষয়ের একটি পদে তাঁর কবি ও সাধকসত্তার সমন্বয় দেখিয়ে আলোচনা শেষ করছি—

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
বিরাজে গো ব্রহ্মময়ী অংশরূপা
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে॥
কশ্চিৎ পদ্মিনী নামা, কশ্চিৎ চিত্রাণি বামা,
শঙ্খিনী হস্তিনীরূপে কটাক্ষেতে মন হরে॥
কশ্চিৎ যুবতী নারী কশ্চিৎ বা সুকুমারী
বালা প্রৌঢ়া নানা মূর্তি, বিশ্বজনে মুগ্ধ করে॥
বিলসিত মাতা পূর্ণা, হেমবর্ণা কৃষ্ণবর্ণা,
দীর্ঘকেশি কুরঙ্গাক্ষি, গতি নিন্দা গজেশ্বরে।
এক বাহংগজৎসর্বে, দ্বিতীয় কামনা পরে॥

নিরাকারে নিরাকার, সাকার ভাবনা যার,
সে লভে সাযুজ্যভার, নির্বাণ কি তার মনে ধরে।
নারী মাত্রে ভাব শক্তি, শুদ্ধ মনে কর ভক্তি,
প্রসাদ বলে এই যুক্তি, ভৈরব ভাবিবে নরে ॥

রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র

শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন

[কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শ্রীশ্রীকালীকর্ত্তন সংগ্রহ করে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। সেই প্রকাশের আখ্যাপত্র এবং গুপ্তকবির লেখা ভূমিকা প্রথমে প্রদত্ত হইল]

শ্রীশ্রীতারা।

ত্রিভুবন সারা।

কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ।

লোকান্তর গত ৺রামপ্রসাদ সেনের কৃত।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নানুসারে সং[illegible]র্ব্বক

সংশোধিত হইয়া কলিকা[illegible]জাপুরে

শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর গুণাকর

যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

এই গ্রন্থ গ্রহণে যাঁহার অভিলাষ হয় তিনি মোং

জোড়াসাঁক চাষাধোবা পাড়ায়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার

নিবাসি শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষের বাটী

তে স্বয়ং কিম্বা লোক প্রেরণ

করিলে প্রাপ্ত হইতে

পারিবেন ইতি।

শকাব্দা ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭)

ঈশ্বরস্য হৃদয়ে পদাম্বুজং সন্নিধায় শশিখণ্ডভালিকে

চণ্ডমুণ্ডমুখমুণ্ডখণ্ডনশ্রান্তিমন্তরয় দেবী কালিকে ॥

অথকালীকীর্ত্তনানুষ্ঠান

স্বস্তি কবিরঞ্জনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালীভক্তাবতারাবতারিত নবীন পদবী কালীকীর্ত্তনাভিধান ভক্তিরস-প্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনশ্রবণগোচর হয় নাই যদ্যপি গায়ক দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহার যৎকিঞ্চিদংশ কোন কোন মহাশয়ের কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্ব্ব রসাস্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে তত্তন্মহাশয়েরদের যৎকিঞ্চিদংশ শ্রবণোত্তর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পৃহাতে মনের ব্যগ্রতা সর্ব্বদা থাকে।

অপরঞ্চ কালীকীর্ত্তনব্যবসায়ি গাথক যে কয়েকজন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচ্চারণা-নভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্ত্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজন্য

রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণকালে মনে সুখোদয় না হইয়া বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্ত্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্ত্তিসুধাকরে কলঙ্কোদয় সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে বহুকালস্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূলপুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তনপুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধুসদাশয় মহাশয়েরা নয়নান্তপাত করিলে তাঁহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্কুর বৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহাকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।

সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু। সন্তঃ সুশান্ত-নয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কৃপ... ময়ীশ্বরচন্দ্রগুপ্তে ॥

কালী... র্ত্তন সংগ্রহকারের উক্তি

পয়ার। মত্ত হও বন্ধুগণ কালীপদ্মপায়। যে পদ ধরিয়া শিব শিবপদ পায়॥ কালহরা কালদারা কালিকার পদে। ভবভয় নাহি রয় সুখ পদে পদে॥ শ্যামানাম মোক্ষধাম বেদাগমে কয়। স্মরণ করিলে নামে ধামে টেনে লয়॥ এক চিত্ত করি তাঁরে ভজ এই ভবে। যদি মনে লয় তাহে লয় হবে তবে॥ ঘোর দুর্গে ডাক সদা দুর্গে দুর্গে রবে। দিনেশতনয়ক্লেশলেশ নাহি রবে॥ শিবাশিব তেজি সবে শবে ভাব শিবে। শিবাশিবপ্রদা শিবা শিব দেন শিবে॥ ভগ্ন দিয়া মিথ্যা আশা মগ্ন হও ধ্যানে। তারাতত্ত্ব কর তত্ত্ব গুরুদত্ত জ্ঞানে॥ ভাবে ভাব ভাবি ভাব তাহা নহে দূর। ভাবি ভাবি ভাবি দুঃখ করিবেন দূর॥ ভাবির স্বভাব কভু অভাব না হয়। সে ভাব ভাবিলে শ্যামা চিত্তে নিত্য রয়॥ অতএব হও সবে ভাবি ভাবাধীন। তারা তারা মুদে ধ্যান কর দিন দিন॥ শক্তি শক্তিমতে যেই ভজে ভক্তিপানে। তারে তারে তারিণী করুণা দৃষ্টি দানে॥

দেহ দেহশুদ্ধি হেতু মন যোগে যাগে। কালীকালি নাহি দিয়া হৃদে তাহা জাগে॥ কর করযত্নে বাহ্য বিষয় না চাও। নিত্য নিত্য নৃত্যকালী হৃদয়ে নাচাও॥ মূলাধার স্থান তাঁর মহাকাল নারী। মূলাধার জ্ঞান কর মহাকালনারী॥ ন্যায় তাঁর ভাব নেয় নানা ন্যায় পেতে। ন্যায় যদি ত্যজ সবে তবে পার পেতে॥ তর্ক করে বৃথা তর্ক চরণে চরণে। তর্ক ত্যজ স্থান পাবে চরমে চরণে॥ দরশন তত্ত্ব নাহি পায় মিছা ভাবে। দরশন পাবে যদি ভাব ভক্তিভাবে॥ তন্ত্রমন্ত্রফাঁদে পড়ে না হইও ভোলা। তন্ত্র কে বুঝিবে তাঁর ভোলা ভেবে ভোলা॥ দেখ সেই মায়ার মায়ায় বশ সব। হররাণী হরে হরে করে সদা শব॥ ত্রিভুবন মায়ের মায়ের মূলাধার। কালীরূপ কর চিত্র চিত্ত করি সার॥ সাধকের কোমল কমল হৃদিপরে। শ্যামা থাকে থাকে থাকে সদানন্দ ভরে॥ যথা শত শত শতদল ফুটে জলে। তেমতি মা সর্ব্বঘটে সর্ব্বঘটে চলে॥ পেলে দুর্গাপদ তার তরি এই ভব। কিন্তু ভবপারে পারে পাঠাইতে ভব॥ ভব সিন্ধুপার হেতু সেতু কর হরে। ভব সিন্ধু সম দুঃখ নিমিষেতে হরে॥ কারে দিব উপদেশ দেশ ভাল নয়। দ্বেষে দ্বেষে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়॥ নাহি জেনে অহংকার করে

অহম্কার। জানে না যে জীবন জীবনবিম্বাকার॥ ভব পার হেতু সবে ভবে করে হেলা। না করে সে পদ ভ্যালা ভ্যালা ভ্যালা॥ বালক বা লোক সব এই কলি কালে। দিন দিন জ্ঞানহীন বদ্ধ পাপজালে॥ লঘু সঙ্গে সঙ্গে সদা চালে মনোরথ। লোচন হীনের ন্যায় ভ্রমে ভ্রমে পথ॥ সেই অন্ধ তার স্কন্ধে যেই অন্ধ চড়ে। উভয়ে ভ্রমিতে বর্ত্ম কূপ মধ্যে পড়ে। নীচের নিকট সদা উপদেশ লওয়া। নাবিকেরে অর্থ দিয়া ডুবে পার হওয়া॥ সাধু সহ বাসে হয় বিজ্ঞান লোচন। পরম পদার্থ তাহে হয় দরশন॥ জ্ঞানচক্ষু হত হেতু ইহা নাহি মানে। দর্পণেতে যত সুখ অন্ধে কি তা জানে॥ লোকের বারণমন না মানে বারণ। ললাটের ফেরে ফেরে না জানে কারণ॥ অজ্ঞান মনুষ্য প্রতি বৃথা দিই দোষ। কপালে সকল করে কেন করি রোষ॥ করে করে তম নষ্ট যেই সুধাকর। সে চাঁদে কলঙ্ক গাঁথা ব্যক্ত চরাচর॥ শিবের প্রধানপুত্র সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। বিঘ্নহর গণেশের কুঞ্জরের মা[illegible]॥ কর্ম্মভোগ নাহি খণ্ডে শাস্ত্র যুক্তি সার। দেবের দুর্গতি এই মনুষ্য কি ছার॥ [illegible] ভাল বিনে ভাল নাহি হয় তায়। অদৃষ্ট অদৃষ্ট লেখা খণ্ডান না যায়॥ কিন্তু সিদ্ধ বাক্য এই পূজ হরদারা। কপালের কপাল তারিণী সর্ব্বসারা॥ কালি দিয়া কালীনাম ললাটেতে রেখে। বিধি দত্ত বিধি যাহা রাখ তাহা ঢেকে॥ গুপ্তমর্ম্ম এই সেই শ্রীনাথের উক্তি। ভাবিলে তাঁহাকে লোক তায় পায় মুক্তি॥ একান্ত বাসনা তাঁর যাহে লোক তরে। তাইতো ঈশ্বরগুপ্ত মর্ম্ম ব্যক্ত করে॥

ত্রিপদী

ভাব জীব তেজে মায়া মহেশমোহিনী মায়া মহাবিদ্যা মহেশ্বরীতারা। গত কালাগতকাল হৃদে ধর সহকাল কাল সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্বকারা॥ করহ নিগূঢ় ভক্তি তাহে পাবে মহাশক্তি যুক্তিযুক্ত ব্যক্ত এই ধরা। জানতো বচনসার করিলে উত্তমাচার সরোবরে মীন পড়ে ধরা॥ কে জানে কালীর মর্ম্ম নখজ্যোতি পূর্ণব্রহ্ম ভাবে মত্ত সর্ব্ব সর্ব্বসহা। ভাবে যথা পুণ্যবানে তদ্রূপ মা কোলে টানে যেমন চুম্বকে টানে লোহা॥ ত্রিগুণে ভুবনজয়ী বর্ণরূপা ব্রহ্মময়ী কুলকুণ্ডলিনী হংসবধূ। দুর্গানামামৃত পানে সবিশেষ গুণজ্ঞানে বদন কমলে ক্ষরে মধু॥ কখনো পদ্মিনীবামা কখনো চিত্রিণীরামা ছলেতে পুরুষ ছলে নারী। নানা বেশে বেশ ধরে মায়া কত মায়া করে সার মর্ম্ম বুঝিতে না পারি॥ ব্রহ্মারূপে পালে ক্ষিতি বাণীরূপে কণ্ঠে স্থিতি অন্নদা অম্বিকা কাশীমধ্যে। কমলে কমলা হন মাতা কত মতে রণ হরগৌরী হন মধ্যে মধ্যে॥ দ্বৈত ভাব ত্যাজ্য কর জ্ঞানচক্ষু যত্নে ধর লহ লহ সার উপদেশ। জীবে দিতে মোক্ষধাম সেই ব্রহ্ম গুণধাম ধারণ করেন নানাবেশ॥ যে জন যেভাবে ভাবে তারে তুষ্ট সেই ভাবে না দেয় ভক্তের মনে কালি। সদাশিব আত্মারাম কভু সীতা কভু রাম বিধি বিষ্ণু যা রাধা সা কালী॥ কৃষ্ণরূপে বাঁশী করে সদা রাধা নাম করে প্রেমানন্দে প্রফুল্ল গোকুল। কুঞ্জবনে নানা ছলে গোপীকার মন ছলে মনোরম্য স্থান সে গোকুল॥ রাধারূপে ব্রজনারী সে ভাব বুঝিতে নারি কলঙ্কিনী বলে ঘরে পরে। লজ্জাভয় পরিহরি মুখে বলে হরি হরি হরিপ্রেমভূষা অঙ্গে পরে॥ কালীরূপে কাল পরে কটিপরে কর পরে গলে দোলে শবমুণ্ড সব। এলোকেশী সর্ব্বনাশী অট্টহাসি সর্ব্বনাশি অসী করে রণে করে শব॥ শিবরূপে

যোগবলে সদা বোম বোম বলে হাড়মালা গলে করে শিঙ্গে। গায় ধুলা যোগে ভোলা হয়ে ভোলা ভাব ভোলা শিঙ্গে ফুঁকে পাবে সবে শিঙ্গে॥ ধনুধারি রামরূপে যুদ্ধ করে নানারূপে পাষাণ ভাষাণ সিন্ধুজলে। ছলেতে হইয়া সীতা জনকে বলিয়া পিতা নিজে নিজাঙ্গনা নিজ বলে॥ হইয়া অদ্বৈতবাদী জগতের বস্তু আদি কালী রাঙ্গা পায় রাখ মন। এক ভিন্ন দুই নয় বিরূপ যে জন কয় ধরাতলে মূঢ় সেই জন॥ উপাসনা ভেদমাত্র বারিপূর্ণ করি পাত্র রবিছায়া দেখ সেই জলে। হবে ব্রহ্ম নিরূপণ ত্রিভুবনে সর্ব্বক্ষণ প্রশংসা প্রদীপ তবে জলে॥ অতএব বন্ধুবর্গ তেজিয়া কর্ম্মের বর্গ ব্রহ্ম উপসর্গ করি রহ। না কর অভক্তি দ্বেষ লয়ে সার উপদেশ ঈশ্বরের ভাব সদা লহ॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য

শ্রীশ্রীকালী কীর্ত্তনং

ভবজলনিধিমগ্ন-রুগ্ন-জনগণ-বিমোচন-করণ-কারণ ভুবন-
পালিকা কালিকার গোষ্ঠাদি লীলা বর্ণন ।

অথ গুরু বন্দনা

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং ।
অন্ধপুট (পথ) খোলে ধবন্ধ সব হরণং ॥
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধ কি নয়নং ।
বল্লভ নাম শুনায়ত কারণং ॥
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতা[illegible] ।
তপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণং
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণং ।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণং ॥

অথ কালীকীর্ত্তনারম্ভ

মায়ের বাল্যলীলা

গৌরচন্দ্রী

গিরিবর আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে ।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে ।
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে ।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে ।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে ॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটী শশধরে ॥

শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগৎ জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে ॥] *
প্রভাত সময় জানি, হিমগিরি রাজরাণী,
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি, চেতনা জন্মায় রাণী
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত ॥
বারে বারে ডাকে রাণী, জননী জাগৃহি জাগৃহি জাগৃহি,
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
পুলকিত কোকবধূ শোক নিবায় ॥
উঠ উঠ প্রাণ গৌ... এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি (উঠগো
উদয়িতি দিনকৃতি, নলিনী বিকশতি,
একমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি ॥
সূত মাগধ বন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি,
নিদ্রাং জহিহি জহিহি জহিহি ॥
গাত্রোত্থানং কুরু করুণাময়ি।
সকরুণ দৃষ্টি ময়ি দেহি দেহি দেহি ॥

ভজন

চলগো মন্দাকিনী জলে, শিবপূজা বিল্বদলে,
মাঙ্গী শুনয়লো মাইকি ভাষ।
তখন গৌরীর কনক কমল মুখে মৃদু মৃদু হাস ॥
মা ডাকিছে রে ॥
কোকিল কলরুত, শীতল মারুত।
হতরুচি সম্প্রতি ভাতি শিখী।
নায়ক মলিন, বিলোকনে কুমুদিনী
কম্পিতবিগ্রহা মলিনমুখী ॥
কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন, দীনদয়াময়ি দুর্গে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি।
ভীমভবার্ণবমম্বুষু তারয়, কৃপাবলোকনে,
মাম্পাহি মাম্পাহি মাম্পাহি ॥

মায়ের বাল্যরূপ দর্শনে গিরিরাজ ও গিরিরাণী বিমোহিত হইতেছেন

তখন রত্নসিংহাসনে গৌরী, নিকটে মেনকা গিরি,
অনিমেষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।

---

* বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশ ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১লা চৈত্রের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৭৭ শকাব্দে প্রকাশিত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল নন্দীর 'শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন' গ্রন্থের সূচনায় এ অংশটি স্থানপেয়েছে।

রাণী বলে, পুণ্যতরুফল সেই, মন্দিরে প্রকাশ এই,
হুঁহে ভাসে আনন্দ সাগরে ॥
প্রভাতে অঙ্গ নেহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে তনু, সুললিত লোচন সজল,
হরল মুখে বাণী ॥
ঘেরল অবল, সবহুঁ রমণী মুখমণ্ডল,
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেয়ল আনি ॥
হিমকর বদন, রদন মুকুতাবলি
করতল কিশলয়, কমল পাণি।
রাজিত তঁহি কনকমণিভূষ[illegible]
দিনকর ধাম চরণতল [illegible] ॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর জপই
ধ্যান অগোচর জানি ॥
দাস প্রসাদে বলে সেই ব্রহ্মময়ী,
জগজন মন বিকচকর তহিঁ ভনি ॥

পুষ্পচয়ন ও শিবপূজা।

পূজে বাঞ্ছা বৃষকেতু, পুষ্পচয়ন হেতু,
উপনীত কুসুমকাননে গো—
(নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাতা)।
নানা ফুল তুলি, চিত্তে কুতূহলী,
গমন কুঞ্জরগমনে ॥
করুণাময়ী সঙ্গে সহচরী, প্রেমানন্দে গৌরী,
স্নান মন্দাকিনীর জলে।
"হরিষ তোমার যে কপালে চাঁদের আলো,
সে কপালে বিভূতি কি সাজে ভাল।
অঙ্গে কৌশেয় বসন সাজে,
দেখ, আমার বুকে যেন শেল বাজে,"
অন্তরে পূজেন শঙ্কর করবী বিল্বদলে ॥

করুণাময়ী গৌরীর গালবাদ্য ঘন

গাল বাদ্য ঘন, সজললোচন,
প্রণাম যেমন বিধি।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, প্রসীদ শঙ্কর, দেব দিগম্বর,
কৃপাময় গুণনিধি ॥
করুণা কর দেবদেব শঙ্কর।
ও প্রভু করুণা কটাক্ষ কর দেব দেব শঙ্কর ॥

সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্লেশ।
শ্রম বিনা কে করে কটাক্ষ লেশ ॥

গৌরীর অনশন ব্রতে মেনকার স্নেহ প্রকাশ

ব্রত অনশন, স্বস্তিক আসন,
মানসে শঙ্কর ধ্যান।
দিনকরকরে, শ্রমবারি ঝরে,
মলিন সে চাঁদ বয়ান ॥
কবি রামপ্রসাদের বাণী, কাঁদে মেনকা রাণী,
কি কর-কি কর মা এটা।
এ নব বয়সে, কুমারী এদেশে,
এমন কঠোর করে কেটা।
গৌরীর আমার [illegible] পুতলী তনু, উপরে প্রচণ্ড ভানু,
কি[illegible]উনয় নবনীত।
মরি মরি সুকুমারী, নবীন কিশোরী গৌরী,
বাছা কেন কর গো মা এমন অনীত ॥
স্বর্গ যদি মনে লয়, পিতা তব হিমালয়,
হিমালয় আলয় সবার।
কিম্বা বাঞ্ছ হৃদে ঈশ, তারি লাগি এত ক্লেশ,
রতনে যতন করে কার ॥
কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষমালা, কার লাগি মা হয়েছ ভৈরবী বালা,
তুমি যারে চিন্ত রাত্রিদিবা, সেই নির্গুণের গুণ কিবা,
তার চিন্তায় পাপপুণ্য, সে কেবল মহাশূন্য,
যারে পূজ বিল্বদলে, শুনেছি গো মা সে তোমার পদতলে।
একাসনে অনাহার, আরাধনা কর কার,
এ কঠোর তপে কিবা ফল।
মরমে পরম ব্যথা, মা রাখ মায়ের কথা,
ছাড় এ কঠোর, গৃহে চল ॥
তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধুজলে সে ডুবিল,
সেই শোক যখন উঠে মনে।
প্রাণ আমার যেমন করে, তা প্রাণ জানে ॥
সে শোক ভুলেছি বাছা তোর মুখ চেয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, তিতে রাণী আঁখির জলে,
এ কি কর মায়ের মাথা খেয়ে ॥

মেনকা গৌরীকে গৃহে আসিতে কহিতেছেন

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ,
কেমন কেমন কেমন করে ॥

দুটি আঁখির পুতলি গো, আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ।
প্রেমানন্দ সিন্ধু, তার পূর্ণ ইন্দু,
মন গজেন্দ্র আলান॥
এ-মন তোমাতে রয়েছে বান্ধা,
ত্রিভুবনসারা পরা গো ধন্যা।
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি,
ত্রিগুণধারিণী কন্যা॥
যদি কন্যা ভাবে দয়া গো, তবে বাছা,
এই কথা রাখ মার।
গিরিরাজার কুমারী, ভৈরবীর বেশ ছাড়,
ব্রহ্মচারিণীর আচার।
কবি রামপ্রসাদ দাসে গো, ভাষে জননী
মা কত কাচ গো কাচ।
তুমি মাতা মহেশ পিতা, পিতার প্রসবস্থলী মাতা,
মহেশ ঘরে আছ।

ভগবতীর গৃহে গমন

কোন্ জন বুঝে মায়া বিশ্বমোহিনীর।
জগদম্বা মন্দিরে চলিলেন কর ধরি জননীর॥
নিরখি জননীর মুখ মৃদু মৃদু হাসে।
ধরণীধরেন্দ্র রাণী প্রেমানন্দে ভাসে॥
তুরীয়া চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা।
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে দুহিতা॥
অঙ্গনে বৈঠল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে।
আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে॥
নিরখি নিরখি বদন ইন্দু। পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু॥
জল ছল ছল নয়ন। লোলচন্দ্রবদনে চুম্বন॥
মধুর মধুর বিনয় বাণী। গদ গদ গদ কহত রাণী॥
কোটি জনম পুণ্যজন্ম। কোলে কমললোচনা॥
দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর,
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, থোর থোর দোলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি, হসিত বদন বেরি বেরি,
চোরি চোরি থোরি থোরি, মন্দ মন্দ বোলনা॥
ঝুনুর ঝুনুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ,
পদতল স্থলকমলনিন্দি, নখ হিমকর-গঞ্জনা।
কলিত ললিত মুকুতাহার, মেরুবিকচহিমকরাকার
বিবুধ তটিনী বিষদনীর, ছলে তনুরঞ্জনা॥

কষিত কনক বিমল কান্তি, মনহি তাপ করত শান্তি,
তনু তিরপিত নয়নসুখ, কল্মষনিকরভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবিতনয় শঙ্কা, মদনমথন-অঙ্গনা॥
রাণী বলে ওগো জয়া, ভাল কথা মনে গো হইল।
জয়া বলে পুণ্যবতী, কি কথা তোমার মনে গো হইল॥
রাণী বলে, আমি কব কর‍্যা ভেবেছিলাম।
আরবার আমি ভুলে গেলাম॥
এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল॥
রাণী বলে, নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেরি উমার কায়।
পুন হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায়॥
একথা বুঝাব আমি কারে। [illegible]বা এমন কোথাও শুনেছ গো।
আপন অঙ্গে যখন পড়ে গো আঁখি। উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি॥
কি গুণে এ গুণ জন্মিল অঙ্গে। ওগো পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন গুণ গো॥
সুকাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে। প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে॥
সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয়। দর্পণের যে গুণ সে গুণ জলে কেমনে রয়॥
স্ফটিকে গ্রহণ করে জবা পুষ্প আভা। স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতী শুন। তোমার অঙ্গের গুণ নয় ও শ্রীঅঙ্গের গুণ॥
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল। শ্রীঅঙ্গের যেই গুণ গো সেই গুণে মিশাইল॥
(তুমি) উমাছড়া হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ।
(ওগো রাণি) অমন আর কি দেখা যায় তার প্রসঙ্গ॥

ভজন

হয় নয় অন্তরে গো রয়্যা।
আপন অঙ্গ দেখ গো চায়্যা॥
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ (গুণ) সুধাকর।
আমি সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥
এক চন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তোমা কর‍্যা নয়, সকল অঙ্গময়,
মা বিরাজে যখন যে নিরখি॥
একমুখে কত কব উমার রূপগুণ।
উমার রূপে নানা রূপ প্রসবে সংহারে পুনঃ॥
দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে।
পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে॥
রাণী বলে ওগো জয়া কুস্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে।
গত ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি,
গিলিতে ধায়্যাছে মুখচাঁদে॥

শুনেছি পুরাণে বহু মুখখানা বটে রাহু,
শরীরের সংজ্ঞা বটে কেতু।
এ রাহুর জটা মাথে, দারুণ ত্রিশূল হাতে,
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু॥

ভজন

রাহু গ্রাস করে যে শশীরে, সেই শশী রাহুর শিরে,
কোথা গেলে গিরিবর, শিবস্বস্ত্যয়ন কর,
গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্ব ঔষধির জলে স্নান করাও,
জয়া বলে সর্ব্ববিঘ্ন নাশ তাহে জা[illegible]॥
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে, [illegible]া শুনিয়া হাসে,
শিব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
যদি দুর্গা বুঝে থাক, আমার বচন রাখ,
জপ করাও মায়ের দুর্গানাম॥

ভজন

শিবস্বস্ত্যয়নে কিবা কাম। শিব জপে এই দুর্গা নাম॥
শ্রীদুর্গানাম গুণ গানে। শিব না মরিল বিষপানে॥
যার নামের ফলে, চরণবলে। শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে॥
দুর্গানাম সংসার সাগরে তরি। কাণ্ডারি তায় ত্রিপুরারি॥
যে দুর্গা নামে বিঘ্ন হরে। সেই দুর্গা কন্যারূপে তোমার ঘরে।
আমি সার কথা তোমারে কই।
ওতো তোমার কন্যা নয়, ঐ ব্রহ্মময়ী॥
(পাঠান্তর—গিরিরাজ সুন্দরী)
হিমগিরি সুন্দরী, স্নান করাইয়া গৌরী,
পুনঃ বসাইল সিংহাসনে॥
তখন গদগদ ভাবভরে ঝরঝর আঁখি ঝরে,
সাজাইল যেমন উঠে মনে॥
সুচারু বকুল মালে, কবরী বান্ধিল ভালে,
হরিচন্দনের বিন্দু দিল।
উপরে সিন্দুরবিন্দু, রবি কোলে যেন ইন্দু,
হেরি হেরি নিমিষ তেজিল॥
দোথরি মুকুতা হার, কোন সহচরী আর,
গেঁথে দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন, চাঁদ বেড়া তারা যেন,
উদয় করেছে মেঘের কোলে॥

তারার কপালে তারা, তারাপতি যেন তারা,
ঘেরা তারায় তারা সাজে ভাল।
বদন সুধাংশু যেন, তাহে তারা মুক্ত ঘন,
কেশরূপ ঘন করে আলো ॥
হাসিয়া বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ দলে,
রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া ধায়, দন্তশ্রেণী দেখা যায়,
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী ॥
জয়া বলে বটে এই পুণ্যকাল, ইথে দান করা ভাল,
চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়।
কৃপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ,
প্রয়াণ [illegible]দিয়া লৈতে চায় ॥

জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা। ছি ছি ও কথা তুলনা ॥ ছি ছি যার পায়ে চাঁদ উদয় হয়। তার মুখে কি কি তুলনা সয় ॥ শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি। নিরজনে বসে নিরমিল কলানিধি ॥ শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইল চাঁদে ॥ সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কাঁদে ॥ এ কথা শুনিয়া সখী বলিছে অনেক। সবে মাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক ॥ ভুবনবিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার। পরিপূর্ণ হৈলে দেবে করয়ে আহার ॥ এই হেতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম। বিচার করিল মনে বিষ্ণু গুণধাম ॥ বাসনা হইল সুধাসঞ্চয় কারণে। চাঁদ পাত্র বদলিয়া রাখিল বদনে ॥ পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল। দশখণ্ড হোয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল ॥ কতজনে কত কহে সার শুন কই। এক চাঁদ দশ খন্দ চেয়ে দেখ অই ॥ চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা। চাঁদ আর কমলে শাত্রবতা ॥ হাসিয়া বিজয়া বলে একি শুনি কথা। কেন চাঁদ কমলে হইল আমার শাত্রবতা। চাঁদ বলে, ইহা সয় কি আমার। শোভা যার মুখে রে যায়। ছিরে কমল তাই হইতে চায় ॥ এত বলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল আকাশে। অভিমানে কমল-সলিল মাঝে ভাসে ॥ উচ্চপদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে। বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্মশোভা হরে ॥ বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বহু। করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু। নিরখি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশ। ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ ॥ অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব। শত্রুভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্রভাব ॥ দুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ। করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ। রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি। উভয়তঃ সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী ॥ বাহিরের অন্ধকার গগন চাঁদে হরে। মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে ॥

ভগবতীর নৃত্য

রাণী বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম,
উমা একবার নাচ গো।
একবার নেচেছো ভবে, তেমনি করে আবার নাচিতে হবে,
নূপুর দিয়াছি পায়, সুমধুর ধ্বনি তায় গো ॥

শুনেছি নিগূঢ় বাণী, চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি,
ওগো আমার উমা নাচে ভাল।
মা নেচে সফল কর, মায়ের ইহ পরকাল॥
বাজে ডম্ফ জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল। বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল॥
চৌদিকে বেড়িল নব নব বধূজাল। পূর্ণচন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণপদ্মমাল॥
প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল। কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল॥
কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকান্তিছটা। শশহীন শশাঙ্ক সুপূর্ণ মুখঘটা॥
ভুবনে ভূষিত রূপ এটা মাত্র ছল। ভুজঙ্গভূষণ রূপ করে টলমল॥
রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে। বান্ধা কি ভূষণ ছলে॥
প্রভাতে নূতন গান শুন স্মেরযুতা। উষাকালে উক্তি উল্লাসিত শৈলসুতা॥
শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্টা সুতজ্ঞানে। প্রসি[illegible]কাশ গান পুরান প্রমাণে॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে। করু[illegible]র দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মহাঅন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥
জয়া বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম,
জগদম্বা চল পুষ্পকাননে।
চল চল পুষ্পবনে, জয়া দাসী যাবে সনে॥
জগদম্বে বিলম্বেও চলিত চিত্তপদচলনা।
লোহিতচরণতলারুণপরাভব,
নখরুচি হিমকরসম্পদদলনা॥
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন,
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিণী কলনা।
সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহে,
বিহরসি হর শিরসি শশি ললনা॥
কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে, বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর, দীন দয়াময়ী সন্তত ছল ছলনা॥

ভগবতীর উদ্যানে ভ্রমণ ও মহাদেবের বিচ্ছেদ-জন্য খেদ উক্তি

জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা। পুষ্পকাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা॥
মত কোকিল কূজিত পঞ্চস্বরে। গুণ গুণ গঞ্জিত মন্দ মন্দ ভ্রমরে॥
তরু পল্লব শোভিত ফুল্ল ফুলে। মাতা বৈঠতি চারু কদম্বমূলে॥
মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে। পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযুষ ক্ষরে॥
চারু সৌরভসঙ্গ সুধীর সমীর। প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর॥
পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে। শিবশঙ্করী শঙ্কর গান করে॥
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে। শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে॥
ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর। ত্রিপুরাসুরগর্ব্ব বিনাশকর॥
জয় বেদবিদাম্বর ভূতপতে। জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বগতে॥
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু। পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু॥
কমনীয় কলেবর পঞ্চ মুখে। মম চারু নামাবলি গান সুখে॥

সুর শৈবলিনীজলে পূত জটা। জটালম্বিত চারু সুধাংশুছটা॥
জটা ব্রহ্মকটাহ তব ভেদ করে। করে শৃঙ্গ বিষাণ শশী শিখরে॥
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভু হে। লোকনাথ হে নাথ প্রভু শম্ভু হে॥
ভবভাবিনী ভাবিত ভীম ভাবে। ভবভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে॥

পুষ্প কাননে শিব পার্ব্বতীর মিলন ও কথোপকথন

প্রেয়সীর খেদ গানে, সদা শিবের উচাটন করে প্রাণ,
লোলচিত্ত উঠে চমকিয়া।
ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী, গমন শিখরিপুরি,
নন্দী আন বৃষভে সাজাইয়া॥
কদম্বকুসুম অনু, পুলকে পূর্ণিত তনু,
ঈশান বিষাণ পুরে নাচে।
উভয়তঃ মত্ত গূঢ়, [illegible] বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড়,
ভৈরব বেতাল চলে পাছে॥

ধুয়া

কাল ভৈরব বেতাল রে।
নাচিছে কাল, বাজিছে গাল,
বেতাল ধরিছে তাল॥
কেহ নাচিছে গাইছে তুলিছে হাত।
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ॥
প্রেয়সীর প্রেমরসে, গদ গদ তনু বশে,
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুরতরঙ্গিণী, কুল কুল উঠে ধ্বনি,
সঘনে গরজে বিষধর॥
ভণে রামপ্রসাদ ভাল, সুখদ বসন্তকাল॥

হরগৌরীর সাক্ষাৎ

উপনীত মন্দাকিনী তীরে।
নিরখি সুন্দরী মুখ, মরমে পরম সুখ
লোচন তিতিল প্রেম নীরে॥
নন্দি, একি রূপ মাধুরী, আহা মরি, আহা মরি
গঠিল যে সে কেমন বিধি।
চঞ্চল মনোমীন, হৃদিসরোবর ত্যজি,
প্রবেশিল লাবণ্যজলধি॥
আহা আহা মরি মরি, কিবা রূপ মাধুরী,
হাসি হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
অপাঙ্গ লোচনে, মোহিনী কি গুণে
চৈতন্য নিগূঢ় হরে॥

———

কেরে কুঞ্জরগামিনী, তনু সৌদামিনী,
প্রথম বয়স রঙ্গিনী।
যৌবন সম্পদ, ভাবে গদগদ,
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী ॥
কেরে নির্ম্মলবর্ণাভা, ভুজগ মণি ভূষণ শোভা হরে
ভূষণে কিবা কায।
পূর্ণচন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে,
নাহি বাসে লাজ ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরী ছবি,
মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কাম রিপু [illegible]জর বপু,
সে রূপের কি কব [illegible] ॥

যদি বল অনূঢ়া কালের একি কথা। শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছে কোথা ॥
উভয়তঃ সুসম্ভাষ সঙ্কেত সম্বাদ। উভয়তঃ চিত্তমধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ ॥
আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেথা রব। কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুরে লব ॥
রমণীর শিরোমণি পরম রতন। রতনভূষণে কার নাহি বা যতন ॥
নিজ হংসে হংসী সদা মানসগামিনী। চৈতন্যরূপিণী নিত্যা স্বামীর স্বামিনী ॥
নখজ্যোতি পরংব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা। নিখিলব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী কর্ত্তা তব কেটা ॥
আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ। তোমার বিহীনে নাহি অন্য প্রয়োজন ॥
পুরুষ বিহীনে হয় বিধবা প্রকৃতি। প্রকৃতি বিহীনে আমার বিধবা আকৃতি ॥
অনুচ্চার্য্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ। নির্গুণে সগুণ কর প্রসব ত্রিগুণ ॥
নিজে আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব। তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥
তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চভূত কায়া। ঘটে ঘটে আছ যেমন জলে সূর্য্যছায়া ॥
বেদে বলে তত্ত্বী যোগী তত্ত্ব করে ফিরে সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনী তীরে ॥
দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান। শিখরিকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান।
মর্ম্ম কোয়ে স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি। জননী চলিল যথা গিরিরাজরাণী ॥
বাল্যলীলা এই মার জনক ভবনে। গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্রকাননে ॥

গোষ্ঠলীলারম্ভ

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে। শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে ॥
শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন। শঙ্করী সমান স্থান একাম্রকানন ॥

গৌরীর গোষ্ঠে গমন

ভজন

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে। যাব হে একাম্রবনে ॥
কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ। একাম্রকাননে মাতা করিল প্রবেশ ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব। অধরে সংযোগ করি ঊর্দ্ধমুখে রব ॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু। পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু ॥

ধুয়া

জগদম্বারে যব পূরে বেণু, যব পূরে বেণু,
ধায় বৎস্য ধেনু, উঠে পদরেণু।
ধায় বৎস্য ধেনু, উঠে পদরেণু।
রেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেম তরঙ্গ, সো মাকি রঙ্গ, নেহারে পতঙ্গ॥
হত কোকিল মান, সুমাধুরী তান, স্বরে হরে জ্ঞান।
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ॥
ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপলা প্রকাশে।
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমানন্দে ভাষে॥

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ। কষিত কাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥
বিচিত্র বসন মণিকাঞ্চন ভূষণ। ত্রিভুবন দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ॥
স্বয়ম্ভূ যুগল হর সুরনদী কূলে। স্বয়ম্ভূ পূজেন নিত্য করপদ্মফুলে॥
নাভিপদ্ম ভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে। লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে॥
ঈশ্বর মোহন ইষু নয়ন তরল। বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড। ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর দুগ্ধভাণ্ড॥
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান। ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান॥

ভজন

এমন রূপ যে একবার ভাবে।
ভাবিলে সাযুজ্য পাবে॥
একাম্রকাননে জগতজননী ফিরে।
ঘন ঘন হই হই রব করে সঙ্গিনীরে॥
সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে ধীরে।
নীলাম্বরাঞ্চল, পবনে চঞ্চল, আকুল কুন্তল ব্যাপিল শিরে।
মহা চিত্ত অরুন্তুদ, কোপে বিধুন্তুদ গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে॥
বিবুধ বন্ধ, যোগায় মধু, তনু সুশীতল ধীর সমীরে।
ঘন ঝরে শ্রমজল গলিত কজ্জল,
যেমন কালসাপিনী ধায় লভি বিবরে॥

ধুয়া

মা ডাকিছে রে, আয় সুরভি।
নব নব তৃণ, তটিনী জল শীতল, দূরে ধায়ত কাছে মার রে সুরভি॥
উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে। সারি সারি নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে॥
ঊর্দ্ধমুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে। দুনয়নে প্রেমধারা হাম্বা রবে ডাকে॥
লোমাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ স্রবে বাঁটে। সুরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে॥
সুরভির নব বৎস শোভা উরুপরে। মন্দাকিনী ধারা যেন সুমেরু শিখরে॥

ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি জগদম্বাশিরে। সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেমনীরে ॥
কৌতুকে আকাশ পথে হরিহর ধাতা। গোচারণে গমন করিল বিশ্বমাতা ॥
ভুবনমোহন মার গোচারণলীলা। মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিলা ॥
একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু। এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখ ধেনু ॥
আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা। এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্যা ॥

আগো! তোমার গুণ কে জানে। ধ্রু

মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদি দশ অবতার। নানা রূপে নানা লীলা সকলি তোমার ॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি সূক্ষ্মস্থূলা। কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা ॥
তারা তুমি জ্যেষ্ঠা মূলা অচরম সতী। তব তত্ত্বমূলে নাই শ্রুতিপথে শ্রুতি ॥
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব। শক্তিযুক্ত শিব [illegible] শক্তিলোপে শব ॥
অনন্তরূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা। স্বামী মৃত্যুঞ্জয় [illegible] অনন্ত মহিমা ॥
ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়রূপিণী। আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল। সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল ॥
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণি। তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরু ধ্যান করে সব জীব। কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব ॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার। কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার ॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার। গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার ॥
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য। সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য ॥
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়। যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায় ॥

পশুপতিকান্তা কান্তি নেত্রে একবার। নিরখ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার ॥
তৃণে শৈলে কূপে গঙ্গাজলে চন্দ্রকর। সমান নিপাত বিশ্বব্যক্ত শশধর ॥
দুর্গানাম দুর্ল্লভ লবার প্রাক্‌কালে। জপিলে জঞ্জাল যায় নাহি লয় কালে ॥
কি জানি করুণাময়ী কারে হৈলে বাম। সম্পদ রক্ষার হেতু জপে দুর্গানাম ॥
দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই। সে তরে সংসার ঘোরে সর্ব্ব পূজ্য সেই ॥
ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটী বর্ষ কয়। তথাচ মহিমা গুণ সীমা নাহি হয় ॥
মহাব্যাধি ঘোরে দুর্গে দুর্গা যদি বলে। কষ্ট নষ্ট চিরায়ু অচিন্ত্য ফল ফলে ॥
দুঃস্বপ্নে গ্রহণে দুর্গা স্মরণে পলায়। পুনরাগমন ভয় পরবর্ণে গায় ॥
শ্রীদুর্গা দুর্ল্লভ নাম নিস্তারের তরি। কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডারী ॥
তথাচ পামর জীব মোহকূপে মজে ॥ ইচ্ছাসুখে বিষপানে তাপানলে ভজে ॥
বদন কমল বাক্য সুধারস ভর। সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নর ॥
তবগুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু। সুধারস মাধুরী কি স্মরহর বধূ ॥
শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী। কালিকা বিজয়ী হরি চিত্ত মোহ হরি ॥
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে। তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে ॥

চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দিয়া। অকাল মরণ হরা অচল তনয়া ॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবনিতম্বিনী। চিত্তাকাশে প্রকাশ নবীন কাদম্বিনী ॥ *

[অথ ভগবতীর রাসলীলা

জগদম্বা কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী। ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী ॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখচাঁদে। সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশরাহু ভ্রমে কাঁদে ॥
সিন্দুর অরুণ আভা বিষম মানসী। উভয় গ্রহণে মেঘ পূর্ণিমার নিশি ॥
বিনতানন্দনচঞ্চু স্থনাসিকা ভান। ভূরু ভুজঙ্গম শ্রুতি বিবরে পয়ান ॥
ও রূপ লাবণ্য জলনিধি স্থির জলে। নয়ন সফরী মীন খেলে কুতূহলে ॥
কনক মুকুরে কি মাণিক্য রাগ প্রভা। তার মাঝে মুক্তাবলী ওষ্ঠ দন্ত শোভা ॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল প্রতিবিম্ব শ্রীবদন। চারুচক্র রথে চড়ি এসেছে মদন ॥
নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অচলজা। মীননিকেতনে কি উড়িছে মীনধ্বজা ॥
করিকর ভুজঙ্গ মৃণাল হেমলতা। কোন তুচ্ছ কমনীয় বাহুর তুল্যতা ॥
ভুজদণ্ড উপমার একমাত্র স্থান। সুর তরুবর শাখা এই যে প্রমাণ ॥
হরি গঙ্গা প্রবাহ যমুনা লোমশ্রেণী। নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানি ॥
মহাতীর্থ বেণী তাঁরে স্বয়ম্ভূ যুগল। স্নান করো মন রে অনন্ত জন্ম ফল ॥
উত্তরবাহিনী গঙ্গা মুক্তাহার বটে। সুচারু ত্রিবলী বিরাজিত তার তটে ॥
নাভি করে বিবেচনা যে ঘটে যে জ্ঞান। মণিকর্ণিকার ঘাটে সুচারু সোপান ॥
রসময় বিধাতার কিবা কব কাণ্ড। রূপসিন্ধু মন্থিবার মধ্যদেশ দণ্ড ॥
কাঞ্চিদাম রজ্জু তায় বুঝহ প্রবীণ। ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ ॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার। সহজে জঘনে ধরে গুরুতর ভার ॥
ভব স্থানে মনোভাব পরাভব হয়ে। তূণবাণ দ্বিগুণ এসেছে বুঝি লয়ে।
জঙ্ঘা তৎপদাঙ্গুলি নখ ফলি শবে। রতিকান্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি হরে ॥] * *

— —

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত কালীকীর্ত্তনের এইখানেই সমাপ্তি।

* * বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশ ১২৬০ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষের সংবাদ প্রভাকরে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৭৭ শকাব্দে প্রকাশিত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল নন্দীর 'শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন' গ্রন্থের শেষে এই অংশটি গৃহীত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

[খণ্ডিত। ১২৬০ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষের সংবাদ প্রভাকরে প্রথম প্রকাশিত হয়।]

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী।
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥
রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে।
রাই আমার মোহনমোহিনী॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে।
মদন পলায় ডরে॥
কুটিল কটাক্ষশরে।
জিনিল কুসুমশরে॥
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ।
সখী বকুলে বানাইল বেশ॥
তার গন্ধে অলিকুল হইয়া আকুল,
কেশে করিছে প্রবেশ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস,
মুখপদ্ম করেছে প্রকাশ।
উরে কলিকা যে আছে,
কি জানি ফুটে পাছে,
সখীর হৃদয়ে তরাস॥
ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার,
অপরূপ শোভা হল আর।
একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি,
সদন মদন রাজার॥
অলকা কোলে মতিহার,
কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার।
যেন রাহুর মুখমাঝে, বসনরাজি রাজে,
চাঁদেরে করেছে আহার॥
আঁখি লোল অনুমানি এই,
চাঁদে হরিণ শিশু আছে যেই।
তনু সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে,
দিগ নিহারই সেই॥
চারু অপাঙ্গ কাম কামান,
নাসাতিলক শর খরসান।
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর,
ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান॥

নৌকাখণ্ডের সংগীত

[১২৬১ বঙ্গাব্দের ১লা চৈত্রের 'সংবাদ প্রভাকরে' নৌকা খণ্ডের সংগীত' নামে গান ৩টি প্রকাশিত হয়

ওহে নূতন নেয়ে। ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে ॥
দুকূল রহিল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করেছে দেয়া, মাঝ্ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি, নটো, হোক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী.
মিছা তবে হইবে হে বেদ ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী
প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥
কহিছে প্রসাদ দাস রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয় ॥

এ নৌকা বাওহে ত্বরা করি নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজ বধূর সঙ্গে।
আতপ লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী,
চালন কর মনের রঙ্গে।
আপন করহে পণ, চাওহে যৌবন ধন,
হাস ভাষ প্রেম তরঙ্গে ॥
আগে চরাইতে ধেনু, বাজায়ে মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে।
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে ॥
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,
কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে।
সময় উচিত কও, কোন রূপে পার হও.
দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥

সীতা বিলাপ

১২৬১ বঙ্গাব্দের ১লা চৈত্রের সংবাদ প্রভাকরে 'সীতার বিলাপোক্তি সংগীত' নামে এই গানটি প্রকাশিত হয়।

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম,
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।
জনক দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে,
লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইল জীবননাথেরে দেখিতে,
শিরে কর হানি পড়িয়া মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে॥
(সীতার) লোচনে সলিল পড়িছে ঝরিয়া,
রামের দুখানি চরণ ধরিয়া,
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া,
কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে॥
অভাগিনী ডাকে উঠনা তুরিতো,
শুনিয়া না শুনো এ কোন্ উচিতো,
কমল নয়নে চাহনা চকিতো,
বিদরে পরাণো কর না স্থকিতো,
প্রবোধ দেহ না উঠিয়ে হে!
ধূলায় ধূসর এ হেন শরীর,
দুকূল আকুল হোয়েছে কটির,
ললাট ফলকে পড়িছে রুধির,
দিবসে সকলি দেখিহে তিমির,
আলো কর প্রভু জাগিয়ে হে॥
কর হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া,
কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া,
কেমনে এমন দেখিব বসিয়া,
পরাণ যাইছে ফাটিয়ে হে।
যখন ছিলাম জনক বাসেতে,
আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে,
বিধবা চিহ্ন নাহিক তোমাতে,
এবে এই ছিল মোর কপালেতে,
সখা, কোথা গেলে চলিয়ে হে॥
ললাট লিখন ঘুচাতে নারে,

আপন উদরে ধরিছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে,
আহা নাথ, নাথ, কি হোলো আমার এ,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে।
ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার তো নয়,
এমন করিতে সমুচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে।
এ ছার জীবন কেমনে রাখিব,
তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব,
নহে হলাহল অশন করিব,
কি কায এ দেহ রাখিয়ে হে।
প্রসাদ কহিছে শুন, মা, জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান না কমল কানকী,
এখনি উঠিবেন রাঘব ধানকি,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো॥

শিবসংগীত

[১২৬১ বঙ্গাব্দের ১লা চৈত্রের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত

হর ফিরে মাতিয়া।
শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম ভম,
ভোঁভোঁ ভোঁ, ভমম ভমম
ববম ববম ববম,
বব বব বম বব বম গাল বাজিয়া॥
মগন হইয়া প্রমথ নাথ,
ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া॥
শশধর-কলা ভালে শোভে,
নয়ন-চকোর অমিয় লোভে,

স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে,
কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয়ে থাকি থাকি থাকি,
দেখি রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতি-ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি, হরি গুণে হর নাচিয়া ॥
বদন-ইন্দু ঢল ঢল ঢল,
শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরী উঠিছে কল কল কল,
জটাজুট মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর,
নিজ গুণে লহ তারিয়া ॥

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর

অথ গণেশ বন্দনা

পবম পুরুষ পঁহু পুনঃ পুনঃ প্রণমহু
পর্ব্বতেশ পুত্রী-প্রিয়-সুত।
বিভু বের্দবিদাম্বব, বিনায়ক বিঘ্নহর,
বারণবদন গুণযুত॥
তরুণ অরুণ অণু, অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু,
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।
আভবণ নানা ম... মণি হেম মরকত
সিন্দূরে সুন্দর শুণ্ড-গণ্ড॥
অদিতি-অঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ, আবোহণ আখু-পৃষ্ঠ *
আসরে উরহ একবাব।
জনে যদি জপে নাম, যম যিনি যোগ্য ধাম,
যায় তায় করি অধিকার॥
দেবদেব দীনবন্ধু, দাসে দেহি দয়াসিন্ধু,
সবিশেষ উপদেশ সার।
শিব কর্ম্মে তুমি মল, হও শীঘ্র অনুকূল,
আমি শিশু বাঞ্চিত সংস্কার॥
বামবাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত বামপ্রসাদে, কহে কোকনদ পদে,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া॥

অথ সরস্বতী বন্দনা

যত্নে পুটাঞ্জলি অতি, বন্দে মাতা সরস্বতী,
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী।
কুচভর-নমিতাঙ্গী, ভুবনমোহন ভঙ্গী,
বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ডজননী॥
শ্বেতপদ্ম শ্রীচরণ, হংসবধূ অনুক্ষণ,
হৃদিমধ্যে বিহব মা নিত্য।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণ প্রজ্ঞা, পাল মাতা নিজ আজ্ঞা,
কণ্ঠে বসি কহ সুকবিত্ব॥
নানা যন্ত্র তাল মান, আলাপে মোহিত জ্ঞান,
রাগ ছয় ছত্রিশ রাগিণী।

---

* আখু—মূষিক

ধন বিদ্যা সংগীত-পর, যে গানে ত্রিপুরহর,
দ্রব কৈলা দেব চক্রপাণি ॥
সেই বস্তু এই গঙ্গা, নির্ম্মল সুতুঙ্গভঙ্গা,
কণা মাত্রে মহাপাপ হরে।
সত্য সত্য বেদে উক্তি, দর্শনে কৈবল্য মুক্তি,
স্নানফল কহিবে কি নরে ॥
ব্যাস বাল্মীকাদি-চয়, মহাকবি মহাশয়,
তব কৃপালেশে প্রজ্ঞাবান।
বহুকষ্টে চিত্তে খেদ, সঙ্কলন করি বেদ,
নানা শাস্ত্র করিলা বিধান ॥
তব কৃপাদৃষ্টি যারে, জগত জানিতে পারে,
ধরাতলে সেই জন ধন্য।
তুমি গো যাহারে বাম, জীয়া তার কিবা কাম,
মূঢ়মতি সে অতি জঘন্য ॥
তুমি বিশ্ব অন্তর্যামী, স্তব কিবা জানি আমি,
বেদাগমে অতুল্য মহিমা।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা, স্মরহর হরি ধাতা,
কোনরূপে না পাইলা সীমা ॥

অথ লক্ষ্মী বন্দনা

কমলে কমলা বন্দে কোমল শরীর। কমল-চরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর ॥
গুরু উরু ডমরু-সুচারু মধ্যদেশ। ত্রিবলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ ॥
কান্তি মধ্যে উভ তটে গুপ্ত যুগ্ম কোক। তব রোমাবলী কুচ কুম্ভ কহে লোক ॥
পঙ্কে বাস বিস সে কি বাহুদণ্ড অণু। তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে ক্ষীণ তনু ॥
নাসা তিলফুল তাহে বিলোল বেসোর। পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর ॥
জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দন্তশোভা। বিম্বাধর প্রতিবিম্ব মুক্তা মনোলোভা ॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত। মনোহর মনোহরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ॥
নিন্দিয়া গিধিনিশ্রুতি শ্রবণ যুগল। দরিদ্র-দ্রবিণ-আশা সুদীর্ঘ কুণ্ডল ॥
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাঁই ঠাই। কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই ॥
সর্ব্বগুণহীন যদি ধনবান্ হয়। তৃণ তুল্য দ্বারে তার কত গুণালয় ॥
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য। সত্ত্ব দানে বিত্ত গুণে সে লভে সাযুজ্য ॥
যে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ। কি তার ঐহিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ ॥
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে। থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে ॥
কি আর কহিব বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ। বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ ॥
এ সর্ব্ব তোমার মায়া জানি গো জননী। প্রসাদে প্রসন্ন হও জলধিনন্দিনী ॥

অথ কালী বন্দনা

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম। জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্যধাম ॥
কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই। লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়্গ বটে সেই ॥
রসনাগ্রে মুখভরে যত্ন করে লও। ভক্তি গজপৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও ॥
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর। শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার ॥
নাম নৃত্যা নৃত্যতি নিখিলনাথ-উরে। বিপরীত কাজ লাজ পরিহরি দূরে ॥
কাদম্বিনী জিনিয়া নির্ম্মল বর্ণ কালো। কলেবর কিরণ তিমির-পুঞ্জ আলো ॥
কটিতটে করাল লম্বিত মুণ্ডমাল। লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল ॥
হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পমান্। বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান ॥
অপরূপ শবযুগ শ্রবণ যুগলে। বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে ॥
বিবস্ত্রা যোগিনীঘটা দীর্ঘ জটা মাথে। বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে ॥
সিত পিত লোহিত অসিত রূপ জটা। যুদ্ধে ক্রুদ্ধে উর্দ্ধমুখে গিলে রিপু ঘটা ॥
হত রথী সারথি তুরঙ্গ করিবর। শিবাকুলে সঙ্কুল শ্মশান শঙ্কাকর ॥
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল। অকালে প্রলয় সৃষ্টি মজিল সকল ॥
অখিল জননী তব চরিত্র এমন। হেদে গো করুণাময়ী এ আর কেমন ॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই ॥

অষ্ট-রসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম। পরম রহস্য-কথা শুন গুণসদ্ম ॥
বিলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে যে রস। বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্য্যকর্ত্তা যশ ॥
স্বকীয় সুন্দরী পাদপদ্ম হৃদে রাখি। প্রাজ্ঞ মাত্র সদাশিব বিঘূর্ণিত আঁখি ॥
মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘৃণা জন্মে মনে। কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে ॥
দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধ ভয়। চির কালান্তরে পরিপূর্ণ পরাজয় ॥
চন্দ্র সূর্য্য এ কোন উদয় ত্রিভুবনে। ক্রোধযুক্ত বিধুন্তুদ শক্র নিরীক্ষণে ॥
সতী সঙ্গি সভক্তি হৃদয় পদ্ম বৃন্দ। নিতান্ত বিস্মিত বিরিঞ্চ্যাদি সুরবৃন্দ ॥
মহাভীতা ধরণী সুস্থির নহে প্রাণ। চিন্তয়তি কোনরূপে পাই পরিত্রাণ ॥
স্মেরমুখীসহচরীগণ মহাহ্লাদ। নয়ন নিমিষহীন বিগত বিষাদ ॥
ত্রিগুণজননী তব নিরখিয়া পদ। উথলে করুণাসিন্ধু অঙ্গ গদগদ ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই ॥

[জাগরণারম্ভ]

বিদ্যার পাত্রান্বেষণ, মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন

বীরসিংহ মহামতি, হৃদয়ে চিন্তিত অতি,
দুহিতার যোগ্য পতি কই।

রূপে গুণে কুলে শীলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে,
বিশেষত বিদ্যালাপে জই ॥
সে জন তাহার প্রভু, প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন কভু,
নহে কোথা সুপাত্র এমন।
যত যত ভূপসুত, রূপেতে বটে অদ্ভুত,
বিদ্যা নাহি উপায় কেমন ॥
নিকটে মাধব ভাট, কত মত করে ঠাট,
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র।
শুন শুন মহাশয়, একথা অন্যথা নয়,
কিন্তু কিছু কাল গৌণ মাত্র ॥
ভাটবাক্যে অট্টহাসে, [illegible]সিন্ধু মধ্যে ভাসে,
সিরপা করিলা তাজি ঘোড়া ॥
ছিঁড়িয়া গলার হার, নানা রত্ন দিল আর
খাস পোষাকের খাসা যোড়া ॥
বিদায় করিয়া ভাটে, পুনরপি রাজপাটে,
রাজকর্ম্মে মন দিলা ভূপ।
মিলিবে উত্তম বর, সুপুরুষ গুণধর,
মনে মনে জানিলা স্বরূপ ॥
মাধব তুরঙ্গ চাপে, গোঁপে পাক দিয়া দাপে,
সেঁটে মারে পিছাড়ে চাবুক।
পবনগমনে যায় পাছু পানে নাহি চায়,
প্রসাদেতে পরম কৌতুক ॥
ভ্রমিল অনেক ঠাঁই, উপযুক্ত মিলে নাই,
শেষ কাঞ্চিদেশ উপনীত।
পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে, সুকবি সুন্দর রঙ্গে,
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত ॥
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি, যে যে কহে দৃঢ় কোটি,
ক্ষণ মাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড়, ভবানীর ভক্ত বড়,
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত ॥
চিত্তে চমৎকার লাগে, করজোড়ে খাড়া আগে,
রায়বার পড়ি করে স্তব।
শিরে উঠাইয়া হাত, কহিতেছে হিন্দি বাত,
শুনি সুখী সুন্দর নীরব ॥
বাবুজী কুর্ণিস মেরা, বর্দ্ধমান বিচ ডেরা,
নাম তো হামারা মাধো ভাট।
আরজ করে আগে পিছে, ঘড়ী এক বৈঠে নীচে,

আর তো লাগায় তোম হাট ॥
আয়া হোঁ যো চড়ে ঘোড়ে, তস্‌দিয়া পায়া হোঁ বড়ে,
ও লেকেন ভুল গেয়া সব।
খেলাপ না কহো বাবু, তোম্‌নে মুঝে কিয়া কাবু,
মেই রোই তুঝে দেখা যব ॥
চিন্‌ লিয়ে দেওকে এয়্‌সে, আপ কে সুরত যেয়্‌সে,
তুনিয়ামে পয়দা কিয়া সোহি।
দেখা হো মুলুক কেত্তা, ছত্রিয়েমে রাজা যেত্তা,
তেরা মোকাবিলা নাহি কোহি ॥
বীরসিংহ নামে রাজা, জাত্‌মে হ্যায়্‌ বড়া তাজা,
শোধ হোঁগে ওন্‌কা জেকের।
ওন্‌কা ঘরমে লেড়্‌কী এক, তারিফ করোঁ মে কেত্তেক,
রাত দিন সাদিকা ফেকের ॥
কওল এত্না কি হেয় ও, হজিমত্‌ হি দেগাযেও,
শাস্ত্রমে ওহি ওস্‌কা নাথ।
তোমারা হোঁ এসা জান, যো কহোঁ সো কহা মান,
তোম সকোগে আও হামারে সাত ॥
বিরলে ডাকিয়া নিয়া, সুন্দর সুস্থির হৈয়া,
শুনিলা বিশেষ আর কথা।
বিবাহ হইল বাই, পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই,
নিবসি রমণীমণি যথা ॥
পিয়া-বিদ্যানাম সুধা, সুন্দরের গেল ক্ষুধা,
রত্নাগারে করিলা শয়ন।
ঘোরতর নিশি শেষ, ধরি কালী নিজ বেশ,
সবিশেষ কহেন স্বপন ॥
ভাব কেন ওরে ভক্ত, আমি তব অনুরক্ত,
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই, একান্ত জানিবে এই,
তরুণী তোমার তরে ঘটে ॥
প্রথমেতে গুপ্ত কায, ব্যক্ত শেষে মহারাজ,
কোটালে কহিবে কাটিবারে।
সে কিছু মানস নয়, কেবল দর্শাবে ভয়,
পরিচয় লইবার তরে ॥
সন্ধান করিবে পুনঃ, কারণ ইহার শুন,
প্রাতে চল বীরসিংহ দেশ।
একাকী যাইবা তুমি, সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি,
কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ ॥

দশম দিবস গৌণ, এত বলি মাতা মৌন,
স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা শিবা।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয়, রজনী প্রভাতা হয়,
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা

স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি। জায়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি॥
বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইয়া গুণধাম। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু জপে দুর্গানাম॥
সেইক্ষণ মাহেন্দ্র কহিব বাড়া কিবা। দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বামে শব শিবা॥
ধেনু বৎস প্রযুক্ত সম্মুখে বরাঙ্গনা। পূর্ণকুম্ভ কক্ষে মত্তকুঞ্জরগমনা॥
বুঝিলা বিনোদবর বিদ্যাবতী লাভ। প্রসন্না পর্ব্বতপুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব॥
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা। মহারণ্যে মহাকবি প্রবেশিলা একা॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি চলে রাত্র দিবা। কি ভয় সঙ্কটে সদা সঙ্গে সঙ্গে শিবা॥
পথশ্রমে যদ্যপি জন্মায় বড় ক্ষুধা। শ্রুতিপথে পিয়ে বিদ্যানামরসসুধা॥
বনে বনচর কত চরিয়া বেড়ায়। তুষ্টতর তারা তারে ফিরে না তাকায়॥
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দেবী ভগবতী। মায়ায় সৃজিলা নদী বেগবতী অতি॥
ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গভীর। তালবৃক্ষ তুল্য ভাসে প্রলয় কুম্ভীর॥
সুতুঙ্গতরঙ্গরঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে। ফাঁপর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে॥
হেন কালে শুনহ অপূর্ব্ব এক কথা। অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা॥
বিভূতিভূষিত তনু কণ্ঠে অক্ষমাল। তাম্রবর্ণ জটাভার দুই চক্ষু লাল॥
করোপরে ত্রিশূল শার্দ্দূলচর্ম্ম কক্ষে। উৎপত্তি প্রলয়স্থিতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষে॥
যোগী জেনে যতনে যুড়িয়া দুই পাণি। ধরা লোটাইয়া পড়ে চরণ দুখানি॥
যোগী জিজ্ঞাসিল কহ সত্য সমাচার। কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহার॥
সুন্দর কহেন নিবেদন মহাশয়। কাঞ্চিদেশ ধাম গুণসিন্ধুর তনয়॥
সুন্দর আমার নাম বিদ্যা-ব্যবসাই। বিদ্যা অন্বেষণে বীরসিংহদেশে যাই॥
যোগী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে। পথপ্রাজ্ঞ নহ তুমি যাইবে কেমনে॥
পুনরপি কহে আমি পথপ্রাজ্ঞ নই। ভরসা কেবলমাত্র কালী কৃপামই॥
দনুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার॥
আরবার যোগী বলে শুনহে বালক। শিবপদ ভজ তিনি জগতপালক॥
অশুতোষ দেব দেব সৌখ্যমোক্ষদাতা। সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ত্রাতা॥
স্নান কর শুচি হও দণ্ড দুই রহ॥ কালীমন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ॥
কোপে কাঁপে কলেবর কবি কহে কটু। বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু॥
কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি। কোন গুরু কহেছেন শিব ছাড়া শক্তি॥
শৈলপুত্রী মুক্তিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী কালী। মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী॥
তোমার বাতাসে সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এত বলি অধোমুখে মৌনভাবে রয়॥
ক্ষণেক অন্তরে কবি ফিরে দেখে পাছে। ঘুচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে॥
শুনিলা শ্রবণে কবি দৈববাণী এই। মিথ্যা নহে স্বপ্নকথা সত্য সত্য সেই॥
ভয় নাই ভকত ভুবনে শীঘ্র যাবা। গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাবা॥

আনন্দসাগরে ভাসে কবি গুণধাম। সেই নিশি সেইখানে করিবা বিশ্রাম॥
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন। শ্রীদুর্গা স্মরণ করি করিলা গমন॥
কাঞ্চিপুর হইতে সহর বর্দ্ধমান। ছয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ। দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ॥
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ

(রাজধানী ও গড় বর্ণন)

প্রভাতে উদয়াদিত্য, সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত,
প্রবেশিলা বীরসিংহদেশ।
স্বচ্ছন্দ সকল লোক, নাহি রাগ দুঃখশোক,
নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ॥
দিব্য পরিচ্ছদ পরে, গান বাদ্য ঘরে ঘরে,
তিলেক নাহিক তালভঙ্গ।
বালবৃদ্ধ যুবা কিবা, এই রসে রাত্রদিবা,
রাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ॥
পরস্পর সুকৌতুক, কাব্যছাড়া একটুক,
কদাচিৎ মুখে নাহি ভাষা।
গোধনরক্ষক যারা, সঙ্কীর্ত্তন ভাষে তারা,
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা॥
পরম পবিত্র রাজ্য পরস্পর পুণ্যকার্য্য,
সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।
কল্পতরুতুল্য ভূপ, আধিপত্য নানারূপ,
দীন নাহি সে দেশে জনেক॥
চৌদিকে *চৌপাড়িময়, পাঠ্‌ চায় পড়ুয়াচয়,
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহুত বাড়ী, বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি,
আগমন বিদ্যা অভিলাষী॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই, অতিথির সীমা নাই,
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যৎ-প্রাজ্ঞ,
স্বধর্ম্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত॥
অযাচক লক্ষ লক্ষ, বাসনা সাযুজ্য-মোক্ষ,
ভক্ষণ কেবলমাত্র বায়ু।
প্রচণ্ড-প্রতাপ-ধর, জ্যোতির্ম্ময় কলেবর,
যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু॥

*চৌপাড়ি—চতুষ্পাঠী, টোল।

প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য, ঔষধ প্রয়োগে সদ্য,
ব্যাধি মুক্ত, কালেতে বিয়োগ।
ভূপতির আস্থা আছে, যাতায়াত নিত্য কাছে,
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ ॥
দেখিতে দেখিতে দূর, দেখিলেন রাজপুর,
অমরাবতীর প্রায় লাগে।
বাহিরে সহরখানা, আগে নেওয়াতির থানা,
ধমকে অমনি ভূত ভাগে ॥
থামে বান্ধা কত বাজী* ইরাণি তুরকি তাজি,
মধ্যে গাজী বসেছে সবাই।
বুকেতে ঝাম্পান ঢাল, যুগল লোচন লাল,
গোরা গায় চিক্কণ কাবাই ॥
তার আগে দড় দড়, পাঠানের চৌকী বড়,
ফাটকে আটক আঁটাআঁটি।
বিদেশীর লয় ঝাড়া, সেপাই আছয়ে খাড়া,
হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি ॥
আফিঙ্গে হামেশা মত্ত, হুঁসিয়ার দরবস্ত,
ঘুমে আঁখি কুমারের চাক।
ব্যাঘ্রতুল্য বস্যে আছে, গোলাম দাঁড়ায়ে কাছে,
গরবেতে গোঁপে দেয় পাক ॥
কিবা কহে বিজিবিজি, কত বুঝি নাও বুঝি,
বিষম মগজ সদা টেরা।
পরে বহিনা ভুরজারি, এয়সারে শশুরা গারি,
বাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড়া ॥
মগধী শোয়ার যারা, বিষম কাটাও তারা,
মহিমা অসীম পরাক্রম।
তাকাইতে একটুক, ভয়ে প্রাণ ধুকধুক,
কেবল সাক্ষাৎ তুল্য যম ॥
তুরাণি মোগলঘটা, চাঁপদাড়ী মেতীকটা,
মাথার উপরে হেঁড়ে পাগ।
পারসি আরবি কয়, কভু নাহি মৃত্যুভয় ॥
সমরে প্রখর যেন বাঘ ॥
মোল্লা মোকাদিমা কাজি, আখিল এন্সাফ রাজি,
ইয়ে হফীজকে কিয়ো আওয়াজ।

বাজী—ঘোড়া। তাজি—ঘোড়া

কোনরূপে নহে কাঁচা, দিন এমানত সাঁচা,
পাঁচ ওক্তে করয়ে নমাজ ॥
কোহি দেলমে নেহি সুজে ক্যা হোগা আখের মুঝে
কিয়া হোঁ বহুত বুরা কাম।
সাহেব জি পানা দেও, এত্নাই আরজ লেও,
পড়াহোঁ লাচার বড়া হাম ॥
তার আগে খোষখানা, নাসা রঙ্গে পক্ষী নানা,
ময়না মদনা কাকাতুয়া।
টিয়া তোতা ফরিয়াদী, কাজালা চন্দনা আদি,
হিরামন লালমন শুয়া ॥
পাহাড়িয়া যত পাখী, দেখিতে জুড়ায় আঁখি,
চূড়র উপরে আছে ঝুলি।
শিবদুর্গা শিবরাম, সদা রাধা কৃষ্ণনাম,
না পড়াতে পড়ে এই বুলি ॥
পিলখানা তার আগে, চিত্তে চমৎকার লাগে,
নীলগিরি তুল্য করিবর।
হাজার হাজার আর, ঠাঁই ঠাঁই কৃষ্ণসার,
নীলগাই বাউট বিস্তর ॥
লোহার জিঞ্জির পায়, চক্ষু পাকাইয়া চায়,
পিঁজারায় পোষা কত শের।
উল্লুক ভল্লুক মেড়া, সেয়াগোস ভৈঁস গড়া,
জোরায়র জানোয়ার ঢের ॥
*যাম্যে দামোদর নদ, গড়ভুক্ত বাঁকা নদ,
চৌদিকে বেষ্টিত বঁড় বাঁশ।
বুরুজ বিষম উচ্চ, পাহাড় তাহার তুচ্ছ,
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস ॥
তোপধ্বনি সীমা কিবা, হুড় হুড় রাত্র দিবা
নিরন্তর ভূমিকম্প তথা।
নামজাদা মালগুলা, গায় মাথা রাঙ্গা ধূলা,
বিক্রমের কত কব কথা ॥
গাছে ডানা মারে আঁটী, ধমকেতে মাটী ফাটী,
গোড়াসুদ্ধা উপাড়ে অমনি।
পিছে হটে মারে তাল, দেখিতে সাক্ষাৎ কাল,
অকালেতে জলদের ধ্বনি ॥
বাহুযুদ্ধে যুঝে ভেলা, ভূমে পড়ে করে খেলা,
সন্ধান সবাই ভাল জানে।

* যাম্যে—দক্ষিণ দিকে

পরস্পর ছিদ্র চায়, যে যারে পালোটে পায়,
হাঁ করিয়া একা চোট হানে ॥
কোটি কোটি তিরন্দাজ, যে যা বিন্ধে একান্দাজ,
রায় বাঁশে কেহ নহে টুটা।
বাঘে ও মহিষে লড়ে, ধারা বয়্যা রক্ত পড়ে,
কম কে সমান যুঝে দুটা।
সপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে, সুকবি সুন্দর ভ্রমে,
কত ঠাঁই কত চমৎকার।
কালিকার পূর্ণ দৃষ্টি, পুরী বিশ্বকর্ম্মাসৃষ্টি,
সৃষ্টিতে তুলনা নাহি যার ॥
ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ, কি কহিব সবিশেষ,
সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি।
কালী-পাদপদ্ম-তলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥

বাজার বর্ণন

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার। বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার ॥
বণিজি দোকান কত শত শত ঠাঁই। মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই ॥
বনাত* মখ্‌মল পট্টু ভুসনাই খাসা। বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা ॥
মালদই ন্‌লাটী চিক্কণ সরবন্দ*। আর আর কত কব আমির পচ্ছন্দ ॥
বিলাতি বহুত চিজ বেস কিস্মতের। খরিদার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের ॥
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই। বাজারে বেসাতি নাই রাজার দোহাই ॥
হাতির অমারি পিঠে বাঘাই কোটাল। শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল ॥
চৌগোঁফা ব্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল। সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল ॥
রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে। পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে ॥
ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র। যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র ॥
দুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম। সরদার লোকে যত করিছে শেলাম ॥
আগে ডঙ্কা সন্তরি সন্তরি চন্দ্রবাণ। বাজে দামা জগঝম্প ভেঁওরি বিষাণ ॥
হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল। ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল ॥
নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর। সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর ॥
সুন্দর হাসেন মনে থাক দিন কত। পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বনাত—পশুলোমজাত শীতবস্ত্রবিশেষ। পট্টু—পশুলোমজাত গরম কাপড়। ভুষণাই—ভুষণায় নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ মূল্যবান বস্ত্র বিশেষ। * সরবন্দ—পাগড়ী। আমারি—ছাদহীন হাওদা।

সরোবর বর্ণন

তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর। স্ফটিকে নির্ম্মিত ঘাট পরম সুন্দর॥
তীরতরু সুবর্ণ-নিবন্ধ শাখামূল। মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল॥
নিরমল জল শতদল বিকসিত। ঈষৎ পাণ্ডুর সিতাসিত রক্ত পীত॥
হংসহংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া। বিয়োগীজনার চিত্তে জন্মে মহাপীড়া॥
শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন। তত্র মনোভাব আবির্ভাব অনুক্ষণ॥
ধন্য বন্যস্থল সেই কি কহিব কথা। এককালে মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা॥
অতি চিত্র বিচিত্র শুনহ ক্রমে ক্রমে। ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে॥
ক্ষণে শীত বিপরীত কম্পমান তনু। সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু॥
বলবন্ত বসন্ত দুরন্ত অদ্‌ভুত। রতিপতি রথী পথ মলয়মরুত॥
এমত রহস্য কাম সে নিজে অনঙ্গ। ধৃত পুষ্পধনু চারু গুণচর ভৃঙ্গ॥
মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই। তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত-জই॥
অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু। গুঞ্জরে মঞ্জির রব পরভৃতবধূ॥
পুষ্করাগ্রে পুষ্কর করীতে লয় তুলি। নিকটে করিণীমুখে যাচে কুতূহলী॥
চক্রবাক চক্রবাকী খেলে চঞ্চুপুটে। খঞ্জন-খঞ্জনী-প্রেম তিলেক না টুটে॥
ক্ষণে বিষতুল্য কর সুতাশিত মহী। সুপ্ত শিখী তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
মৃগেন্দ্রে গজেন্দ্রে নিবসতি একঠাই। এমন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রমধ্যে নাই॥
কষ্টতাপে চাতকচাতকী ঊর্দ্ধে তাকে। বুঝা যায় সঠিক ফটিকজল ডাকে॥
ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব। সখি দেখি শিখী শিখি সঘনে তাণ্ডব॥
ডাহুকা ডাহুকী ডাকে ভেকের কৌতুক। প্রমদা প্রমোদ নাহি ত্যজে একটুক॥
সারস সারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান। বিষম মকরকেতু তাহে বলবান॥
উচ্চতর বিকসিত কদম্ব মঞ্জুল। বিরহিণী কামিনীজনার নেত্রশূল॥
ক্ষণে ক্ষণে গুরুতর গরজে জলদ। বিন্দুপাত নাহি মাত্র কেবল শবদ॥
প্রসাদ কহিছে কালীচরণ কমলে। বসিল বিনোদবর বকুলের তলে॥

বকুলতলায় সুন্দর দর্শনে নগর-নাগরীদিগের উক্তি

(রাগিণী বাহার, তাল যৎ)

কি মনোহর রূপপুঞ্জ সখি ঐ, তুলনা কব কি বলনা সই।
নিকটে বারেক চলনা যাই॥
কি মেরুশিখর, কিবা বিধুবর, বিবেচনা কর, কি তরুতলে।
শিখরী অচল, এ দেখি সচল, সপঙ্ক কমল, সকলে বলে॥
কেহ কহে হাসি, মনে হেন বাসি, সৌদামিনীরাশি, এমনি হবে।
আর জন কহে, যে কহ সে নহে, সৌদামিনী রহে, স্থিরতা কবে॥
কি রূপ-লাবণ্য, এ পুরুষ ধন্য, বিধি কার জন্য, গঠিল বটে।
কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, সুন্দর এ পতি, যারে লো ঘটে॥
হৃদয়মাঝারে, রাখিয়ে ইহারে, নয়ন দুয়ারে, কুলুপ দিয়া।

রূপ নহে কালো, নিরখিতে আলো, দেখ সখি আলো, আঁখি মুদিয়া ॥
কহে রামা আর, গলে পরি হার, এ হার কি ছার, ফেল গো টেনে।
আশা পুরে তবে, হেন দিন হবে, কোনদিন কবে ঘটাবে এনে ॥
কহে কোন আই, আমি যদি পাই, পলাইয়া যাই এ দেশ থেকে।
নারীকলা ফান্দে, বান্ধি নানা ছান্দে, প্রাণ বড় কান্দে, দেনা লো ডেকে ॥
কেহ কেহ আজি, ওকে করো রাজি, শেষে দিয়া বাজী না দিব ছেড়ে।
শাশুড়ি-শ্বশুর, নাহি পতি দূর, শূন্য মোর পুর, কে দিবে তেড়ে ॥
কহে কোন নারী, হয় আজ্ঞাকারী, ভুলাইতে পারি, এ গুণ আছে।
বিধবা যে গুলা, বিষম ব্যাকুলা, চক্ষে দিয়া ধূলা, লবে গো পাছে ॥
কেহ বলে চল, দাঁড়ায়ে কি ফল, হৃদয়ে বিকল, হৈয়াছি মোরা।
কামানল চয়, করিছে সঞ্চয়, তনু অপচয়, হবে গো ত্বরা ॥
তুমি মনোরথ, বুঝেস্থঝে ব্রত, আগুলিলা পথ, না পারি যেতে।
পরস্পর বলে, চরণ না চলে, আইলাম জলে, আপনা খেতে ॥
কত কুলদারা, চকোরীর পারা, নিরখিছে তারা, সে মুখশশী।
কে ভরে জলসে, ভাসায়ে কলসে, অতনুঅলসে, রহিল বসি ॥
শ্রীপ্রসাদে ভণে, পীড়া দিয়া মনে, নিজ নিকেতনে, সকলে চলো।
শুন সার কই, এ কবি বিজই, বিদ্যা হেতু ওই, এসেছে ওলো ॥ ধ্রু।

কুলের কামিনী কুঞ্জরগামিনী কি অপরূপ রূপসী।
নাভি-সরোবর, পীন পয়োধর, বদন বিমল শশী ॥
দশনমুকুতা, মৃদুহাস্যযুতা, অমিয়জড়িত ভাষা।
সুনীল উৎপল, লোচন চঞ্চল, বেসোরে ভূষিত নাসা॥
কি ভুরুভঙ্গিমা, দিঠী সুরঙ্গিমা, যোগিজন-মন হরে।
নিন্দিত অমিয়, কান্তি কমনীয়, চপলা চমকে ডরে ॥
চারু কৃশোদরী, গর্ব্ব পরিহরি, হরি বনবাসী ওই।
রম্ভাতরু উরু, অতিশয় গুরু, নিতম্ব তুলনা কই ॥
যুবতী নবোঢ়া, কত বেনে প্রৌঢ়া, স্নান হেতু চলে জলে।
যুবক সুন্দর, রূপ মনোহর, বিশ্রাম বকুল-তলে ॥
জাগত অনঙ্গ, ঘন কাঁপে অঙ্গ, কক্ষচ্যুত হেমঘট।
রূপ পানে চেয়ে, ধৈর্য্যমাথা খেয়ে, হিয়ে করে ছটফট ॥
কেহ কহে রাম, কেহ কহে কাম, কহে আর এক সতী।
রাম কাম নয়, এই মহাশয়, অমরাবতীর পতি ॥
কেহ কহে সই, নাগো আমি কই, পুরুষের কালা কানু।
ইথে নাহি বাধা, বিদ্যাবতী রাধা, এবে দোঁহে গোরাতনু ॥

মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয়

মালাকার দারা হীরা, পুষ্প দিয়া ঘরে ফিরা
যেতে পথে শুনে লোকমুখে।
তরুতলে রূপরাশি, নিরখে নিকটে আসি,
আপনা পাসরে রামা সুখে ॥
জিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর, হেদে হে পুরুষবর,
কোথা ঘর কাহার নন্দন।
মনুষ্যশরীরছলে, সহস্রাক্ষ ক্ষিতিতলে,
কিবা হবে রোহিণীরমণ ॥
অথবা মকরকেতু, বিদ্যাবতী লাভ হেতু,
গমন কারণ বিশেষ।
পূর্ব্বে পোড়াইল হর, হারাইলা পঞ্চশর
তথাপিও জয়ী সর্ব্বদেশ ॥
কিবা রূপ কি লাবণ্য, জনক তোমার ধন্য,
কত পুণ্যে জন্মে হেন পুত্র।
যে তব প্রসবস্থলী, * ভাগ্যবতী তারে বলি,
সে ধনী সমান নাহি কুত্র ॥
হাসি কহে গুণধাম, সুন্দর আমার নাম,
গুণসিন্ধু রাজার নন্দন।
কিন্তু বিদ্যা ব্যবসাই, বিদ্যা অন্বেষণে যাই,
বিদ্যা হেতু বিদেশে গমন ॥
অধিক কহিব কিবা, বিদ্যা বিদ্যা রাত্রি দিবা,
মনে মনে একান্ত ভাবনা।
সেবি বিদ্যা, বিদ্যা লাগি, হইয়াছি দেশত্যাগী,
যদি বিদ্যা পূরান্ কামনা।
বুঝিয়া বাক্যের ছল, হীরাবতী খল খল,
হাসে ভাষে বটে হে বুঝেছি।
বিদ্যায় ভকতি আছে, বিদ্যালাভ হবে পাছে,
আমি পরিচয় যে দিতেছি ॥
হীরামতি নাম ধরি, বাসে বঞ্চি একেশ্বরী,
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই।
উদর উপায় মূল, রাজকন্যা লয় ফুল,
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাঁই ॥

---

* প্রসবস্থলী—মা।

পরম রূপসী রামা, তুষ্টা শ্যামা গুণধামা,
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তার হৃদয়েশ, খ্যাত ইহা সর্ব্বদেশ,
বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ ॥
বাকি কোথা আছে কেটা, যতেক রাজার বেটা,
এসে হাসাইয়া গেল মুখ।
আগে শুনি বড় ভুর,* শেষ হয় দর্প চুর,
কিন্তু নৃপতির নাহি সুখ ॥
সে ধনী পাইবে যেই, বড় ভাগ্যবন্ত সেই,
তুলনা তাহার কার সঙ্গে।
সমুদ্রমন্থনে নিধি, উপজিল যত বিধি,
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ॥
আর শুন গুণযুত, তব নামে ভগ্নীসুত,
কহিতেঁ বড়ই ভয় বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণা কর, থাকহ আমার ঘর,
ধর্ম্মত তোমার আমি মাসী ॥
গুণরাশি কহে হাসি, ভাল গো ভাল গো মাসি,
বল মাসি বাড়ী কতদূর।
মালিনী কহিছে দূর, নহে বাপু ওই পুর,
এসো মোর বাপের ঠাকুর ॥
মালি- মহিলার সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
সে না রূপে পথে করে আলো।
কালীপাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জনে বলে,
বাসা তো মিলিয়া গেল ভালো ॥

বিদ্যার রূপ বর্ণন

সুন্দর কহেন মাসি মোর দিব্য লাগে। বিদ্যার রূপের কথা কহ শুনি আগে ॥
আগো মেয়ে একি ঠাট ঠাটে কহে হীরা। বালাই সেটের বাছা কেন দেও কিরা ॥
সে রূপের সীমা করে এত শক্তি কার। সে পারে কহিতে কিছু শত মুখ যার ॥
পৃথিবীতে বড় আর কেবা তোমা বই। না কহিলে নয় তাই যা জানি তা কই ॥
চাঁচর চিকুরজাল জলধর জিনি। শ্রুতিযুগে* পরাভব পাইল গিধিনি ॥
ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দুসুধায়। লুক্ক গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে। অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্মভোগ করে ॥
অমিয়জড়িত ভাষা নাসা তিন ফুল। বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল ॥
পুষ্পধনুধনু অণু কি ভুরুভঙ্গিমা। বাহু তুল নহে বিসে কিসের গরিমা ॥

* ভুর—সম্ভ্রম, ভারিভুরি শ্রুতিযুগ—কর্ণযুগল।

যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ। উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধু পান। ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণকুম্ভস্থান॥
কিম্বা লোমরাজিছলে বিধি বিচক্ষণ। যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন॥
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য। কেহ বলে দেবসৃষ্টি থাকিবে অবশ্য॥
সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ। বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ॥
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব। কাম-পারাবার-পার-সার-অবলম্ব॥
যদ্যপি অচিরপ্রভা* চিরস্থির হয়। তবে বুঝি তনুশোভা হয় কিবা নয়॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়। মনোভব* পরাভব লইয়া পলায়॥
কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তূণে। কতকোটি খরশর সে নয়নকোণে॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর। তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর॥
রূপবান্ বট বাপু গুণ কত ঘটে। বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে॥
হৃদয়ে সন্তোষ গুণরাশি কহে হাসি। গুণ না থাকিলে মাসি এতদূরে আসি॥
কালীপাদপদ্মেতে যদ্যপি মন রহে। অবলা বিচারে জিনা বড় কর্ম্ম নহে।
ফিরে বলে হীরে শুন পুরুষরতন। তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন।
ক্ষণেমাত্র উপনীত মালিনীনিলয়। রন্ধন ভোজন করে কবি মহাশয়॥
বিনোদ শয্যায় সুখে করিল শয়ন। পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন॥
শ্রীরামপ্রসাদ কহে কালী পদতলে। নিদ্রা ত্যজি সুন্দর উঠিলা কুতূহলে॥

অথ মালঞ্চ বৃত্তান্ত

অদূরে উদয় রবি, নিদ্রা ত্যজি উঠে কবি,
শিরসি-কমলে, দশ-শতদলে, চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছবি।
জপয়ে শ্রীদুর্গানাম, পূর্ণ হেতু মনস্কাম,
প্রাতঃস্নান করি, ধৌত ধুতি পরি, সঙ্কল্প গুণধাম॥
নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক, দেখি মনে বড় দুঃখ,
সে জন গমনে, কুসুম কাননে, বিকসিত হয় পুষ্প॥
কাঞ্চন কস্তুরী বক, অপরাজিতা চম্পক,
মালতী মল্লিকা, কুন্দ সেফালিকা, কেতকী বর্ণে কনক॥
জুতি গন্ধরাজ ফুল, নাগকেশর বকুল,
কিংশুক রঞ্জন, কদম্ব মঞ্জন, কামিনীনয়নশূল।
সুন্দর সৌরভ ছুটে, মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে,
নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ, স্মরে দহে প্রাণ, চমকিয়া হীরা উঠে॥
গতি গজ জিনি মন্দ, হৃদয় পরমানন্দ।
কোকিল কূজিত, ভ্রমর গুঞ্জিত, ফুলে পিয়ে মকরন্দ।

---

* অচিরপ্রভা—বিদ্যুৎ।
* মনোভব—কামদেব।

ভ্রমিতে কাননমাঝ, সম্মুখে যুবকরাজ,
পুটাঞ্জলিপাণি, মুখে মৃদু বাণী, কহে তব এই কাজ ॥
সামান্য পুরুষ নহ, স্বরূপে আমাকে কহ,
পূর্ণব্রহ্ম হরি, নররূপ ধরি, কি হেতু তুমি ভ্রমহ।
কত পুণ্যপুঞ্জ মম, ধন্য কেবা মম সম,
শুন মহাশয়, ধন্য মমালয়, অতিথি শ্রীনরোত্তম ॥
গুণরাশি কহে হাসি এ কথা না ভালবাসি,
হেদে শুন কই, সাপরাধি হই, তুমি গো ধর্ম্মত মাসী।
হীরাবতী মনে হাসে, সুধার সাগরে ভাসে,
শ্রীপ্রসাদ বলে, কবি কুতূহলে, চলিল মালিনীবাসে ॥

মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন

সুন্দর চলিয়া গেলা মালিনীনিলয়। পরম কৌতুকে রামা তোলে পুষ্পচয় ॥
তোলে বক চম্পক কস্তুরী সেফালিকা। জাতি জুতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা ॥
শতদল স্থলপদ্ম সূর্য্যমণি ফুল। কুন্দ জবা কৃষ্ণকলি টগর বকুল ॥
কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্ব্বজয়া। অশোক অপরাজিতা নিশিগন্ধা কেয়া ॥
সেউতি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ। কিংশুক ধাতকি ঝিণ্টি তোলে মুচকন্দ ॥
তুলিল কুসুম যত কত কব নাম। পাঁচ সাত সাজি পুরি চলে নিজ ধাম ॥
বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে। বাসনা বলিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে ॥
ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া। ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া ॥
কটির কাপড় গাণ্টি* কতবার খোলে। ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাই তোলে ॥
হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে। কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে ॥
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার। বিশেষত নীচজাতি নীচ ব্যবহার ॥
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি। গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মাসী ॥
প্রমথপতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে। এতবলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে ॥
আমি আজি গাঁথি মালা তোমার বদলে। দেখদেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে ॥
ভাল বাপু বলিয়া আঁচলে বান্ধে তঙ্কা। হাটে যায় মালিনী সংপ্রতি ঘুচে শঙ্কা ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার। বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার ॥

সুন্দরের মাল্য গ্রন্থন

বিনা সুত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার।
কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চমৎকার ॥
জবা বক, সুচম্পক, কুন্দ সেফালিকা।
জাতিফুল, ও বকুল, মালতী মল্লিকা ॥
গাঁথে বীর, করবীর, অশোক কিংশুক।
বাছি লয়, পুষ্পচয়, পরম কৌতুক ॥

* গাণ্টি—গেঁড়ো।

পদ্ম সঙ্গে, গাঁথে রঙ্গে, স্থলপদ্ম ভালো ॥
মাঝে মাঝে, গন্ধরাজে আরো করে আলো ॥
সমভাগ, গাঁথে নাগ কেশর ধাতকী।
সর্ব্বশেষ, গাঁথে বেশ কুসুম কেতকী ॥
তুলা নাই কোন ঠাঁই, একি অসম্ভব।
মুষ্টিমাত্র কাঁপে গাত্র জন্মে মনোভব ॥
কহে রাম, মনস্কাম, পূর্ণ কর কালী ॥
নৃপবালা, পাবে জ্বালা, এ গাঁথনী ভালী ॥

কবির মাল্যসংক্রান্ত পরিচয় লিখন

যতনে লইয়া কবি ফুল্ল সরসিজ। প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ ॥
গুণসিন্ধু মহারাজা গুণের গরিমা। প্রবল প্রতাপ ধীর কি কব মহিমা ॥
নির্ম্মল সুযশ দশদিক্ করে আলো। সেই অভিমানে চন্দ্র অন্তরেতে কালো ॥
সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযুক্ত রবি। উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি ॥
ক্রমে সব তেজ প্রকাশিল নানারূপে। তথাপিও কদাচ সমতা নহে ভূপে ॥
হ্রী পাইয়া হ্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়। ভাস্কর ভাস্কর করে প্রদোষ সময় ॥
রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র। নৃপ-রত্নাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র ॥
অধিকন্তু দোহে অপেয় সে নীর। ক্ষণজন্মা ক্ষিতিপতি নির্দ্দোষ শরীর ॥
কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে। চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নহে ॥
বিস্তারিয়া বার্ত্তা কি বদনে যায় কহা। ক্ষমাগুণে সমা নন যিনি সর্ব্বসহা ॥
সেই মহাশয় পিতা কাঞ্চীপুর ধাম। শঙ্করীর কিঙ্কর সুন্দর কবি নাম ॥
শ্রুত মাত্র পণপ্রাণ হেতু সে তোমার। প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ সকল আমার ॥
কর্ণ কহে প্রথমে জন্মিল মম সুখ। চক্ষু কহে দর্শন কর্ত্তব্য বিধুমুখ ॥
কাতর রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা। বাসনা বড়ই বিধু-বদনের সুধা ॥
নাসা কহে পদ্মিনী সে তদঙ্গ-সুঘ্রাণ। প্রাপ্তমাত্র যাবতীয় দুঃখ পরিত্রাণ ॥
বিকলে সকলে সাক্ষী করে কহে বাহু। তনু হেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছা বহু ॥
মন কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি। তোমরা পশ্চাতে রহ হই অগ্রগামী ॥
দেহরাজ্যে রাজা সেই কমলিনী শুন। রহিল নিকটে তব না বাহুড়ে* পুন ॥
নপুংসক মন তবু সুখে করে ক্রীড়া। পাণিনি ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া* ॥
কি গুণে বন্দিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্যা। অবিচার কর কেন তুমি রাজকন্যা ॥
সাজির ভিতরে রাখে সাজাইয়া হার। প্রসাদ কহিছে বালা যায় কোথা আর ॥

মালিনীর হাট পরিচয়

হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে। কোঁথাইয়া বসিল কবির বরাবরে ॥
হারামের হাড় মাগী কথা কহে ঠাটে। মাটি খেয়ে বাপু আজি গিয়াছিনু হাটে ॥

* বাহুড়ে—ফিরে। * ব্রীড়া—লজ্জা।

প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা। টঙ্কারিরা হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা॥
ছটা ছিল গরশাল* ছটা ছিল মেকি*। হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি॥
বাটাবাদে পাইলাম আড়কাট নয়। কিনিতে বণিকদ্রব্য থোকে* গেল ছয়॥
তবে বাপু বাকী তিন টাকা থাকে। মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে॥
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি। দু'টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥
এক টাকা সবে মাত্র রহে অবশেষ। কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ॥
উপহার দ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই। হাতকর্জ্জা* লইলাম তেলিনীর ঠাঁই॥
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত। খুচরার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥
স্নান করি খাইদাই লেখা দিব শেষে। উচক্কা* সময় এত মনে নাহি এসে॥
পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই। প্রত্যয় না হয় বল গঙ্গাজল ছুঁই॥
টাকা সিকা কোন বস্তু কতকাল খাব। বিশ্বাসঘাতকি করে নরকেতে যাব॥
পূর্ব্বজন্ম পাপে এত পরিতাপ পাই। দুকুলে এমন নাহি তার মুখ চাই॥
বিধি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন। চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন।
এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা*। কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা॥
পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা। ফাঁকি দিয়া চাকি* ভুক্তে গায় করে ফিরা॥
সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর। চাতুরী করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর॥
কবি বলে মরি পাইয়াছ বড় দুখ। স্নানে যাও মাথা খাও শুকায়েছে মুখ॥
হীরা বলে আরে বাছা স্নানে যাব কি। না জানি কি করে মোরে নৃপতির ঝি॥
বিষাদ ভাবিয়া হীরা করে লয় সাজি। প্রসাদ কহিছে কালি রক্ষা কর আজি॥

পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন

মনে বড় ভয়, না জানি কি হয়, গগনে উঠেছে বেলা।
বীরসিংহ-সুতা, আছে কোপযুতা, কহিবে করিল হেলা॥
যা করেন শিবা, আর চারা কিবা, না গেলে এড়ান নাই।
দাঁড়াইল এই, ত্বরা করি সেই, চলিল বিদ্যার ঠাঁই॥
দাঁড়াইল আগে, সতী কহে রাগে, হেদে বা কোথায় ছিলা।
সকল যোগান, করি সমাধান, কি ভাগ্য যে দেখা দিলা॥
ভুলিলা সে কাল, এবে ঠাকুরাল, গরবে উলয়ে গা।
কানে দোলে গেঁটে, পথে যাও হেঁটে, ঠাহরে না পড়ে পা॥

---

* গরশাল—ভিন্ন বছরের (not of the year)। মেকি—নকল, জাল।
* বাটা—Discount/দরের তারতম্যহেতু যা ধরাট দিতে হয়।
* আড়কাট—আর্কট মুদ্রা। ইউরোপীয় বণিকদের বিশেষভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দক্ষিণ ভারতের টাকশালে নির্মিত রৌপ্যমুদ্রা। পলাশীর যুদ্ধের আগে নবাবী আমলে নবাবদের টাকশালে তৈরী দিল্লীর বাদশাহের নামাঙ্কিত 'শিক্কা' টাকাই ছিল বাংলার প্রধান মুদ্রা, কিন্তু এদেশে আর্কটও চলতো এবং শিক্কার সঙ্গে আর্কটের সাধারণ বিনিময় হার ছিল ১০০ শিক্কা = ১০৮ আর্কট মুদ্রা।
* থোক—মোট। * হাতকর্জ্জা—হাত খরচের জন্য ধার। * সিকা—শিক্কা মুদ্রা।
* উচক্কা—হঠাৎ, এখানে অসময়। * টুটা—ভাঙ্গা, কম। * চাকি—মুদ্রা বা টাকা।

তোরে বৃথা কই, নিজে ভাল নই, এ পাপ চক্ষের লাজ।
নতুবা ইহার, জানি প্রতিকার, যেমন তোমার কাজ॥
ভূমে সাজি রাখি, ছল ছল আঁখি, কৃতাঞ্জলি হীরা কহে।
রুষ্ট নবগ্রহ, বচন নিগ্রহ, বিগ্রহ আমার দহে॥
ছিল উপরোধ, ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ, এত কি উচিত তব।
বটি নিজ দাসী, চিত্তে এই বাসি, ক্ষমহ বাড়া কি কব॥
এতেক বলিয়া, চলিল কাঁদিয়া, হীরা ফিরে যায় ঘরে।
কালীপদতলে, শ্রীপ্রসাদ বলে, ত্রাহি মা নিজ কিঙ্করে॥

মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা

স্নান করি বিধুমুখী, হৃদয়ে পরম সুখী
পূজে ইষ্টদেবতা শারদা।
চিকণ গাঁথনি ফুল, অতিশয় চিন্তাকুল,
অনিমিখে নিরখে প্রমদা॥
দেখিয়া পুষ্পের হার, পূজা করে কেবা কার,
ধ্যানজ্ঞান দুই গেল দূরে।
কাছে ডাকি সুলোচনা, পাতি পড়ে বিচক্ষণা,
অব্যাজে* যুগল আঁখি ঝুরে*॥
মনেতে জানিল এই, পুরুষ রতন সেই,
দরশন পাইব কিরূপে।
তিলেক বৎসর প্রায়, বুক ফেটে জিউ যায়,
সখি প্রতি কহে চুপে চুপে॥
হেদে কি হইল সই, দেখদেখি হীরা কই,
ফিরা আমি পায় ধরি তার।
যদি ক্ষমা করে রোষ, এতে কিছু নাহি দোষ,
শুনি গো সকল সমাচার॥
কারে ঘরে দিলা ঠাঁই, বুঝি বা তেমন নাই,
বিদ্যাধর ধরণীমণ্ডলে।
বিরহিণী দেখি আমা, প্রসন্না হইল শ্যামা,
বিধু মিলাইলা করতলে॥
সখী কয় ধৈর্য্য হও, আজিকার দিন রও,
প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা।
এতই কেন উন্মত্ত, মিলিবে সকল তত্ত্ব,
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা॥
বিদ্যা বলে বল বটে, এখনি প্রমাদ ঘটে,
আজি সে বাঁচিবে হৈবে কালি।

---

* অব্যাজে—অবিলম্বে। * ঝুরে—ঝরে পড়ে।

হের কণ্ঠাগত প্রাণ, ঝাঁট কর পরিত্রাণ,
সব শেষে যত দাও গালি ॥
বুঝি হারা পুন তারা, কহে সারা হও পারা,
বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে।
রাণীঠাকুরাণী যথা, যাই তথা সব কথা,
নিবেদন করি তাঁর কাছে ॥
ভয় দর্শাইয়া নানা, জনে জনে করে মানা,
কষ্টে স্বষ্টে শান্তাইয়া রাখে।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে, জলনিধি উথলিলে,
বালির বন্ধনে কোথা থাকে ॥

মালিনীর প্রত বিদ্যার অনুনয়

যথোচিত মনোভঙ্গ, দুঃখানলে দহে অঙ্গ,
হীরাবতী ভবনে চলিল।
সুকবি সুন্দরবরে, পাছ দিয়া ঢোকে ঘরে,
অনশনে রজনী বঞ্চিল ॥
কুহরে কোকিলকুল, ফুটে বনে নানা ফুল
তুলি গাঁথে মনোহর মালা।
নৃপতি-নন্দিনী যথা, লঘুগতি চলে তথা,
বলে লও নৃপতির বালা ॥
রাখি হার পরিহার, করে করে ধরি তার,
বলে বিদ্যা বচন মধুর।
কন্যা প্রতি কর কোপ, বুড়ী নও বুদ্ধিলোপ,
মমতা সকল গেল দূর ॥
আদ্যোপান্ত এই ধারা, ক্রোধে হই জ্ঞানহারা,
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে।
অন্য কে ডরান পিতা, ততোধিক মাতা ভীতা,
জাননা গো তুমি কি আমাকে ॥
সহস্র মাথার কিরা, ওগো হীরা চাও ফিরা,
বুক চিরা হৃদে থুই তোরে।
যে কহি সে কথা মান, পুরুষরতন আন,
দুঃখে পরিত্রাণ কর মোরে ॥
হীরা কহে করি ছল, ভাল পাইলাম ফল,
বাকী বল আর কিবা আছে।
মরি শোকে নিত্য মোকে, হাসে লোকে কহে তোকে,
বিদ্যা বিনোদিনী ডাকে কাছে ॥

তুমি মান্যা রাজকন্যা, বট ধন্যা এত অন্যা-
সনে করিয়াছ কিবা কাজ।
রসময়ই শুন কই, যুবা নই বৃদ্ধ হই,
একা রই আই মা কি লাজ ॥
এতোকাল আছি নিষ্ঠা, দেখ মিথ্যা অপ্রতিষ্ঠা,
কহ কি শুনিলা কার ঠাঁই।
ক্ষমা কর ঠাকুরাণী, ভব্যতা তোমার জানি,
নির্লজ্জ আমার পর নাই ॥
পুনঃ রামা কহে ভাষ, ছাড় হীরা পরিহাস,
তোমার চিহ্নিত আমি বটি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে, মিথ্যা নহে, দেহ দহে,
বিদ্যার ধরেছে ছটফটি ॥

মালিনী ও বিদ্যার পরস্পর কথোপকথন

একান্ত কাতরা বুঝি বিদ্যা বিনোদিনী। কহে হীরাবতী হাসি শুন কমলিনী ॥
জন্মে জন্মে নানা পুণ্যপুঞ্জ তব ছিল। সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল ॥
দৃষ্ট নহে শ্রুত নহে রূপ হেনরূপ। গুণসিন্ধু-সুত গুণসিন্ধুর স্বরূপ ॥
কাঞ্চীনাম দেশ ধাম সুধাময় হাস্য। সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মসুন্দরাস্য ॥
বদনে বিরাজে বাণী বিদ্বান্ বিপুল। পঞ্চবক্ত্র পদ্মযোনি প্রায় সমতুল ॥
দৃষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি। বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী ॥
অপরূপ কথা এই কে শুনেছে কবে। ফুটিল মালঞ্চ শুষ্ক যার অনুভবে ॥
বিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কাজ। স্নানছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ ॥
এ দুঃখসাগরে হীরা তুমি এক তরী। হের দাঁতে করি কুটা দুটা পায়ে ধরি
ইহা বলি ছিঁড়িয়া দিলেন গলহার। হীরা কহে ঘটকের পাছে পুরস্কার ॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

মালিনীর সুন্দরনিকটে বিদ্যার বার্ত্তা কথন

হার দিলা নৃপসুতা, হীরাবতী হাস্যযুতা,
হৃষ্টমতি শীঘ্রগতি চলে।
যথা কবি গুণরাশি, আসি হাসি কহে বসি,
তব জন্ম ধন্য ধরাতলে ॥
হীরা কহে শুন শুন, যে করেছি নিবেদন,
তার সাক্ষী হাতে হাতে এই।
জনে করে বহু যত্ন, কোনরূপে মিলি রত্ন,
রত্নজনে যত্ন করে সেই ॥

সে ধনী রতন বটে, যতনে পুরুষ ঘটে,
তার ইচ্ছা তুমি হও কান্ত।
চিত্তে বিবেচনা কর, ভাগ্য কি ইহার পর,
শিব-শিবা সদয় নিতান্ত ॥
তব পত্র পাবামাত্র, শিহরিল সর্ব্বগাত্র,
চেতনা রহিত পড়ে মহি।
সখী ডাকে পরিত্রাহি, রামা করে আইঢাহি,
মরমে দংশিল কাম-অহি ॥
ক্ষণেকে ক্ষণেকে জ্ঞান, কহে দহে মোর প্রাণ,
পরিত্রাণ কর মোরে সই।
বিলম্ব বিহিত নয়, না জানি কি পরে হয়,
ফিরাও ফিরাও হীরা কই ॥
আমারে কহিল মন্দ, চিত্তে বড় নিরানন্দ,
প্রভাতে গেলাম তার কাছে।
বিনয় করিল যত, এক মুখে কব কত,
তাহা কি সকল মনে আছে ॥
দশনে লইয়া কুটা, যত্নে ধরে হাত দুটা,
পুনঃ পুনঃ বলে মাথা খাও।
স্নানছলে সরোবরে, সুপুরুষ গুণধরে,
যাও যাও বারেক দেখাও ॥
হীরাবতী যত ভাষে, সুকবি সুন্দর হাসে,
হাতে পায় আকাশের ইন্দু।
কালী পাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
তারিণী তরাও ভবসিন্ধু ॥

বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শন

সুপুরুষ সুন্দর সুধীর ধীরে ধীরে। মিলিল সঙ্কেত সেই সরোবর-তীরে ॥
বিদ্যা বিনোদিনী বসি বাতায়ন-তলে। বিদগ্ধ বিনোদ চলে বকুলের তলে ॥
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকন। দৃষ্টি শর পরস্পর জরজর মন ॥
মোহিতা মহীতে পড়ে মহীপাল-বালা। শান্তি নাই বিষম কুসুম-শর-জ্বালা ॥
উথলে বিরহ-সিন্ধু ভাঙ্গে শান্তিসেতু। মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু ॥
কলেবর কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে। বিদ্যার বাসনা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥
সতী কহে কাম-অহি দংশিল মরমে। লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাণ সরমে ॥
নিকটে দশম দশা* চেষ্টা কর সই। কোথা সেই সোঝা ওঝা ধন্বন্তরি কই ॥
সখা কহে সুবদনী সাবধান হও। হীরা ডেকে কিরা দিয়া ফিরা তত্ত্ব লও ॥

* দশম দশা—দশ প্রকার কামজ দশা হল—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মরণ। এখানে মরণ দশা।

সহসা এমত কার্য্য তুমি ত অভব্যা। যদ্যপি পণ্ডিতা হও তথাপিও নব্যা॥
বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত জগতে। পরাস্ত নহিলে বল বরিবা কি মত॥
ভূপতিকে জানাও আনাও বন্ধুচয়। পশ্চাৎ যাহাতে লাজ কাজ ভাল নয়।
বন-মত্ত-হস্তী মন দুষ্টাচারী বড়। ক্ষমাঙ্কুশক্ষেপে কর কুম্ভে দড়বড়॥
রসময়ই কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত। স্মরশরে ভেদ তনু নহেক যাবত॥
ক্ষমাঙ্কুশ খোয়া গেল অনঙ্গ-অলসে। মনমত্ত বারণ বারণ হবে কিসে॥
কান্ততনু এ কান্ত একান্ত মোর বটে। আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে॥
সুন্দর স্বরূপ রূপ ভূপসুত কই। যত্নে রত্ন মিলাইলা কালী কৃপাময়ই॥
দেবীপুত্র দীপ্তিমানা মহাজন এই। এজনে যে কহে মূর্খ মহামূর্খ সেই॥
সুন্দর লইয়া কিছু শুন বিবরণ। রূপস রূপসী-রূপ করে নিরীক্ষণ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ঘনায়েছে দিন। মিলিবে সুন্দর বর সকলে প্রবীণ॥

সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি

সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি। দড়দড় কি কব কহ কি শুনে আলি*॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখকমলজ। কি রূপ কি রূপ করি কৈল কমলজ॥
তনু তনু চিন্তায় কেমনে জ্বালা সই। জীবন জীবনমধ্যে ত্যজি মেনে সই॥
মন্দ মন্দগ্রহ মোর বুঝেছি একান্ত। কালী কালী দিলা মনে না দিলা এ কান্ত॥
বারণ বারণমন কদাচ না মানে। ক্ষপা* ক্ষপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে॥
সর্ব্বা সর্ব্বকাল পূজি পীড়া এই ধারা। নিত্যা নিত্যাবধি দিলা দুনয়নে ধারা॥
তারা তারাপদে যদি মিলাইয়া করে। ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে॥
হর হরবধূ দুঃখ তনয় প্রসাদে। বিদ্যা বিদ্যা কবিবরে করহ প্রসাদে॥

বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ

কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে।
প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥
মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন, শশহীন* শশী।
আস্যবর, হাস্যোদর, বিম্বাধর রাশি॥
নাসাতুল, তিলফুল, চিন্তাকুল ঈশ।
বাক্যসৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি, লোলদৃষ্টি বিষ॥
দন্তাবলী, শিশু অলি, কুন্দকলি মাঝে।
ভুরু অনু, কামধনু, হেমতনু সাজে॥
নীলগিরি, শুকপুরি, তনুপরি ভৃঙ্গ।
মঞ্জুরব, মনোভব, মহোৎসব রঙ্গ॥
নৃপসুত, মোহযুত, এ অদ্ভুত দেখি।
কহে রাম, অনুপাম, গুণধাম একি॥

---

* আলি—সখি। * ক্ষপা—রাত্রি।
* শশহীন—শশকচিহ্নবিহীন। শশক বা খরগোস চিহ্নযুক্ত কল্পনা করে চাঁদের একটি নাম শশধর।

বিদ্যা কর্তৃক ভগবতীর স্তব

বিদ্যা রূপবতী সতী, কৃতাঞ্জলি শুদ্ধমতি,
কায়মনোবাক্যে করে স্তব।
তুমি নিত্যা পরাৎপরা, জন্ম জরা মৃত্যু হরা,
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব॥
তুমি জল তুমি স্থল, ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল,
তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী।
তুমি কুলাচল* সিন্ধু, তুমি রবি তুমি ইন্দু,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী॥
তুমি শান্তি পুষ্টি সুধা, তুমি লজ্জা তুমি মেধা,
মহামায়া করালরূপিণী।
শক্তিরূপা সর্ব্বভূতে, বিহরসি* শৈলসুতে,
কুণ্ডলিনী* চক্রবিভেদিনী*॥
ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ, রূপিণী লিখন কন্দ,
স্থূলসূক্ষ্মা ধরণী-ধারিণী।
অপর্ণা উভয়া উমা, ভবানী ভৈরবী ভীমা,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী॥
কৃপা কর কৃপাময়ি, কেহ নাহি তোমা বই,
শঙ্করী কিঙ্করী তব ডাকে।
সুন্দর সুন্দরতনু, অভিন্ন কুসুমধনু,
সেই পতি দেহি মা আমাকে॥
একান্ত কাতরা বিদ্যা, তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্যা,
পড়িলা প্রসাদ জবাফুল।
শ্রবণে শুনিলে এই, তোমার হৃদেশ সেই,
আজি নিশি সকল প্রতুল॥
পুলকিতা পঙ্কজিনী, হাসি কহে মৃদু বাণী,
কর সখি উচিত যে কাজ।
ভাগ্যের নাহিক লেখা, নিশি যোগে হবে দেখা,
ভেটিবে* সুন্দর যুবরাজ॥

---

* কুলাচল—কুলপর্বত। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষবান্‌, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র—এই সাতটি কুলপর্বত। মতান্তরে হিমালয় সহ আটটি কুলপর্বত।
* বিহরসি—অবস্থান কর। * কুণ্ডলিনী—মূলাধারচক্রের নীচে নিদ্রিতা সর্পাকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে অবস্থাননিরতা শক্তি (তন্ত্রমতে)।
* চক্রবিভেদিনী—যোগীর সাধনায় জাগ্রতা শক্তি মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামে ছটি পদ্ম বা চক্র ভেদ করে সহস্রারে উপনীত হন।
* ভেটিবে—সাক্ষাৎ করবে।

বিদ্যার মনের কথা, বুঝি সখিচয় তথা,
কৌতুকে করয়ে চারুবেশ।
কালীপাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
দূর কর নিজ সুত ক্লেশ ॥

বিদ্যার বাসর সজ্জা

সুন্দরীর সহচরী ভাল জানে চর্য্যা। রতন মন্দিরে করে মনোহর শয্যা ॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুইপাশে। রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে ॥
বড় এক গিরদা* শিয়রে সখা রাখে। এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে ॥
ঢৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকণ মশারি। ভৃঙ্গারে* পূরিতে রাখে সুবাসিত বারি ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা* মনোহরা। সরভাজা নিখুঁতি বাতাসা রসকরা ॥
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা। ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা ॥
সাজাইল বাটাতে কর্পূর সাঁচি বিড়া। ভক্ষণে যুবকজনা সুখে করে ক্রীড়া ॥
কৌটা ভরা ছাঁকা চূণ কর্পূরের সঙ্গ। এলাইচ জায়ফল* জইত্রি লবঙ্গ ॥
কালাগুরু মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তুরী। সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী ॥
মল্লিকা মালতীমালা সুবর্ণের পাত্রে। যুবক যুবতী দেহ দহে ঘ্রাণমাত্রে ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কবির ভগবতীর স্তব

এথা কবিবর, সুন্দর সুন্দর, নিরখি নৃপজারূপ।
ভাবে গদগদ, নাহি চলে পদ, শর হানে স্মর ভূপ॥
কহ উপদেশ, কিরূপে প্রবেশ, হব বিদ্যাবতী বাসে।
দুরন্ত প্রহরী, দিবা বিভাবরী, জাগে তনু কাঁপে ত্রাসে ॥
নমো ভগবতি, কিবা জানি স্তুতি, প্রধানা প্রকৃতি কালী।
শ্মশানবাসিনী, দনুজনাশিনী, মুণ্ডমালী মা করালী ॥
ত্রৈলোক্যবন্দিনী, ভূধরনন্দিনী, অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মাতা।
সকল সিদ্ধিদা, গিরিশ-প্রমদা, তুমি হরি হর ধাতা ॥
স্তব করে কবি, পরিতুষ্টা দেবী, পুনরপি আজ্ঞা হয়।
ভয় নাহি বচ্ছ*, ইহা কোন তুচ্ছ, সুখে কর পরিণয় ॥
অপরূপ কথা, অকস্মাৎ তথা, হইল সুড়ঙ্গপথ।
প্রসাদের বাণী, ভক্তের ভবানী, পুরাইলা মনোরথ ॥

---

* গিরদা—বড় গোলবালিশ। * ভৃঙ্গারে—জলপাত্র বিশেষ।
* মণ্ডা—মনোহরা, সরভাজা, নিখুতি, রসকরা, এলাইচদানা-মিষ্টান্নাদির নাম।
* জায়ফল—হরিতকী জাতীয় জাতিনামক ফল।
* যামার্দ্ধে—অর্ধপ্রহর অন্তে। এক অহোরাত্রের এক অষ্টমাংস এক প্রহর।
* বচ্ছ—বৎস।

কবির সুঙ্গড়পথে গমনোদ্যোগ

বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট। হ্রীরূপিণী* হ্রীরাখিনী হৃদয়েতে হৃষ্ট॥
নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে। চন্দনে চর্চ্চিত চারু চামীকর* অঙ্গে॥
কম্বুকণ্ঠে* কলিত* কাঞ্চন কণ্ঠমাল। মস্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-মিসাল॥
মোহন মুকুরে মঞ্জুমুখ নিরখিয়া। উথলে অমিয়াসিন্ধু উল্লাসিত হিয়া॥
যামিনী যামার্দ্ধে যাত্রা জায়া হেতু কবি। আলো করে আঁধারে আপন অঙ্গচ্ছবি॥
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে। চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন

ধন্য সে যামিনী মধু, কুহুরে কোকিলবধু,
পূর্ণ বিধু উদয় গগনে।
মত্ত মধুকরবৃন্দ, ফুল পিয়ে মকরন্দ,
মুখরিত কুসুমকাননে॥
গগনেতে মেঘ দেখি, আনন্দ-অপার শিখী,
মন্দ মন্দ মলয় সমীর।
সুচারু কুসুম ঘ্রাণ, স্মরশরে দহে প্রাণ,
বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্থির॥
রসময়ি কহে সই, কহ সে নাগর কই,
তাহা বই মনে নাহি ভায়।
নাহি সুখ একটুক, মহাদুঃখ ফাটে বুক,
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যায়॥
এই যুক্তি করে বসি, শারদ-পূর্ণিমা-শশী,
হেনকালে উপস্থিত কবি।
রূপ তুল্য বটে নাম মহাকবি গুণধাম,
প্রচণ্ড প্রতাপে যেন রবি॥
সব-সখী-সম্বলিতা, চন্দ্রমুখী চমকিতা,
নিরখই চঞ্চল নয়নে।
কিঙ্করী যোগায় বারি, পদযুগ ধৌত করি,
বসিলা রতন-সিংহাসনে॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।

* হ্রীরূপিনী—লজ্জারূপিনী। * চামীকর—স্বর্ণ। * কম্বুকণ্ঠে—শঙ্খসদৃশ কণ্ঠে।
* কলিত—আহৃত।

দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥
সেই বংশসমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার

কামদেব-ব্যাধ তুল্য কুমার সুন্দর। ভুরু ছলে ধৃত ধনু দৃষ্টি খরশর ॥
কিঞ্চিৎ সন্ধানে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ। কি আর করিবে বিদ্যা বিদ্যার প্রসঙ্গ ॥
জ্ঞানহারা গোমধ্যা* গোযুগে* জল ঝরে। ধূলায় ধূসর ধড় ধড়ফড় করে ॥
চমকিতা চঞ্চলাক্ষী চেতনা জন্মিল। সলজ্জিতা শশিমুখী সম্ভ্রমে বসিল ॥
ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে। হেনকালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকে ॥
হাস্যযুতা সখী প্রতি কহে কমলিনী। সুলোচনা সুধাও কিসের রব শুনি ॥
ভাব বুঝি গুণরাশি মন্দ মন্দ হাসে। অমিয়াসদৃশ শ্লোক অস্ত্যোত্তর ভাষে ॥

শ্লোক

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদের গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ ॥**

অস্যার্থ

হে গোমধ্যমধ্যে বাল-কুরঙ্গলোচনি। সহস্রগোভূষণ-কিঙ্কর নাদ শুনি ॥
গোভৃতশিখরে* মত্ত পরম উৎসব। *গোকর্ণ-শরীর-ভক্ষ করয়ে তাণ্ডব ॥
সখী সম্বোধিয়া কহে বুঝা নাহি যায়। পুনরপি হাসি কহে সুবিদগ্ধ রায় ॥

---

* গোমধ্যা—ইন্দ্রিয় মধ্যে। গোযুগে—চক্ষুযুগলে।

** শ্লোকটি কৃষ্ণরাম দাস ও ভারতচন্দ্রে আছে।

* গোভৃৎশিখরে—পর্বতশিখরে। গোকর্ণ—সর্প।

শ্লোক

স্বযোনি ভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ ॥**

অন্যার্থ

স্বযোনিভক্ষকধ্বজ তাহাতে উৎপত্তি। তার নাদে উন্মত্ত গিরিমধ্যে স্থিতি ॥
তিমিরারি বিম্ব-প্রতিবিম্বধারী যেই। পবন ভক্ষ্যের ভক্ষ্য ঘন ডাকে সেই ॥
চমৎকার কথা শুনি বটে গুণধাম। পুনরপি হে সখি সুধাও দেখি নাম।
কৃতাঞ্জলি সহচরী কহে পুনর্ব্বার। কহ শুনি মহাশয় কি নাম তোমার ॥

শ্লোক

বসুধা বসুনা লোভে বন্দতে মন্দজাতিজম্
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্ ॥***

অন্যার্থ

বসুহেতু সুমূর্খ মানব গুণযুত। বন্দয়ে মন্দ যে জাতি লোভে অনুগত ॥
করভোরু* রতি প্রজ্ঞে তিষ্ঠ মন্দ যাম। চিন্তাকর দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নাল ॥
এক বস্তু তিন কিন্তু একে তিন লাভ। কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব ॥
আদ্য অন্তে যেটা সেটা কামনা সদাই। আদ্য অন্তে পাঠে তুল্য কৃপালেশ পাই ॥
চারি মধ্যে সুবিখ্যাত বর্ণচারি সার। আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ সুপ্রচার ॥
কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার। বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে আছ যার ॥
হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাম আমি। সুপুরুষ সুন্দর সুধীর সত্য স্বামী ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ

মাস মধু ডাকে মধুকরবধূচয়। কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয় ॥
সুশীতল সময় মলয় মন্দ বহে। স্মর হানে খরশর ভর কত সহে ॥
পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ-বালা। স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে সমর্পিলা মালা ॥
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার ॥
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন। বিদ্যালাপছলে বুঝি পড়িলা বচন ॥
উলু দিছে ঘনঘন পিকসীমন্তিনী। নয়নচকোরী সুখে নাচিছে নাচনী ॥
বরযাত্র মলয়পবন বিধুবর। মধুকর নিকর হইল বাদ্যকর ॥
কান্তাকুচে জলদগ্নি বিচারিয়া কবি। করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি ॥

---

* বসু—ধন। করভোরু—হস্তীশাবকের ন্যায় উরুবিশিষ্ট।
** শ্লোকটি কৃষ্ণরাম দাস ও ভারতচন্দ্রে আছে।
*** শ্লোকটি কৃষ্ণরাম দাসে আছে ভারতচন্দ্রে নাই।

উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর। পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর ॥
যুগল নিতম্ব উরু জালালি ফকির। বিজাতীয় শব্দ করে কাঁপায়ে মঞ্জীর ॥
নূপুর কিঙ্কিণী জালে নানা শব্দ হয়। দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দনসময় ॥
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার। কামনার করুণা ভাটের রায়বার ॥*
সস্ত্রীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক। দম্পতিকে পঞ্চশর দিলেকযৌতুক ॥
দম্পাতকে তুষ্ট হয়ে দম্পতি চলিল। দাক্ষণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল ॥
পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ-বালা। স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে আরোপিলা মালা ॥
শুভক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতূহলি। সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলি ॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার। সুধার সাগরে ভাসে তনু দোঁহাকার ॥
সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে। সুন্দর সিন্দূর দিলা সু দরীর মাথে ॥
এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে। আড়ালে আসিয়া আলি আড়ি পাতি কহে ॥
নানা উপহার কবি করিয়া ভোজন। কর্পূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন ॥
সুশীতল মরুত মলয় মন্দ বহে। স্মর হানে খরশর ভর কত সহে ॥
রূপস-রূপসা নিশিশেষে নিদ্রা যায়। প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায় ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয়

রমণী মণি নাগররাজ কবি। রতিনাথ বিনিন্দ্রিত চারুছবি ॥
ধনি-মুখ-চিবুক ধরে যতনে। মুখ চুম্বিত সুন্দর হৃষ্ট মনে ॥
নাগরী রসিকা রসিক প্রবীণা। যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা ॥
কুচপদ্মকলি করপদ্মে ধরে। তনু রোমাঞ্চিত রসরঙ্গ ভরে ॥
চমকি চমকি কহে কি করহে। নখ-ঘাতন-যাতন খেদ কহে ॥
যুবরাজ এ কায তোমার নহে। নহি ধীরে এ *বক্ত্র নহে পিবহে ॥
দশনে জ্বলিছে সহেনা সহেনা। পুন তো প্রাণ তো রহে না রহে না ॥
বঁধু জীবন জীবন দান কর। গুণরাশি এ দাসীর বাক্য ধর ॥
রসকাল নহে হও কাল কেন। দেহ মর্ম্মপীড়া ছি ছি কর্ম্ম হেন ॥
লাজ না বাস কি হাস বুক ফাটে। কি করে পিরীতে এ রীতে না আঁটে ॥
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশান্তপনা। প্রাণবল্লভ দুর্লভ সুল্লভনা ॥
কহ যে সহজে নহে যে সে ধারা। এহি কায অকায কুকায করা।
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে। হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুনহে ॥
এ কি সাধ কি সাধহ বাধ কহি। ভাব যেরূপ সেরূপ কিন্তু নহি ॥
প্রভু মত্তকরী আমি পঙ্কজিনী। করি শৃঙ্গার যোগ্য বটে করিণী ॥
একবার প্রকার রূপে তরিলে। হবে না হবে না হবে না মরিলে ॥
শুন আলি ত কালি কুগালি দিবে। প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে ॥
মরি হে মরি হে ধরিহে চরণে। রমণে এমনে জানিহে কেমনে ॥

* রায়বার—স্তুতিগান অথবা দৌত্য। বক্ত্র—

রসিকঃ সুজনঃ প্রভুহে চতুর। মরি বালজনে কেন হে নিঠুর॥
বলে মুহুঃ মুহুঃ মুখে উহু উহু। যথা কোকিল কূজিত কুহুকুহু॥
নয়ন যুগল সলিলে গলিত। কনক-মুকুরে-মুকুতা রচিত॥
মদনজ্বর না কর ছটফটি। কবিরাজ কহে কবিরাজ বটি॥
কুচমর্দ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো। শুন এহি ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো॥
যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নহে। রসনারসপানে কি রোগ রহে হে॥
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে। করি ধীর সমীর সুধীর ভাষে॥
কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভণে। করুণাঙ্কুরু কালী সুদীন জনে॥

শৃঙ্গারে পরস্পরের উক্তি

কাতর কামিনী, বদন যামিনী, নাথ মলিন হি ভেল।
মুকুতা জৈসন, সোহত ঐসন, স্বরম জল উপজেল॥
সঘন রোদিতি, বদতি পতি প্রতি, রহত বিদগ্ধরাজ।
বাল তুরবল, ধরম কৈসল, নাহিক ভয় কটু লাজ॥
কোটি পরণাম, হে প্রভু গুণধাম, সুরতরস দেহ ভঙ্গ।
হাম কৃশোদরী, পুরুষ কেশরী, কৈসে সম তুহু সঙ্গ॥
কহই কবিবর, কুসুমশরবর, দহনে জরজর দেহ।
রমণীমণি ধনী, নব সরোজিনী, সবহু চাতুরী এহ॥
কলতি পরভৃত, মনহি কৃত হৃত, উরল নিরমল চন্দ।
মধু বিভাবরী, হে বর-সুন্দরী, মলয়ানিলগতি মন্দ॥
রসিক সো বিধি, বিরহবারিধি, তরণী দেয়ল তোরে।
কপট কহেসি, বিচেড়ু বয়েসি, কাহে নিকরুণ মোরে॥

শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি

অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত। উহু উহু মুহু র্মুহু কেশপাশ মুক্ত॥
কাতরা কামিনী কান্দে কহে কলস্বরে। দিয়া পীড়া ক্রীড়া ব্রীড়া না বাস অন্তরে॥
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়। আধার সহিত সুধা পান ভাল নয়॥
যে পর্য্যন্ত কাননে কুসুম থাকে কলি। তদবধি তাহে মধু নাহি পিয়ে অলি॥
সময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত। অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত॥
শীতে সুধাসম বহ্নি গ্রীষ্মেতে সে নহে। বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কহে॥
হত্যা হই হউক মেনে হাস যুবরাজ। ক্ষীণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাপারা কাষ॥
ভার্য্যা সঙ্গে চর্য্যা* ইহা শুনি নাহি কভু। আজি ঘর কালি কি পান্দাড়* ভাব প্রভু॥
আড়ে আলি হেস্তে পড়ে এ উহার গায়। মলিলো গোল্লায় গেলি* নাম খেলি হায়॥
ঘুম গেল ধূম বড় ঘর মেনে ছাড়ি। বিয়ারাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি॥

---

* চর্য্যা—আচরণ, অনুষ্ঠান। পান্দার—বাড়ির পিছনের নোংরা জঙ্গালপূর্ণ জায়গা। গোল্লায় গেলি—নরকগমন।

মিথ্যা কন্যা অবলা অবলা বোল ছাড়। নামমাত্রা বলা দেখি ইচ্ছা বড় গাঢ়॥
মুখে মুখে ফাসফুস এ কি প্রেম ঈষ। আমরাই হইলাম তুচক্ষের বিষ॥
কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়। ঘা.গী* বটে কত ঠাটে কথা দড় দড়॥
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে যেন চীল। শুন নাই আচট ভুমের ভাঙ্গে খীল॥
মর্দ্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে। অনুমানি বুঝি ক্ষেতে সদ্য ফল ফলে॥
সহ্য নহে ক্রোধে কহে আলো আলি শোন। হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্যে দিস লোন॥
শিথিল অনঙ্গরস অঙ্গভঙ্গ দিয়া। হস্ত পদ পাখালিল* বাহিরেতে গিয়া॥
পুনরপি শয্যায় বিহরে দোঁহে রঙ্গে। দোঁহে সমীরণ করে দোঁহাকার অঙ্গে॥
পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন। হেসে হেসে উভয়ত বদন চুম্বন॥
শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামতুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

বিপরীত শৃঙ্গার

ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি। বিপরীত রতি দান দেহ লো যুবতী॥
নেকা ঢঙ্গ হয়ে, রামা কহে সেই কি। প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি*॥
অন্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে। পুরুষের কায প্রভু রমণী কি পারে॥
বিদগ্ধ বটে হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও। কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও॥
সাঁতারে হাঁপায়ে শেষে স্রোতে ঢাল গা। সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা॥
একথা না ভুলি আর মরমে রহিল। এখন সময় নহে কালেতে হইল॥
মিছা পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাষ। ভাবে বুঝি ভর্ত্তাবধে ভয় নাহি বাস॥
লংঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ। সুধাংশু বদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥
বিদ্যা বলে পায়ে পড়ি সেকি এত মধু। গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ॥
কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া। রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া॥
নহিলে হে তাহা আমি যদি মরি আজি। ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি॥
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট। প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট॥
বিগলিত জঘন সঘনে বেণী দোলে। যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কেলে॥
অদ্ভুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লাগে ধন্দ। প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ॥
চকোর খঞ্জনে প্রেম আলিঙ্গন করে। বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে॥
মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা। মুখে মন্দ হাস বাস পরে রামা॥
রূপস-রূপসী নিশিশেষে নিদ্রা যায়। প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায়॥
সুকবি সুন্দর গেলা মানিনীর বাসে। কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে॥
শ্রীকবিরঞ্জনে কালী হও কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ঘাগী—বারবার শাস্তিপ্রাপ্ত। পাখালিল—ধুইল। জি—জিহ্বা

পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন

শুনিয়া নিশির কথা, মনে মনে হাস্যযুতা,
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে।
নানা ফুলে নানা ভাতি, যেন মুকুতার পাঁতি,
হার গাঁথি লইল সত্বরে ॥
গেল নৃপসুতাপাশে, রামা হাসে লাজ বাসে,
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।
আগুসারি যত্ন করি, মালিনীর হাতে ধরি,
সমাদরে বসাইলা তাকে ॥
হীরা বলে রও রও, কেন গো উতলা হও,
আজি কেন এত ঠাকুরালি।
হেদে বাছা ছাড় লাজ, সারাসোরা* হল্যো কাজ,
দেহ পুরস্কার ঘটকালি ॥
কুশলসম্বাদ কহ, ভাব যদি ভিন্ন নহ,
তুমি বধূ বটি গো শাশুড়ী।
হবে গো দুলাল তোর, সে দিন কেমন মোর,
সে ডাকিবে কোথা আই বুড়ী ॥
কাছে আসি হাসি আলি, শিরে তৈল দিল ঢালি,
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ।
কত ঠাট জানে হীরা পুনরপি কহে ফিরা,
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ ॥
বিদ্যা বলে নহ বুড়ী, মাসাশ রসের গুঁড়ী,
মর্ মাগী এত এসে তোরে।
ছাই কথা কি কহিস, পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস,
পায় পড়ি ক্ষমা কর্ মোরে ॥
যেতে হবে ঠাঁই ঠাঁই, ভুলিয়াছি মনে নাই,
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি।
হইল স্নানের কাল, মিছা করি গল্পগাল,
সকলি শুনিব কালি আসি ॥
বিদ্যা দিল চালু কড়ী, কলাই কুমড়া বড়ী,
হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে।
কি কর শাশুড়ে বসে, কহে হেসে শুন এসে,
যে কথা হইল তার সঙ্গে ॥

* সারাসোরা—সমাপ্ত।

সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে ॥

বিদ্যার মানভঞ্জন

কবি কহে বটে মাসি পরামর্শ পাকা। হীরা বলে চাহি বাপু ঘটকালি টাকা ॥
দেখাইল যে যে দ্রব্য পেয়েছিল তথা। দণ্ড দুই বসি কহে নানা রসকথা ॥
স্নান করি পূজে কবি শঙ্করঘরণী। যে পদপঙ্কজ ভবসাগরতরণী ॥
রন্ধন ভোজন করে রাজার নন্দন। নিদ্রালস্যে কিছুকাল করিল শয়ন ॥
নিশিযোগে নিজাঙ্গনাবাসে গেল রঙ্গে। কৌতুকে রমণ সুখ রমণীর সঙ্গে ॥
দিবাভাগে নানাবেশ ধরে গুণধর। ভ্রমণ করয়ে নিত্য রাজার সহর ॥
কখন পরমহংস যতি ব্রহ্মচারী। কখন বা বৈষ্ণব তিলককণ্ঠিধারী ॥
নগরের লোক কেহ লক্ষিতে না পারে। পরম পুরুষ জানি ভক্তি করে তারে ॥
একদিন কৈল কবি ঔদাস্য উদয়। না গেল সে দিন বিদ্যাবতীর আলয় ॥
পতির বিরহে সতী অতি দুঃখযুতা। জাগিয়া যামিনী পোহাইল নৃপসুতা ॥
পরদিন উপনীত সুন্দরীর বাসে। কান্তমুখে হেরি মুখ যত্নে ঢাকে বাসে ॥
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দিলা কিরা। না কহে বচন রামা নাহি চায় ফিরা ॥
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের-বসন। মানভঙ্গ না হয় বিমর্ষ বিলক্ষণ ॥
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে। কপটে নিকটে গিয়া তৃণ দিয়া হাঁচে ॥
মৌনব্রত-ভঙ্গ-ভয়ে না কহিল জীব। তাড়ঙ্ক* দোলায়ে বালা চিন্তা করে শিব।
অপ্রতিভ যুবরাজ অধোমুখে রহে। মৃদু মৃদু হাসি পুনরপি কিছু কহে ॥
রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ। আনার হৃদয়ে সবে এই মাত্র খেদ ॥
গলিত সাঞ্জনধারা* তাহে ম্লান মুখ। চিরদুঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক ॥
সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য* সম নহে। লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা গুপ্তে রহে ॥
কদাচ না কহি কান্তে মিথ্যাকথাগুলা। হের হিমকর প্রিয়ে ও বদনতুলা ॥
ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কাজ। আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ ॥
ফিরা দেহ মদর্পিত চুম্ব আলিঙ্গন। আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন ॥
কবিবর বিনোদ বৈদগ্ধ্যগুণে ভাষে। ফুরাইল মান ফিরে ফিক্ ফিক্ হাসে ॥
আবেশ অধিক আরো আঁটি ধরে গলা। আলিগণ বলে মাগো এত জান ছলা ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

---

* তাড়ঙ্ক—বাহুর অলঙ্কার বিশেষ।
* সাঞ্জনধারা—অঞ্জনের বা কাজলের সঙ্গে চক্ষুর জলধারা
* তবাস্য—তোমার মুখ।
* তন্তুপারা—সুতোর মত অর্থাৎ শীর্ণ।

বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের যুক্তিচিন্তা

কতকাল গৌণে বিদ্যা নবকুসুমিতা। স্থলোচনা প্রভৃতি সকলে পুলকিতা ॥
পুনর্বিভা করে গুণসিন্ধুর তনয়। রজোযোগে রূপবতী গর্ভবতী হয় ॥
দুই তিন চারি পাঁচ মাসেতে প্রবর্ত্ত। সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ ॥
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে জনে জনে। কেহ বলে এই দায় এড়াব কেমনে ॥
কেহ বলে ভাবিয়া জন্মিল মোর বাই। কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই ॥
কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ। ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কাণ ॥
কেহ বলে অকস্মাৎ হেদে কি উৎপাত। চেষ্টা কর কোনরূপে গর্ভ হয় পাত ॥
কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাতিশয়। রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয় ॥
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ি। রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ি ॥
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দপারা। ছুঁড়ীর হাঁপানে ছোঁড়া হল তন্তুসারা ॥
কহিলাম কত মত ভূপতিকে বল। তখন করিল তুচ্ছ এখন এ ফল ॥
কেহ বলে স্ত্রীবুদ্ধিতে পরমাদ ঘটে। কেহ কহে এই কথা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে ॥
স্ত্রীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক। স্ত্রীবুদ্ধে মজিল লঙ্কা খ্যাত তিন লোক ॥
লয়েছি সবাই শিরে কলঙ্কের ডালী। কেহ বলে চারা* নাই যে করেন কালী ॥
কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সই। রাণীর নিকটে গিয়া সবিশেষ কই ॥
ভাল মন্দ তাঁর ঘাড়ে আরের* তা কি। উদরে ধরেছে কেন কুলখাকী ঝি ॥
অতি বাম মো সবারে দূর করে দিবে। পৃথিবীটা পড়্যা আছে ঠাঁই না মিলিবে ॥
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার। সে প্রভুকে লাগে সই সবাকার ভার ॥
ভাল ভাল বলিয়া সখীরা উঠে ঝেড়ে। কেহ বলে তোরে মেনে প্রাণ দিব কেড়ে ॥
রাণীর নিকটে সব সহচরী যায়। ভূমিষ্ঠ হইয়া তারা প্রণমিল পায় ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।

সখীগণ কর্ত্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার গর্ভবার্ত্তা প্রদান

আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে রাণী সতী। ভালতো আছেগো মোর বিদ্যা গুণবতী ॥
চিরদিন দেখি নাই সে চাঁদবয়ান। বড়ই দুরাত্মা আমি হৃদয় পাষাণ ॥
তোমরাও ভালমন্দ না কহ সংবাদ। না জানি ঘটিল আজি কিবা পরমাদ ॥
উষাকালে এসেছ অবশ্য হেতু আছে। আমার শপথ লাগে সত্য কহ কাছে ॥
বিরস বদনে কেন বসিলা নিকটে। প্রাণ করে উড়ু উড়ু হেরে বুক ফাটে ॥
নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখি ডানি চক্ষু নাচে। বড় ভয় বৃদ্ধকালে শোক পাই পাছে ॥
সহচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণী। কি রোগ জন্মিল তার কারণ না জানি ॥
এবে দেখি কিরূপে সে রূপ গেল দূর। উদর ডাগর বড় বরণ পাণ্ডুর ॥
শয়ন সতত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ। মাথা ঘোরে উকি* তোলে ইকি অলক্ষণ ॥

---

* চারা—প্রতিকার। * আরের—অন্যের। * উকি—হিক্কা, হেঁচকি।

রাণী বলে কি কহিলে সর্ব্বনেশে কথা। বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর মাথা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে দেও সাদ ভেট। সে বড় জোরাল মেয়ে বাধায়েছে পেট ॥

গর্ভ দর্শনে রাণীর বিদ্যাপ্রতি ভৎর্সনা

শুনি চমৎকার রাণী উঠে।
পাছে শোনে ভূপ চুপ, বুক করে ধুপধুপ,
কাঁপে কায় কালঘাম ছুটে ॥
ভয়ে মুখে উড়ে ধূলা, পাছে রহে সখীগুলা,
উপনীত নন্দিনী নিকটে।
যে কহিল রামাচয়, এ কথা অন্যথা নয়,
গর্ভের লক্ষণ যত বটে ॥
পূর্ব্বরূপ ছারখার, উদরের বড় ভার
ধরাতলে শুয়েছে রূপসী।
শিথিল কটির বাস, ঘন বহে মৃদুশ্বাস,
আস্য-আভা প্রভাতের শশী ॥
সম্মুখে প্রসবস্থলী, উঠে বিদ্যা কৃতাঞ্জলি,
প্রণমিল লাজে নতমুখ।
কান্দে কথা কহে শুদ্ধ, দেখিলাম মুখপদ্ম,
কব কি জন্মিল যত সুখ ॥
অনাথিনী থাকি একা, ছমাস বৎসরে দেখা,
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই।
জননী জীয়ন্ত যার, এতেক খোয়ার তার,
গর্ভে কেন দিয়াছিলে ঠাঁই ॥
হেদে এক কথা শোন, যদি খাওয়াতিস লোন,
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মোরে।
বালাই যাইত তবে, এত কথা কেন হবে,
অনুযোগ কে করিত তোরে ॥
চর্য্যা বুঝিলাম আমি, মানব-রাক্ষসী তুমি,
যমের দোসর সেই বাপ।
আমার কপাল পোড়া, বিধাতা নষ্টের গোড়া,
পূর্ব্ব জন্মের ছিল কত পাপ ॥
রাণী বলে পাপীয়সী, প্রাণ ছাড় নীরে পশি,
কিম্বা বিদ্যা খা লো তুই বিষ।
নহে খড়্গে কর্ ভর, এই ক্ষণে মর্ মর্,
কলঙ্কিণী কোন্ সুখে জিস্ ॥
নির্ম্মল রাজার কুল, তুই কলঙ্কের মূল,
জন্মিলি আমার গর্ভে আলো।

এই রাজ্য ত্যজ্য করে, যদ্যপি ভাতার ধরে,
বেরুতিস সেও ছিল ভালো ॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করগো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে ॥

রাণীসহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী

বিদ্যা মর্‌লো কলঙ্কিনী ঝি।
আমার কপাল পোড়া তোর দোষ কি ॥ ধুয়া ॥

বাপের দুলালী ছিলি, [illegible]হে তিলাঞ্জলি দিলি
কুলে খোঁটা কুলটা[illegible]লি ছি ছি ছি।
কার ঘরে নাই মেয়ে, চক্ষু খেয়ে দেখ্ চেয়ে,
পাপক্ষণে তোরে উদরে ধরেছি ॥
প্রসাদ কহিছে দড়, হেন মেয়ে আইবড়,
লাজে লোক দাঁতে কাটে জি ॥

আলো হেদে লো পাপিনী ঝি। বিদ্যা বলে দোষ বা দেখিলা কি ॥
আলো কেমনে মিলিল স্বামী। বিদ্যা বলে পুরুষ না দেখি আমি ॥
আলো কারে কর প্রতারণা। বিদ্যা বলে চক্ষু নাই বুঝি কাণা ॥
আলো গর্ব্ভের লক্ষণ সর্ব্ব। বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ ॥
আলো উদর ডাগর তোর। বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর ॥
আলো স্তনে ক্ষরে কেন পয়। বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয় ॥
আলো কুচাগ্রভাগেতে কালি। বিদ্যা বলে প্রলেপ দিয়াছে আলি ॥
আলো শয়ন কেন ভূতলে। বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে ॥
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধর্ম্ম ॥
আলো পূর্ব্বরূপ গেল দূর। বিদ্যা বলে দেখ লক্ষণ পাণ্ডুর ॥
আলো ঘন ঘন উঠে হাই। বিদ্যা বলে বলাধান* মাত্র নাই ॥
আলো ভক্ষণ যে পোড়া মাটি। বিদ্যা বলে ছি মাগী তোরে না আঁটি।
তারা মায় ঝিয়ে যত ভাষে। আড়ে আসি বসি আলি হাসে ॥
রস শ্রীকবিরঞ্জনে কহে। কভু গর্ভ ছাপা নাহি রহে ॥

রাণীসহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্বাক্‌ছল

এতক্ষণ জিয়া আছ তাই আমি চাই। বাসনা এমনি হয় আমি বিষ খাই ॥
প্রাণ সম বাসি পিতা পড়াইল তোকে। গালে দিলি কালি চূণ হাসিবেক লোকে ॥

* বলাধান—শক্তি।

সমুচিত শাস্তি বিদ্যা তুই পাবি কালি। উল্‌টা চোরে গৃহী বান্ধে মোরে দিস্ গালি ॥
বিদ্যা বলে পুনঃ পুনঃ কটু কও। চারা নাই মাগো তুমি গুরুলোক হও ॥
গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাস। আপনিই আপনার কর সর্ব্বনাশ ॥
কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ। খুঁড়িতে কেচুয়া* পাছে উঠে কালসাপ ॥
কিবা ডাক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড়। ভাল বটে জীয়ন্ত মাছে পোকা পাড় ॥
বারে বারে যত কহি কথা নাহি মান। যেমন আমার রীত সুন্দর তা জান ॥
অনাথিনীপ্রায় পড়ে থাকি এই ঠাঁই। পুরুষ কেমন কভু চক্ষে দেখি নাই ॥
সবেমাত্র স্নেহভাবে দেখেছেন বাপ। গর্ভ গর্ভ বলে কেন দেহ মনস্তাপ ॥
দুঃখের উপর দুঃখ এ বড উৎপাত। কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত ॥
রাণী বলে মর্ মেনে একি আর পাপ। তবে বুঝি এ কর্ম্ম করেছে তোর বাপ ॥
তোর এ কথায় গায় কাটে যেন বিছা। পেটে ছেলে লড়েচড়ে তবু বলে মিছা ॥
ক্রোধে কম্পমান তনু ঘূর্ণিত লোচন। সখীগণ প্রতি কহে কর্কশ বচন ॥
জাতিরক্ষা হেতু আছ বিদ্যার নিকটে। আপনারা ঘটক হইয়াছিলা বটে ॥
তো সবার দোষ নাহি কাল নহে ভালো। মাথায় করাত দিব কি ভেবেছ আলো ॥
কর যোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ। বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ ॥
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ কেমন। রাজরাণী বট কেন কথা গো এমন ॥
বাহিরে প্রহরী থাকে দুরন্ত কোটাল। মনুষ্যসঞ্চার নাহি একি ঠাকুরাল ॥
উচিত কহিতে কিন্তু মর্ম্মে পাবে পীড়া। রমণী রমণী সঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া ॥
ভগীরথ জন্মকথা* শুনিয়াছি কানে। সে কালের মেয়ে তারা এ কালে না জানে ॥
তবে কে করিল গর্ভ এত বড রঙ্গ। ছাড মেনে ঠাকুরাণি এ পাপ প্রসঙ্গ ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি। লোকে বলে কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকি ॥
আকাশে ফেলিতে ছেপ* গায়ে এসে পড়ে। বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বাড়ে ॥
অবিচারে কর নষ্ট তার চারা কিবা। যার রীত যেমন জানেন মাত্র শিবা ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি।

বিদ্যার গর্ভসংবাদ শ্রবণে ভূপতির কোটালকে ধরিতে অনুমতি

নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে। অসম্বর অম্বর অম্বর* পড়ে শিরে ॥
জ্ঞানহারা তারাকারা* ধারা শত শত। গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠা গত ॥
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জছটা। নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা* ॥

---

* কেচুয়া—কেঁচো।
* ভগীরথ জন্মকথা—কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রদত্ত ভগীরথ-জন্মবৃত্তান্তের প্রতি ইঙ্গিত। রাজা দিলীপ অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করলে সূর্যবংশ রক্ষার জন্য শিব তাঁর দুই বিধবাপত্নীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"............দুইজনে কর রতি। মম বরে একজনের হইবে সন্ততি॥" ফলে কিছুকাল পরে এক রাণী গর্ভবতী হলেন এবং মাংসপিণ্ডাকারে ভগীরথকে প্রসব করলেন।
* ছেপ—থুথু। * অম্বর—আকাশ। * তারাকারা—গোলাকৃতি। * বরটা—রাজহংসী।

ভূপ উপে* উপনীত মলিন বদন। সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরণীভূষণ ॥
বিমল কমলমুখ ম্লান কেন কবে। অন্য কান্তে কৃতান্তে* নিশান্তে কারে লবে ॥
শিরে হানি পাণি রাণী বলে কব কি। শুন পর্ব্ব* গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝি ॥
কি বল কাঁপিয়া উঠে মুখে উড়ে ফাকা*। ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ যায় ভাকা* ॥
সমূলে রুষিল যেন মাতাল মাতঙ্গ। সুষুপ্তি সময়ে যেন দংশিল ভুজঙ্গ ॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নিকটে যেমন। সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন ॥
আপাদ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা যেন দহে। কোটালের কর্ম্ম এই আর কারু নহে ॥
আরবার দরবার মধ্যে গিয়া ভূপ। কাঁপে গুরু উরু ওষ্ঠ লোচন বিরূপ ॥
ক্রোধে কহে তোমরা সওয়ার দশ যাও। এহি ওক্ত* মেরে পাশ বাঘাই মাঙ্গাও ॥
যো হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে। কেহ তাজি তুরকী টাঙ্গন* পৃষ্ঠে চড়ে ॥
দড়বড় গড় পাড়ে উঠাইয়া ঘোড়া। রাজপুত যমদূত গোঁফে দেয় মোড়া ॥
ঘেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেসাব। কাঁহা কোতোয়াল গিরি নেকাল সেতাব ॥
বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে খাটে। সওয়ারের ঘটা দেখি ভয়ে মার্গ ফাটে ॥
ধুতি পরি লেঙ্গাশির* হইল হাজির। অমনি ঢেকায়* করে বেড়ার বাহির ॥
পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া*। আকটে* পাপোস মারে হাড় করে গুঁড়া ॥
কোটাল মহিলা কান্দে করে হায় হায়। এক দণ্ডে নিয়া গেল রাজার সভায় ॥
নিকটে নকীব* ছিল করিল জাহির। নজর* দৌলত* এই বাঘাই হাজির ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

ভূপতির তর্জ্জনে কোতোয়ালের বিনয়

মৌনরূপে ভূপ আছে, কোতোয়াল খাড়া আছে
কোপে কহে ঘন বাহু লাড়া।
কুকুরে প্রশ্রয় দিলে, কান্ধে চড়ে এক তিলে,
বিশেষ কহিব কিবা বাড়া ॥
ক্রোধে কাঁপে মহীপাল কহে ওরে কোতোয়াল,
বুঝিলাম তোর নাহি দোষ।
যেমন যুগের ধর্ম্ম, তেমনি উচিত কর্ম্ম,
মিছামিছি আমি করি রোষ ॥
কারে কব কাব্য* কহ, যে যাহারে সঁপে দেহ,
সে নাকি তাহার কাটে শির।
করিয়া হারামখুরী,* পশিয়া আমার পুরী,

---

* উপে—নিকটে। * কৃতান্তে—যমে।
* পর্ব্ব—সংবাদ। * ফাকা—ফেনা। * ভাকা—হতবুদ্ধি।
* ওক্ত—সময়। * টাঙ্গন—পাহাড়ী দ্রুতগামী ঘোড়া। * লেঙ্গাশির—খালি মাথা।
* ঢেকা—ধাক্কা। হুড়া—গুঁতা। আকটে—নির্দ্দয়ভাবে। নকীব—রাজসভার ঘোষক।
নজর—উপঢৌকন। দৌলত—সম্পদ। কাব্য—অবিশ্বাস্য ঘটনা। হারামখুরী—অকৃতজ্ঞ হয়ে।

রাজ্যে চুরি নাকে দিব তির ॥
মনেতে আগুন জ্বলে, পুনঃ পুনঃ কটু বলে,
শান্তি নহে আরো ক্রোধ বাড়ে।
বিষম বিষয়ে মত্ত, না লও বিদ্যার তত্ত্ব,
সবংশে গাড়িব এক গাড়ে* ॥
সুরাপানে রাগরঙ্গে, থাকে বারবধূ সঙ্গে,
অধর্ম্মে একান্তপূর্ণ দৃষ্টি।
বিশ্বাসঘাতকী বেটা, হেন কাজ করে কেটা,
এই পাপে যাবে তোর সৃষ্টি ॥
কোতোয়াল বিদ্যমান, থরথর কাঁপে প্রাণ,
ধীরে কহে কি করেছি আমি।
ক্রোধ সম্বরণ কর, সকলি করিতে পার,
মহারাজ আপনি ভূস্বামী ॥
বিষ খেতে দেন মাতা, ধন লোভে বেচে পিতা,
জাতিবাদ যদি দেয় দারা।
অবিচারে রাজদণ্ড, গৃহ দহে বহ্নি চণ্ড,
কি আছে ইহার আর চারা ॥
কিন্তু শুন মহাশয়, বিচার করিতে হয়,
দোষ দেখে এক গাড়ে গাড়।
যদ্যপি না ঘাটী থাকে, প্রাণ লও মিছা পাকে
এ নহে বিহিত ক্রোধ ছাড় ॥
আর শুন গুণধাম, লইয়া বিদ্যার নাম,
তারে রক্ষা করি আমি সদা।
অন্তরে বিষম ভয়, রাত্রে নিদ্রা নাহি হয়,
সাক্ষী মাত্র কেবল শারদা ॥
সতত সতর্ক থাকি, দণ্ডে দশ বার ডাকি,
সখী কহে প্রবোধ বচন।
হুসিয়ারে আছি ভাই, আমরা কি নিদ্রা যাই,
সবে বিদ্যা ঘুমে অচেতন ॥
পিপীড়ার নাহি সন্ধি, নজরেতে হয় বন্দী,
ইহাতে মনুষ্য কোন্ ছার।
তবে যদি যায় চোরে, বিধাতা বিমুখ মোরে,
নিতান্ত এ কর্ম্ম দেবতার ॥
রাজা বলে সে যা হোক, সাত দিন প্রাণ রোক,
ইতিমধ্যে চোর দিবে ধরে।

---

*গাড়ে—গর্ত্তে।

ধরিয়া আনিলে চোর, সম্মান করিব তোর,
জায়গির দিবে বহু করে ॥
যো হুকুম এই বাত, শিরে উঠাইয়া হাত,
ঘরে যায় সংপ্রতি সুসার।
পিছে দিল মহসিল,* সরিবারে এক তিল,
নারে হুসিয়ার হুসিয়ার ॥
সদা পুটাঞ্জলি পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করগো মায়াপাশে।
ভব সিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উর উমা আমার মানসে ॥

চৌর্য্যসংবাদার্থ কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণীর সহিত কথোপকথন

কহিল বিরূপ ভূপ দুঃখে অঙ্গ দহে। ঘৃণা বড় ঘরে গিয়া ঘরণীকে কহে ॥
সৃষ্টি লোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও। এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও ॥
বিদ্যার মন্দিরে কিবা দ্রব্য গেল চোরে। সেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজা মোরে ॥
শ্রুত মাত্র বিলম্ব না করে একটুক। অমনি চলিল ত্রস্ত ভয়ে কাঁপে বুক ॥
নানা উপহার দ্রব্য সংহতি লইল। অবিলম্বে রাণীর নিকটে উত্তরিল ॥
ভূমে লুটি প্রণমিল করি যোড় পাণি। পরম দুঃখিতা রাণী না কহেন বাণী ॥
সে ধারা দেখিয়া তার হৃদে জন্মে ভয়। সকরুণে কোটাল মহিলা তবু কয় ॥
এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার। কৃপা করি কহ শুনি সত্য সমাচার ॥
কি দ্রব্য হইল চুরি রাজকন্যা বাসে। জীয়ন্ত জীবনে মরা কোটাল হুতাসে ॥
বিশেষ জানিলে চোর তবে ধরা যায়। নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায় ॥
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে সুধাও। মিলিবে সকল তত্ত্ব সেইখানে যাও ॥
সে বড় দারুণ কথা বাড়া কব কি। অভিমানে মরমে মরিয়া রয়েছি ॥
পুনঃ কহে যোড় হাতে নিশিনাথদারা। বিড়ম্বনা কর যদি তবে নাই চারা ॥
অবিচারে মহাপ্রাণি* হত্যা বড় পাপ। কি কারণে ঠাকুরাণি দেহ মনস্তাপ ॥
দুগ্ধপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত। ভাল ত না শুনি মাগো বল তুমি যত ॥
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন। ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ম্ম হেন ॥
রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর। বিদ্যাবতী গর্ভবতী এই সমাচার ॥
কহিবার কথা একি মৃত্যু ইচ্ছা হয়। শুনিলা এখন তুমি যাও নিজালয় ॥
দশনে রসনা চাপে চমকিয়া উঠে। যাম্য করাঙ্গুলি তুলি দিল নাসাপুটে ॥
আর কিছু না কহিল গেল নিজ বাসে। কোতোয়াল শুনি বার্ত্তা মনে মনে বাসে ॥
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান কৈল নিশিনাথ। রাম রাম বলি দুই কর্ণে দিল হাত ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

* মহসিল—আদায়। * মহাপ্রাণি—নর

কোটালের ভূপতির প্রতি নিন্দা

ভূপতি কেবল অজা,* যে জন লুটিল মজা,
এড়াইল সেই আমি চোর।
কহিতে শরম করে, কন্যার ছিনালি* ধরে,
গরদান* লইতে চাহে মোর ॥
রাজলক্ষ্মী থাকে যার, সূক্ষ্ম বিবেচনা তার,
সত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড।
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু, কৃপান্বিত বৃষকেতু,
তেঁই ধরে শিরে ছত্রদণ্ড ॥
নতুবা কি কোনরূপে, এ ছাড় অধম ভূপে,
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়।
মনেতে জন্মেছে অগ্নি, সে বিদ্যা ধর্ম্মত ভগ্নী,
কেমনে এমন কথা কয় ॥
গ্রামের সম্বন্ধে যারে, যা বলিয়া ডাকে তারে,
সেই ভাব করণ কর্ত্তব্য।
এ আমি নেমকে পালা,* হায় হায় একি জ্বালা,
রাজা বেটা বড়ত অভব্য ॥
বিতুষ্টা জননী কালী, খেদমত* কোতোয়ালী,
গালাগালি লতায় ছুতায়।
নাহি গণে আগাপিছা যার যায় খড়গাছা,*
প্রথমেতে আমাকে গুঁতায় ॥
মারিয়া করিল ক্ষীণ, দেখি পাঁচ সাত দিন,
চোরের নাগাল যদি পাই।
মনেতে সকল আছে, দিয়া নৃপতির কাছে,
অধিকার ছাড়া হয়ে যাই ॥
হইল সুন্দর শিক্ষা, মেগে খাব মুষ্টিভিক্ষা,
এমন সম্পদে কাজ নাই।
প্রসাদ বলিছে রও, এ দায় খালাস হও,
তবে তুমি যাও অন্য ঠাঁই ॥

* অজা—ছাগল। * ছিনালি—ব্যভিচারিতা। * গরদান—ঘাড়।
* নেমকে পালা—নেমক হারাম। * খেদমত—দাসত্ব। * খড়গাছা—একগাছি খড়

কোটালিনী কর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি ও প্রসাদপুষ্প নাথে প্রদান

কোটালিনী কর্ত্তৃক পূজে ভদ্রকালী। করপুটে কহে মাগো একি ঠাকুরালী॥
ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে। অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে॥
দয়া কর দাসে দয়াময়ি দাক্ষায়ণি। দনুজদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
ধ্রুব তব ভব কব তার গুণ কিবা॥ আশুতোষ আখ্যা এক শুন মাগো শিবা॥
সদাশিব সদাশিব সমূহ বিনাশে। কৃপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে॥
শৈলরাজপুত্রি মাগো বিশ্ববিভুদারা। কৃপণতা অনুচিত নাম তব তারা॥
তবে যদি কাতর কিঙ্করে দয়া নহে। তোমাকে করুণাময়ী কেন লোকে কহে॥
তুষ্টা মহামায়া তার ঐকান্তিক ভক্তি। ভয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈব উক্তি॥
অচিরে অবশ্য ধরা পড়িবেক চোর। সে কিন্তু মনুষ্য নহে বরপুত্র মোর।
দেবী-অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ। হাস্যযুতা বিধুমুখী হৃদয়ে আহ্লাদ॥
যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথ হাতে। ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে॥
প্রমদার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে। হুঁকে উঠে হুপ বাড়ে হুহুঙ্কার ছাড়ে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা

সাজে কোতোয়াল, লে খঞ্জর ঢাল' দো আঁখিয়া লাল,
সোবাণ পতঙ্গ, চড়ে গজতুঙ্গ, ঘুমাওত অঙ্গ,
সেতাব করি।
যোষায়ত সাত, তুঝে দেওয়ে হাত, কহে মিঠী বাত,
পিছে হোক আও, কোহি মত যাও, মেরে সির খাও,
হো পাঁও পরি॥
দেখো এহি যাও, ওঁহি চোর পাও মেনে গারি গাও,
কহে মুঝে ভূপ, সো বাত সরূপ, আবি রহ চুপ,
জি এক ঘরি।
চলে কেত্তে ঠাট, হাঁকে কাট কাট, ভরে পুর বাট,
খোলাওব যোহি, লই ধূলি তোঁহি, পড়ে সোকাঁহি,
হাম চোর ধরি॥
হো ফৌজ হাজার, জাপাএটে বাজার, লোক হয়ে লাচার,*
ফুকারে* দোহাই, কাহে লুট ভাই, হজুরমে যাই,
ক্যা কিয়া হোঁ চুরি।
কহি কহে আঁট, ইসে আগু হাঁট, মুড়ায়ে গো **

* লাচার—নিরুপায়। * ফুকারে—উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

হারাম কি হাড়, আভি* *ফাড়, মারো উস্কা * * ;
দোহাই তেরি ॥
কহে কবি রাম, হোঁ পামর হাম, তারা তেরে নাম,
পড়া হোঁ লাচার, ওহি পদ সার, মুঝে কর পার,
গমন কো ডরি ॥

সহরে চৌর ধরণার্থে কোটালের দৌরাত্ম্য

চোর হেতু ঘরে ঘরে, বিষম বেদাতি* করে,
বিদেশীকে বেন্ধে মারে কোড়া।
যাহার বাটীতে থাকে, ইটে খাড়া করে তাকে,
কোটালিয়া বিনষ্টের গোড়া ॥
স্তব্ধ হয় সব লোক, দিবারাত্র ভাবে শোক,
উৎপাতের সীমা কিছু নাই।
শিষ্ট লোক যত ছিল, আগে ভাগে পলাইল,
দূরাদূরে গেল ঠাঁই ঠাঁই ॥
গাদাও সহর তায় কত লোক আইসে যায়,
সদা দেখা পথিকের সাথে।
ফাটকেতে রাখে বন্দী, কে বুঝে তাহার ফন্দী,
সাবল তাওইয়্যা দেয় হাতে ॥
মেগে খায় যারা যারা, তা সবার অন্ন মারা,
ভয়ে কেহ সহরে না ঢোকে।
পড়্যা পড়্যা থাকে মাঠে, কত বা নদীর ঘাটে,
তস্তসারা মাছি পড়ে মুখে ॥
নিশিতে প্রহর বাজে, তার পর কেহ কাজে,
দুই চারি দণ্ড যদি থাকে।
সে যেন প্রকৃত চোর, দুঃখের না থাকে ওর,
সারা রাত্রি হাড়্যা* ঠুক্যা রাখে ॥
যে বেটারা ছেঁচা বোঁচা, বড় বড় লম্বা কোঁচা,
হয় কোটালের হরকরা।
বুকে টোকা দিয়া কয়, বসে থাক মহাশয়,
একদিনে যাবে চোর ধরা ॥
হর্ষযুক্ত কোতোয়াল, মাথায় জড়ায় শাল,
পিঠ ঠুক্যা কহে ভাই রহ।

---

* বেদাতি—অত্যাচার।
হাড়্যা ঠুকা—হাড়িকাঠ বা এমনি কোন কাঠে আটকে বেঁধে শাস্তি। ফরাসী চন্দননগরে "তুরুম ঠোকা" প্রচলিত ছিল

চোর ল্যানে সকো যব, আর ভি ইনাম তব,
দেওজা ফেকের এক্কা কহ্ ॥
হুজুরে নালিশ রোজ, রাজা ভাবে বুঝি খোঁজ,
কোনরূপে পেয়েছে বাঘাই।
নতুবা কি এত জোর, হামেসা হাঙ্গামা সোর,
তথা কারু কথা লাগে নাই ॥
এথা চোরচূড়ামণি, দণ্ড-কমণ্ডলু-পাণি,
কখন বা ব্রহ্মচারি-বেশ।
অবধৌত কোন দিন, আসন শার্দ্দুলাজিন,
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ ॥
কোতোয়াল করপুটে, স্তব করে সন্নিকটে,
নিজ দুঃখে বিশেষ রোদন।
পুরীসুদ্ধ হই নষ্ট, আশীর্ব্বাদ কর কষ্ট,
দূর হউক রহুক জীবন ॥
হাসি কহে গুণনিধি, অচিরে তোমাকে বিধি,
অবশ্য হবেন অনুকূল।
বাক্য মিথ্যা নহে মোর, ধরা পড়িবেক চোর,
ভয় নাই হের ধর ফুল ॥
পুলকিত নিশীশ্বর, ফুল নিল পাতি কর,
পুনরপি প্রণিপাত করে।
কালীপাদপদ্ম ভাবি, রচিস প্রসাদ কবি,
কোটাল চলিল স্থানান্তরে ॥

কোতোয়াল-চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ

কূটবুদ্ধি কোতোয়াল তঞ্চ* করে নানা। ঠাঁই ঠাঁই বসাইল মজবুত থানা ॥*
বিড়া* উঠাইল পাঁচশত হরকরা। বুক ঠুক্যা কহে চোর জানা গেল ধরা ॥
কত পাটনির ঠাটে* খেয়া দেয় ঘাটে। কত বা দানীর* ছলে দান সাধে মাঠে।
দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ*। কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ ॥
কটিতে কৌপীনমাত্র তাহাতে গিরস*। সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস* ॥
গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা* চলে যে যে ঠাটে। সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে নাটে ॥
খাসা চীরা* বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে। চিকণ* গুধড়ী* গায় বাঁকা কোঁৎকা* হাতে ॥

---

* তঞ্চ—প্রবঞ্চনা। বিড়া—বস্তু বহনের জন্য মাথায় বেড়। মজবুত থানা—শক্ত প্রহরা।
পাটনির ঠাটে—খেয়াঘাটের মাঝির বেশে। দানীর—রাজকর বা শুল্কসংগ্রহকারীর।
ব্রজবাসি-বেশ—বৈষ্ণব বেশ। গিরস—গ্রন্থি। নামরস—দেবতার নামগান।
গোঁড়াগুলা—বিশেষ ধর্মবিশ্বাসীর প্রতি ইঙ্গিত। চীরা—কাপড়ের ফালি। চিকণ—সূক্ষ্ম বা পাতলা।
গুধড়ী—কাঁথা বা গাত্রাবরণ। কোঁৎকা—মোটা লাঠি।

মুঞ্জ গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব। দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব ॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। ভেকা* লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥
এক এক জনার ধুমড়ী* দুটি দুটি। দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী ॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে। বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত। উঠে ছুটে পায় পড়ে পড়ে করে দণ্ডবত ॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ॥
গোষ্ঠীসুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে। মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে। শেষে মেয়ে পুরুষেতে পাত্রশেষ চাটে।
বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়। ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায় ॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি। মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী ॥
শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী*। অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি* ॥
পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরন্ত। জনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত ॥
দেবল* দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাড়ু। ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু ॥
মার পিটে ধূমধাম করয়ে লহর*। ভয় নাই লুট্যা খায় রাজার সহর ॥
কেহ বা বিষম বাঁকা জালালি ফকির। কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির* ॥
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু* শিরে পাগ কালা। কান্ধে ঝুলি গলে কত তর তর* মালা ॥
যার বাটি যায় তার নাকে আনে দম। কয়েফেতে* চুরচুর নদারদ* গম* ॥
কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী। হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী ॥
হেকমতে* কতগুলা হইল কাঙ্গালী। মরা পারা পড়্যা পড়্যা থাকে গলি গলি ॥
লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা। দুই চক্ষু বুজে থেকে থেকে করে হাঁ ॥
মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে। চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে ॥
নিদ্রা নাহি যায় লোকে কোটালের ডরে। খেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে ॥
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি। রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী ॥
পূর্ব্বমত গানবাদ্য নাহি রাগরঙ্গ। মহাভয়যুক্ত লোক সদা রঙ্গ ভঙ্গ ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

চোর সন্ধানে বিদ্যু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত

না মিলে চোরের তত্ত্ব গেল পঞ্চ দিন। ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন ॥
হীরা রায় নামে এক কোটালের খুড়া। বয়স বিস্তর বড় বুদ্ধিমান বুড়া ॥
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে। সঙ্গোপনে যাও বিদ্যু ব্রাহ্মণীর কাছে ॥

মুঞ্জ-গুঞ্জ-ছড়া—মুকুলিত কুঁচফলের মালা। ছাব—ছাপ।
ভেকা—বোকা। ধুমড়ী—বয়স্থা চরিত্রহীনা নারী।
ভুগলামি—হিন্দী 'ভগল' শব্দ থেকে সৃষ্ট। প্রতারণা বা ধোঁকা দেওয়া।
রামানন্দী—রামানন্দ প্রবর্তিত রামোপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।
কয়েফেতে—কফেতে। নদারদ—ফার্সী শব্দ। লুপ্ত, অদৃশ্য। সন্ধি—কৌশল।
দেবল—পুজারি ব্রাহ্মণ। লহর—তরঙ্গ। জিঞ্জির—শিকল। খাড়ু—মল।
হেকমতে—কৌশলে। গম—হিন্দী শব্দ। দুঃখ, চিন্তা। * তরতর—নানাবিধ।

তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ভূমণ্ডলে নাই। অবশ্য চোরের তত্ত্ব পাবে তার ঠাঁই ॥
এ কথা শুনিয়া কোতোয়াল কুতূহলী। শিরে বন্দে প্রযত্নে পিতৃব্যপদধূলি ॥
চলিল বাঘাই একা মধ্যাহ্ন সময়। উপনীত সেই বিধুব্রাহ্মণী-নিলয় ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে। বৈস বাপু বিদু মৃদু হেসে হেসে কহে ॥
কোন ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই। বৌও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই ॥
ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল। সুবচনী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল ॥
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন। মৃত্যুকালে হাতে হাতে সঁপেছে তখন ॥
এবে বাছা ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর। আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিষ্ঠুর ॥
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথা থো। বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন পো ॥
শুনিয়া থাকিবে গো বিদ্যার সমাচার। এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহ নিস্তার ॥
তোমা বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর। পূজিব চরণ দুটি পাই যদি চোর ॥
বিদু বলে হাসি হাসি এত বড় দায়। আজি [illegible]ও কালি চোর মিলিবে তোমায় ॥
বাহু তুলি কুতূহলী নাচে নিশিনাথে। আকাশের চাঁদ যেন পায় নিজ হাতে ॥
কোটাল চলিয়া গেল আপনার ঘর। বিদু যায় বিদ্যা বিনোদিনীর গোচর ॥
প্রণাম করিয়া বিদ্যা বসিতে বলিল। ব্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাঁপিল ॥
কৌতুকে কপট কথা কহে বিদু হাসি। শুনেছি সকল তত্ত্ব শুন গো রূপসি ॥
চিন্তা কি গো চন্দ্রমুখি চুপ করে রও। কিবা লাজ কার কাজ তার নাম লও ॥
তার হাতে ঔষধ খাইয়া শীঘ্রগতি। যাবে গো উৎপাত গর্ভপাত হবে সতি ॥
একান্ত চিন্তিত বটি শঙ্কা নাহি মাত্র। তুমি গুণবতী দেখি সে কেমন পাত্র ॥
কোটালের জানিত এ বুঝি বিনোদিনী। সখিগণ প্রতি কহে বড় আপ্ত ইনি ॥
ইহার গুণের কথা কহা নাহি যায়। পুরস্কার দেও সখি মনে যেবা চায় ॥
ইঙ্গিত পাইয়া উঠে উষা নামে আলি। এক গালে চূণ দিল আর গালে কালি ॥
ঠেসে ধর্যা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া। ঘন ঘন মুখ ঘসে মাটিতে ফেলিয়া ॥
কেবল ব্রাহ্মণী হেতু জীবন রহিল। ঢেকা মেরে বাড়ীর বাহির করে দিল ॥
হাইফাঁই করে দুই চক্ষে পড়ে জল। মনে ভাবে অসৎকর্ম্মে বিপরীত ফল ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাসে মাঘাইর হিতোপদেশ

অর্দ্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি। অমনি পড়িল শেষে মরি মরি বলি ॥
আমলিল শরীর উঠিতে শক্তি নাই। কেন্দে কহে এত দুঃখ দিলা হে গোঁসাই ॥
প্রভাত হইল নিশা নিশানাথ আসি। দুয়ারে দাঁড়ায়ে কহে কি কর গো মাসি ॥
কোঁথায়ে কোঁথায়ে কহে আরে বাপু মরি। অতি বুদ্ধি পোঁদে দড়ি তার ভোগ করি ॥
স্বার্থ নাহি পরার্থে যে করে পরানিষ্ট। দেবতা তাহারে দেন বিধিমত কষ্ট ॥
যে জাতীয় দুঃখ দিল নৃপতির ঝি। মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আর কি ॥
সেটে ধরে আঁটে কিল মর্ম্মে পাই পীড়া। কর্ম্মকারে পিটে যেন বড় লোহা ভিড়া ॥
গালে গুঁতা গণে গণে গোটা বিশ গায়। শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ ফেটে যায় ॥
অস্থানে গন্তানগুলা শাস্তি দিল বড়ি। স্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছা শক্তি নাই নড়ি ॥

বিদু-বাক্যে বিস্তর হাসিল নিশানাথ। ক্ষমা কর মাসি বল্যে ধরে দুটি হাত ॥
বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল দুটি। বিদায় মাগিল কিন্তু লাগে ছটফটি ॥
কেন্দে কহে কি কর মা কৃপাময়ি কালি। আজ্ঞা তব বৃথা হয় একি ঠাকুরালী ॥
যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লবে। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নাম কেন তবে ॥
ছয় দিন গেল আজি কালি সপ্ত দিবা। মরণ নিকট মাগো বাড়া কব কিবা ॥
চিন্তাযুক্ত বৃক্ষতলে বসিল বাঘাই। করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই ॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বট মহাশয়। বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয় ॥
ভার্য্যাবাক্যে ভগবান ভুলিল আপনি। কনককুরঙ্গ পাছে গেলা রঘুমণি ॥
নল হেন মহারাজ বিপদে পড়িয়া। ঘোর বনে পলাইলা ঘরণী ছাড়িয়া ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হৈল বুদ্ধিহারা। পাশায় করিলা পণ আপনার দারা ॥
যত বুদ্ধি পাও দাদা মনে নাহি ধরে। সবে মিলি যাই চল রাজকন্যা-ঘরে ॥
সিন্দূরে মণ্ডিত কর রাজকন্যা গৃহ। নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ ॥
কুতূহলে কোতোয়াল কোলে করে ভাই। ভাল কথা বলেছিস্ ভাইরে মাঘাই ॥
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভূপে। রাজা বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে ॥
ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম। তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম ॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা। নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা ॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা। ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈল শিবা ॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা। শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা ॥

চোর ধরণার্থে বিদ্যার মন্দিরে সিন্দূর লেপন

তখন পঞ্চাশ মণ আনিল সিন্দুব। পাঁচ সাত জন গেল রাজকন্যা-পূর ॥
কোটালে সম্মুখে দেখি চমকিত রামা। সখীসঙ্গে স্থানান্তরে গেলা গুণধামা ॥
কূটবুদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দী। সিন্দূরে মণ্ডিত কৈল না রাখিল্ সন্ধি ॥
খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ। সিন্দূরে মাখিয়া রাখে রজনী-রাজন ॥
মুহূর্তেকে পুনরপি হইল বাহির। বন্ধুবর্গ সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি করে স্থির ॥
বাপীতটে রজকে যথায় বস্ত্র কাচে। অলক্ষিতে অনুচর রাখে তার কাছে ॥
কোতোয়াল গেল জানি বিদ্যা বিধুমুখী। প্রবেশিলা নিজ গৃহে সঙ্গে যত সখী ॥
গৃহ খট্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন। সকলি সিন্দূর মাখা উচাটন মন ॥
কিবা তঞ্চ করে গেল কাল কোতোয়াল। প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল ॥
ছিলা হর্ষ হরিণাক্ষী হুতাশে শুকায়। কি আছে কপালে মোর কহা নাহি যায় ॥
ভাবিতে চিন্তিতে গেল নিশি অর্দ্ধযাম। হেনকালে উপস্থিত কবি গুণধাম ॥
ভার্য্যাকে ভাবিতা দেখি ভয় পেয়ে মনে। যতনে জিজ্ঞাসে কবি মধুর বচনে ॥
কহ লো কমলমুখি কি নিমিত্ত হেন। পেয়েছ পবমপীড়া প্রায় বুঝি যেন ॥

বিদ্যা বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথা।
কে কহিল তোমাকে আসিতে আজি হেথা ॥

কি তঞ্চ করিয়া গেল কোটাল চতুর। সকল গৃহেতে হেদে দেখ না সিন্দুর ॥
অকস্মাৎ কান্দে প্রাণ নাচে বাম্য আঁখি। পড়িবে প্রমাদে প্রভু এই তার সাক্ষী ॥

হেসে কহে কবি হরি এজন্য ভাবনা। কোন চিন্তা নাহি শুন কুরঙ্গনয়না ॥
সহস্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ। তথাচ কদাচ তার নাহি হব হাত ॥
রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনী। ঊষাকালে উঠে গেলা কবি শিরোমণি ॥
বসনে সিন্দুরমাখা দেখি কবিবর। হীরা প্রতি কহে মাসি এক কর্ম্ম কর ॥
নিশিযোগে বস্ত্রখানা দিও ধোপা বাড়ী। সংগোপনে কাচে যেন দুনা দিব কড়ী ॥
এত বলি স্বীয় কর্ম্মে চলিলা সুন্দর। সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর ॥
চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া। গুপ্তে একখানি বস্ত্র দিবে হে কাচিয়া ॥
অন্য ঠাঁই যে পাও দ্বিগুণ দিব আমি। প্রকাশ না হয় যেন বুদ্ধিমান তুমি ॥
ভাল ভাল বলিয়া রজক দিল সায়। হেসে হেসে হীরাবতী হাত লেড়ে যায় ॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সিন্দুর-চিহ্নিত বস্ত্র দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি এবং সুন্দরের সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন

প্রভাতে রজক গেল সরোবর-তীর আগে ভাগে সেই বস্ত্র করিল বাহির ॥
কোটালের অনুচর আছিল নিকটে। সিন্দুরের চিহ্নে বুঝে চোরের এ বটে ॥
দৌড়ে যেয়ে ঘাড় ধরে দেয় পাকলাড়া। তখনি কাপড় দিয়া বান্ধে পিঠমোড়া ॥
ঢেকাইয়া নিল যথা কোতোয়াল আছে। সিন্দুরে চিহ্নিত বস্ত্র ফেলে দিল কাছে ॥
কোপে কোতোয়াল কহে মুখে লাগে থুবী। কাঁহা চোর সেতাব বাতাওগে বে ধুবী ॥
কোই কহে সাহেব জি রহো এক সাত। হকীকত* বুঝা জাগা কহনে দেও বাত ॥
করপুটে সম্মুখে রজক কহে বাণী। কার বস্ত্র ভাল মন্দ আমি তো না জানি ॥
কালি রাত্রি মোর বাড়ী এসেছিল হীরা। বস্ত্র দিয়া বিস্তর দিলেক মাথা কিরা ॥
যে পাও দ্বিগুণ তার পাবা মোর ঠাঁই। লুকায়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই ॥
ইহা বই আমি নাহি জানি মহাশয়। অবিচারে নষ্ট কর উপযুক্ত নয় ॥
বাত এস্‌কা এহি হ্যায় চল ওস্‌কা পাশ। বেতস্কির বেচারা কো দেওজী খালাস ॥
ওকে নিয়া মাথায় বান্ধিয়া দিল চীরা। যাও শীঘ্র কি জানি পলায় পাছে হীরা ॥
কালান্তক যম যেন করি-পৃষ্ঠে উঠে। মুখপানে তাকাইতে গায়ে ঘর্ম্ম ছুটে ॥
লেঙ্গা তরোয়ার হাতে রাঙ্গা দুটি আঁখি। কাঁহা হীরা হীরা ডাকে করে হাঁকাহাঁকি ॥
সরদার গেল যদি তবে থাকে কে। ঝাটায়ে চলিল পাছে বাকি ছিল যে ॥
ঘোড়া উড়াইল বেগে সোয়ার হাজার। কাঁপে মাটি ডাকে হাঁকে রাজার বাজার ॥
ঘোরঘটা ঘেরে ঘররাড়ী মালিনীর। ডেক্যে হেঁকে হীরা বুড়ী হইল বাহির ॥
হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জ্বলে। অগ্নিতে ফেলিলে ঘৃত যেমন উথলে ॥
কেঁওরে হারামজাদী এহি কাম তেরা। সাত রোজ ফাক্কা লবেজান হুয়া মেরা ॥
কাঁহা সে লেয়াও চোর কৌন জাতি ওহি। কহ তুঝে কেত্তা মালিয়াৎ দিয়া সোহি ॥
খেলাপ কহগী বাত শির মোড়াওঙ্গা। গাদ্ধামে চড়ায়কে হিমাইত তোড়ঙ্গা ॥

* হকীবাত—ঠিক ঠিক বিবরণ।

কোটালের কটুবাক্যে কুপিল অধীরা। ভয় নাহি চোটপাট কথা কহে হীরা॥
এই সি রাঁড় নহি হোঁ দাবায় জাওগে। বেহেসাব কহগে তব সাজাই পাওগে॥
মু সামালো খুব নাহি কহ বের বের। রাজা কি সহরমে বেটা তেঁই হুয়া সের॥
কোতোয়াল কহে খান্দী তওভি করৃতি সোর।
ঝট নাহি কহো মেই তেরে ঘরৃমে চোর॥
হাত লেড়ে হীরা বলে থাক মেনে থাক। বুঝা গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ॥
আমি ঘরে চোর পুষি কহগে রাজারে। ওরে বেটা ঠেটা এটা কহে কেটা মোরে॥
লাফ দিয়া কোতোয়াল চুলে ধরে তার। দেখ্‌তো হারামজাদী এ কাপড়া কার॥
মজাইতে কুল ফুল যোগাইতে নিত্য। এ কলঙ্ক রহিল যাবৎ চন্দ্রাদিত্য॥
নির্ম্মল রাজার কুলে তুই দিলি কালি। আরো করো আঁটনী কুটনী মাগী শালী॥
পয়জার চট চট কিল গুম গুম। আঁকপাঁক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম॥
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে। বুকে হাঁটু দিয়া ঠেঙ্গ তুল্যে বান্ধে ঘাড়ে॥
তখনি কান্দিয়া কহে ভাইরে বাঘাই। নারীহত্যা করিও না জল দেও খাই॥
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল। হাসিয়া কোটাল তারে ধরিয়া তুলিল॥
রাখিল নজরবন্দী সোয়ার হাওয়ালে। কই চোর চোর বলি চৌদিকে নেহালে॥
ফুলের বাগান ভেঙ্গে তচনচ করে। নেজা হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে॥
সুন্দর সানন্দে জপে মহাকালী মন্ত্র। কোন কিছু নাহি জানে কোটালের তন্ত্র॥
ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিল। ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সুড়ঙ্গে পশিল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চোর ধরণার্থে কোটালের সুড়ঙ্গ খনন

অনিমিখে নিরখে বিবর নিশানাথ। অদ্ভুত মানিয়া চিত্তে নাকে দেয় হাত॥
কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে। কেহ বলে তবে ধরা না গেল ইহাকে॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে কোটাল বাঘাই। আমি যাহা বলি তাহা শুনহ সবাই॥
এই পথে আসে যায় বিদ্যার নিকটে। সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথা বটে॥
দেউড়ি জানিয়া কেহ প্রবেশে বিবরে। হাত পাঁচ সাত গিয়া হাঁপাইয়া মরে॥
আকুরে হুকুরে পুনঃ উপরে উঠিল। বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল॥
যে পার সে যাও ভাই খাও জায়গীর। বিদ্যার মন্দিরে নহে চোরের মন্দির॥
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম। সহরে পড়িল বড় বেগারের ধূম॥
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়। পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়।
তখনি হাজার তিন আনিল কোদালী। মজুরের নিখাবানা* পাঁচ শত ঢালী॥
খোষ তত্ত্ব কোতোয়াল ঘন ঘন ডঙ্কা। নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা॥
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা। কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছা॥
সহরে গুজব উঠে একে একশত। গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় বস্তে কেহ মণ্ডলের ঠাট। পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
এক সরা ভরা টিকা হুঁকা চলে দুটা। পোয়া দেড় গুড়াকু তামাক ঢেকী-কুটা॥

* নিখাবানা—ফার্সী 'নিগাহ্‌' থেকে। তত্ত্বাবধান।

কেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর। শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার ॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে। চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে ॥
পরম রূপসী তারা স্বর্গবিদ্যাধরী। বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী ॥
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে। সেই ক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাতে ॥
এথায় খন্দক খনে মজুর সকল। বড় বড় গৃহস্থের বাড়ী গেল তল ॥
সীমা মুড়া পর্য্যন্ত কাটিল খাই যদি। দেখিয়া ডরায় লোক যেন এক নদী ॥
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা। শুনি নাহি জন্মে কভু হেন কহে তারা ॥
কতকাল খন্দক খুদিল দিবা রেতে। কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে ॥
জ্ঞানী কহে থাকিবেক গূঢ় কিছু মর্ম্ম। মনে নাহি বুঝি ইহা সামান্যের কর্ম্ম ॥
পরম পুরুষ সেই চোররূপ ছলে। দেবকন্যা বিদ্যাবতী শাপে ধরাতলে ॥
কেহ কহে মিথ্যা নহে সত্য বটে ভাই। এখনি সভার কাছে কয়েছে বাঘাই ॥
চকিতে দেখেছে চোর বলেছে সমস্ত। সুড়ঙ্গে পশিল যেন সূর্য্য গেল অস্ত ॥
প্রথমে যে দেখিল সে কহে শুন এই। ইহাতে কে কহিবে সামান্য ব্যক্তি সেই ॥
কেহ কহে সে যে হোক এ বড় লহর। খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর ॥
কেহ কহে এতদিনে গেল মেনে ভয়। কেহ কহে দেখ ভাই আরো কিবা হয় ॥
ওথা কবি উপনীত প্রমদার পাশে। বিমল কমল মুখ মলিন হুতাশে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বালা স্থির রও। ভয় কি ভবানী বাণী বদনেতে কও ॥

বিদ্যাবাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ

নিরখিয়া পতি সতী অতি দুঃখযুতা। সজলনয়নে কহে বীরসিংহসুতা ॥
অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমাকে। রমণী নিমিত্ত কিছু না কবে আমাকে ॥
ধরিবে মারিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল। পশ্চাতে উপায় নাহি গর্ভে মোর কাল ॥
তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অভাগীর। বিজ্ঞ বট প্রভু বিবেচিয়া কর স্থির ॥
এক নিবেদন করি অবধান কর। দোষ নাহি প্রভু তুমি নারীবেশ ধর ॥
আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ। ভুলাইলা কামরিপু ঠাকুর মহেশ ॥
ভীম পরাক্রম ভীম শমন দোসর। নারীবেশে বধিলা কীচক বীরবর ॥
সূর্য্যবংশে জন্মে দশরথ নাম ভূপ। বিপদ সময়ে রাজা ধরে নারীরূপ ॥
জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা। পরিণামদর্শী যেবা কি তার যন্ত্রণা ॥
সধর্ম্মিণী বাক্য শুনি সায় দিলা রায়। সুন্দরী সমূহ সুখে সুন্দরে সাজায় ॥
আঁচড়ে চিরুণে চারু চাঁচর চিকুর। ললাটে সিন্দুর শোভা তম করে দূর ॥
সহজে সুন্দর মুখ বিনির্ম্মল ইন্দু। চন্দ্রমধ্যে চন্দ্রদীপ্ত সুচন্দন বিন্দু ॥
দশন মুকুতাবলী ওষ্ঠ বিম্বফল। শতনরী হার গলে শ্রবণে কুণ্ডল ॥
চঞ্চল নয়ন কোণে কত কামশর। বস্ত্রাবৃত দাড়িম্ব যুগল পয়োধর ॥
ভূষণে ভূষিত তনু যেখানে যা সাজে। হেরি রূপ রূপবতী নতমুখ লাজে ॥
সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান। সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই ভান ॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ কহে সহচরী। কাহার রমণী গো নিছনি* লয়ে মরি ॥

* নিছনি—বালাই, অশুভ।

নিশিযোগে যদ্যপি পুরুষ করে বিধি। বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি ॥
কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই। ইচ্ছা হয় কিছুকাল এই বেশে রই ॥
বাঘাই কোটাল উপস্থিত হেনকালে। সসৈন্যে ঘেরিল পুরী চৌদিক নেহালে ॥
সকলি রমণী ঘটা পুরুষ না দেখে। বুদ্ধিহারা ভাকা পারা ধূলা উড়ে মুখে ॥
সাহসে করিয়া ভর বিচরিল মনে। নারীরূপে আছে চোর সহচরী সনে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

চোরের স্ত্রীবেশানুভবে বিদ্যার সহচরীগণের খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা

তঞ্চ করে নিশানাথ, দীর্ঘে কাটে দশ হাত,
পরিসর হাত তিন সাড়ে।
করে ধরে খড়্গ ঢাল, হাঁটু পাতি কোতোয়াল,
খামটি করিয়া বৈসে পাড়ে ॥
ক্রোধে কহে পুনঃ পুনঃ, সহচরিগণ শুন,
তোমরা সকলে হও ধীরা।
মাতিয়া যৌবন মদে, রমণী দক্ষিণ পদে,
লঙ্ঘিবে যে তার বড কিরা ॥
অথবা পুরুষ যেই, লঙ্ঘিবে পরীক্ষা এই,
কদাচিৎ বামপদে কেহ।
সারোদ্ধার কহি আমি, হইবে রৌরবগামী,
সপ্তম পুরুষ শুদ্ধ সেহ ॥
কহিলাম আগে ভাগে, শত ব্রহ্মহত্যা লাগে,
ধর্ম্মপথে থাকিলে মঙ্গল।
জন্মিলে মরণ আছে, ভোগাভোগ হয় পাছে,
নারকির জনম বিফল ॥
কোটালের কটু কথা, কবি করে হেঁট মাথা,
বিচারিল ধরিল কোটাল।
পূর্ব্ব জগদম্বাদেশ, কদাচ না রবে ক্লেশ,
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি জঞ্জাল ॥
যা করেন কৃপাময়ী, যাম্য পদে পার হই,
কতকাল হৈয়া রব চোর।
যদি তরি বাম পায়, কোটাল সবংশে যায়,
ইহা কি উচিত ধর্ম্ম মোর ॥
শশিমুখী শকুন্তলা, সত্যবতী শশিকলা,
সর্ব্বাণী সুশীলা সত্যভামা।
রাধিকা রুক্মিণী রমা, রাজেশ্বরী রম্ভা উমা,
অপর্ণা অম্বিকা উষা শ্যামা ॥

জয়ন্তী যশোদা জয়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
হৈমবতী হীরা হরিপ্রিয়া।
একে একে সহচরী, বাম পদে গেল তরি,
ও কূলেতে দাঁড়াইল গিয়া ॥
যম তুল্য নিশানাথ, কখন দাড়িতে হাত,
কখন বা গোঁপে দেয় পাক।
সবাকার কাঁপে বুক, প্রাণ করে ধুকধুক,
কখন গভীর ছাড়ে ডাক ॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত কর গো মায়া পাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, তুয়া চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে ॥

সুন্দরের বামপদে খন্দক লঙ্ঘনার্থ বিদ্যার সহ কথোপকথন

একে একে পার হয় যত সহচরী। গদগদ কহে বিদ্যা কান্ত করে ধরি ॥
শুন শুন প্রাণনাথ বাক্য সারোদ্ধার*। বাম পদে একান্ত খন্দক হও পার ॥
ধরা গেলে কাটা যাবে নৃপতি দুর্জ্জন। তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ ॥
নহে শাস্ত্র সম্মত সসত্ত্বা* সহমৃতা। দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনা শূন্য পিতা ॥
অপমৃত্যু হবে তার যে করুন কালী। তুমি তো পণ্ডিত প্রভু একি ঠাকুরালী ॥
পূর্ব্বাপর শ্রুত বটে রাজনীতি ধর্ম্ম। জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে দুষ্টকর্ম্ম ॥
ভার্য্যা হেতু রামচন্দ্র সুগ্রীবে মিতালী। বধিল নিরপরাধে বানরেশ বালী ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শুন তার কার্য্য। অশ্বত্থামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য ॥
সুন্দরীর কথা শুনি কবি বিচক্ষণ। হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ ॥
কাল করে মুক্তি প্রশ্ন রামচন্দ্র সনে। কেহ মাত্র সঙ্গে নাহি দোঁহে সঙ্গোপনে ॥
কহে কৃপাময় কিন্তু কর সত্য পণ। এখানে দেখিবা যারে করিবা বর্জ্জন ॥
কালবাক্যে কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা স্বীকার। লক্ষ্মণ ঠাকুরে দিলা রক্ষা হেতু দ্বার ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়। দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি মিলিলা তথায় ॥
ভক্তিযুক্ত প্রণমিল মুনীন্দ্র চরণে। মুনি বলে যাব শীঘ্র রাম সম্ভাষণে ॥
মুনিবাক্যে মহাবীর কম্পিত শরীর। কোনরূপে চিত্তে বিবেচনা নহে স্থির ॥
যদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সম্ভাষণ। শ্রীরামের আজ্ঞা তবে হইবে হেলন ॥
একান্ত বিহিত নহে গমনাবরোধ। বংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোধ ॥
ত্যজ্য হব যদ্যপিচ আমি যাই তথা। সেই ভাল প্রভুকে জানাই এই কথা ॥
মুনি প্রবোধিয়া গেল রঘুনাথ কাছে। কাল কহে প্রভু তব আজ্ঞা পূর্ব্ব আছে ॥
এইক্ষণে ত্যাগ কর ঠাকুর লক্ষ্মণ। সরযুর নীরে বীর ত্যজিলা জীবন ॥
সৌমিত্রের শোকে প্রভু সম্বরিলা লীলা। রামায়ণে মহামুনি বাল্মীকি রচিলা ॥

সারোদ্ধার—মূল বা আসল কথা। সসত্ত্বা—গর্ভবতী।

সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাণপ্রিয়া। প্রাণ গেলে সল্লোকে* কি করে দুষ্ট ক্রিয়া॥
সেই রাজা যুধিষ্ঠির শুন তার কর্ম্ম। বকরূপে যেকালে ছলিলা তারে ধর্ম্ম॥
প্রশ্ন যদি কহিলেন কুন্তীর নন্দন। তথাপি কপটে প্রভু কহেন বচন॥
তুষ্ট হইলাম আমি বর মাগো যাই। যারে ইচ্ছা তাহে চাহ জীবে এক ভাই॥
ধর্ম্মবাক্য শুনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। পরিণামদর্শী রাজা করিলেন স্থির॥
সহদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল। তবে তো নৈরাশ তাঁর মাতামহকুল॥
কিঞ্চিৎ থাকিয়া কহে সর্ব্বগুণযুত। বাঁচাও জনেক প্রভু ভাই মাদ্রীসুত॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম্ম দিলা সাধুবাদ। চারি ভাই জীয়া উঠে ঘুচিল প্রমাদ॥
জমদগ্নি সুত জামদগ্ন্য মহাবীর। জনক আজ্ঞায় কাটে জননীর শির॥
পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুঞ্জে মুক্ত। মিথ্যা কথা নহে মহাভারতেতে উক্ত॥
সত্যবাক্য রক্ষা পায় যদি যায় প্রাণ। সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ॥
সত্য হীন ধর্ম্ম হীন বৃথা জন্ম তার। যতোধর্ম্মস্ততোজয় বাক্য সারোদ্ধার॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

অথ চোর ধরণ

অশ্বত্থামা হত প্রিয়ে কহিলে বচন। সেই পাপে নৃপতির নরক দর্শন॥
অবিচারে রঘুনাথ বালী কৈলা বধ। ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙ্গদ*॥
কর্ম্মভোগ কার খণ্ডে ধরণীমণ্ডলে। অন্য কে কোথা থাকে রামচন্দ্রে ফলে॥
মম হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোটাল। কহ প্রিয়ে কিরূপে রহিবে পরকাল॥
বিদ্যা কহ প্রাণনাথ যে কহে সে বটে। কি কথা কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে॥
সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাস। সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ॥
ভবিষ্যৎ কর্ম্ম এইক্ষণে কেন ভাবি। তখনি তেমন কব যে কহান দেবী॥
কোন চিন্তা নাহি মত্ত-কুঞ্জর-গামিনী। দুঃখ দূর করিবেন পুরারি-কামিনী*॥
ভক্তিভাবে ভাব ভয়-ভাঙ্গা রাজা পদ। শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ॥
করাল-বদনী বলি বাড়াইল পা। হেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাঁপে গা॥
দক্ষিণ চরণে তরি দাঁড়াইল পাড়ে। ব্যাঘ্রপ্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে॥
সুরত্ন ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে। কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহনাদ পুরে॥
কেহ বা বরশা হানে কেহ তরোয়ার। ঘিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার॥
কেহ বলে বহু দুঃখ পেয়েছি হে ভাই। ঘাড় ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি খাই॥
কেহ বলে লাঠিতে মাথার ভাঙ্গি খুলি। কেহ বলে থাক তুমি আমি করি গুলী॥
কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়ি। কাঁকালি পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি॥
তীরে তীরে জরজর করি হে ইহারে। পোড়াইয়া মার রাজা কি করিতে পারে॥
পটুকা* খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত। বিদ্যা কহে ধর্ম্ম কোথা ওহে প্রাণনাথ॥
মর্ম্ম দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছাড়ে। বুক চিরা মাণিক্য লইল কেবা কেড়ে॥

---

* সল্লোকে—সাধু লোকে।
ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙ্গদ—এখানে ভাগবতে ব্যাধের হাতে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত।
পুরারি-কামিনী—কালী। পটুকা—কোমরবন্ধ।

সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু। তোমা পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃষকেতু ॥
পূর্ব্বের কঠোর পাপে বামদেব বাম। হারাইল তোমা হেন রূপ গুণধাম ॥
কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে। ঢেকা* মেরে দূরেতে ফেলিল নিশীশ্বরে ॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে। চুল ছিল এলো* শীঘ্র দুই করে বান্ধে ॥
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে। মনঃসাধে ধরা দিল ভৎর্সিতে রাজারে ॥
মদনমোহনরূপে সবে মোহ যায়। অনিমেষ বাঘাই সুন্দর পানে চায় ॥
কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর। বিদ্যা বলে পরাণ-পুতলি বটে মোর ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি ॥

সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি

দয়িত দুর্গতি দেখি, দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী,*
দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে, ধীহারা ধুচয় বাড়ে,
ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্ম্ম ছুটে ॥
মণিহারা ফণি পারা, জীয়ন্তে মরমে মরা
মোহযুতা মুনি-মনোহরা।
নয়নে নির্গত নীর, নিশায় নিম্নগাতীর,*
নাথার্থে পদ্মিনী যেন জরা ॥
স্বপ্নে সতী স্বামী সঙ্গে, সরস চাতুরী রঙ্গে,
সুখে মুখে মুখ দিয়া রয়।
বিদ্যা বিনোদিনী বালা, বিনোদ বকুলমালা,
বিভু গলে দিতে জ্ঞান হয় ॥
বিদ্যা কহে হে মা কই, কি করিলা কৃপাময়ি,
কোথা যাব কি হবে উপায়।
এই যে ছিলাম সুখে, একি দশা এক টুকে,
আত্মহত্যা দিব গো তোমায় ॥
বিষম বিরহানলে, বপু বিপরীত জ্বলে,
বিদগ্ধ বল্লভ দিলা আনি।
রোপিলাম প্রেমতরু, না ফলিল ফল চারু,
উপাড়িলা অঙ্কুরে আপনি ॥
প্রভু পূর্ব্বে প্রাণ বলে, পশ্চাৎ পাবকে ফেলে,
পলাইলা পাপে দিলা মন।
তোমার তুলনা তুমি, তরুণ তরুণী আমি,
ত্যাগ কর ত্বদঙ্গজ জন ॥

---

* ঢেকা—ধাক্কা। এলো—খোলা, অবদ্ধ।
* দ্বিজরাজমুখী—চন্দ্রমুখী নিম্নগাতীর—নদীতীর।

জনক যমের তুল, জননী যাতনা মূল,
জামাতা জীবনে করে বধ।
ভাবিয়া ভরসা সার, ভুবনে না দেখি আর,
ভয় ভাঙ্গা ভবানীর পদ ॥
ক্ষাপরে ফেপর রূপা,* ফলত কর গো কৃপা,
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে, এমত উচিত নহে,
দূর কর দাসের উৎপাত ॥

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি

ভূতলে আছাড়ে গা, কপালে কঙ্কণ ঘা,
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার, অশোক কিংশুক হার,
গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত ॥
যথোচিত স্বামী দণ্ড, কোতোয়াল ভানুচণ্ড,
প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্নিকটে।
রাকা সুধাকরমুখী ফুল্ল ইন্দীবর আঁখি,
এবে কর্ম্মে ব্যক্ত সেই বটে ॥
বিদ্যা বলে প্রভু ভাল, না বুঝিলা কালাকাল,
দেখ যুগধর্ম্ম এ সকল।
পরিণামে তব দৃষ্টি, অভাগীর মজে সৃষ্টি,
তার তো সাক্ষাতে এই ফল ॥
হেদে হে কোটাল ভাই, ভগ্নী আমি ভিক্ষা চাই,
ছাড়হ আমার প্রাণনাথ।
ধর্ম্ম পথে দৃষ্টি কর, বারেক বচন ধর,
হের এই যোড় করি হাত ॥
প্রাণ মোর নহে চোর, এত জোর মিছা সোর,
এতে তব লাভ আছে কি।
পরিত্রাণ কর প্রাণ, দেহ দান রাখ মান,
পুণ্যবান তুমি শুনিয়াছি ॥
মম কান্ত শিষ্ট শান্ত, রাজা ভ্রান্ত কি দুর্দ্দান্ত,
আদ্যোপান্ত কৃতান্ত সমান।
শুন ওহে মিথ্যা নহে, তনু দহে কত সহে,
সৃষ্টি রহে বল হে বিধান ॥

---

* ফেপর রূপা—হতবুদ্ধি

কোন্ ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম, পোড়ে মর্ম্ম গাত্র চর্ম্ম,
দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ এই বেশ, পায় ক্লেশ কৃপালেশ,
কর ভাই অকাল মরণে॥
চক্ষু লাল কোতোয়াল, কহে ভাল ঠাকুরাল,
এই কাল জঞ্জালের মূল।
জান আমা ওগো রামা, গুণধামা কর ক্ষমা,
ভাব শ্যামা হইবে প্রতুল॥
তুমি সতী গুণবতী, ভগবতী প্রতি মতি,
সামান্য মানুষ নহে এহ।
রঘুবর হলধর, পুরন্দর সুধাকর,
পঞ্চশর ইতিমধ্যে দেহ॥
এত বলে বাক্য ছলে, যায় চলে রামা টলে,
পুনরপি পড়ে মহীতলে।
কহে রাম দুর্গানাম, অর্দ্ধ যাম জপ কাম,
পূর্ণ হবে দেবী অনুবলে॥

চৌর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ

শুনি লোক মুখে, রাণী মনোদুঃখে, গেল বিদ্যাবতী বাসে।
নন্দিনীর পতি, নিরখিয়া সতী, নয়ন সলিলে ভাসে॥
অভিন্ন মদন, পূর্ণেন্দু বদন, কনকচম্পক কান্তি।
এ হেন তস্কর, শশী কি ভাস্কর, পামর লোকের ভ্রান্তি॥
রূপ কব কিবা, চারু কম্বু গ্রীবা, শুক চঞ্চু তুল্য নাসা।
নিন্দি কুন্দ কলি, শোভে দন্তাবলী, সুধাধিক মৃদুভাষা॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত, করি কর-দর্পহর।
ফুল্ল কোকনদ, মঞ্জু যুগপদ, নাভি ভূধর বিবর॥
বিদ্যাবতী মুখে, মুখ দিয়া দুখে, ডুগরিয়া কান্দে রাণী।
জন্মে জন্মে পাপ, হেন মনস্তাপ, ভুঞ্জিব স্বপ্নে না জানি॥
কি বিদগ্ধ বিধি, রসময় নিধি, নিরমিল তোর লাগি।
অনেক যতনে, লতা এ রতনে, হারালি ছি ছি অভাগী॥
আরাধিলি বিদ্যা, ত্রিভুবনারাধ্যা, মহাবিদ্যা ভদ্রকালী।
পূর্ব্ব কর্ম্ম ভোগ, স্বামির বিয়োগ, যত তাঁর ঠাকুরালী॥
কিবা কব তোরে, না কহিলি মোরে, গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা।
বিধির লিখন, না হয় খণ্ডন, এখন কে পায় জ্বালা॥
ভূপতি দুর্ব্বার, নাহিক নিস্তার, নিতান্ত কাটিবে চোরে।
হয়ে থাক রাঁড়ী, পোড়াইতে নাড়ী, এতেক দুষ্কর্ম্ম তোরে॥

শ্রীপ্রসাদ কহে, কথা মিথ্যা নহে, কালীর কিঙ্কর যেই,
তার দুঃখ কিবা, সদা সঙ্গে শিবা, ভুবন বিজয়ী সেই ॥

বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান

স্নান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী। মুদ্রিত লোচনে ভাবে রূপ কাদম্বিনী ॥
কৃতাঞ্জলি কহে কৃপাকর কৃপামই। দাস তব দয়িত দুঃখিনী দাসী হই ॥
আজ্ঞা ছিল তব সে আসিবে এথা একা। এখন এ দশা একি অদৃষ্টের লেখা ॥
ক্ষিতিপতি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে স্বামী। ক্ষেমঙ্করি ক্ষম দোষ ক্ষীণা দীনা আমি ॥
নিতান্ত দেখিনু দুর্গা মন্ত্র জপে যেই। হেদে গো করুণাময়ি তার দশা এই ॥
কি কব মহিমা সীমা পদতলে ভব। উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব ॥
তপস্বিনী ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রী। যশোদা-জঠোরজাতা জায়া জগদ্ধাত্রি ॥
পার্ব্বতি পরমেশ্বরি পশুপতিদারা। প্রভাকর-পুত্র-পীড়া-হরা পরাৎপরা ॥
বিদেশে বল্লভ বীরসিংহ করে নষ্ট। দনুজদলনী দেবী কেন দেও কষ্ট ॥
দৈববাণী শুনে রামা ভয় নাহি তোর। সুন্দর সামান্য নহে বরপুত্র মোর ॥
প্রহরের পরে পুনঃ পতি পাবে সতি। কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি ॥
এ কথা কহিলা যদি শঙ্কর-ঘরণী। জলধি তরণে যেন মিলিল তরণী ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

চৌর দর্শনে নাগরিক জনের খেদ

ধরা গেল চোর পড়িল নগরে। বাল বৃদ্ধ যুবা আর নাহি রয় ঘরে ॥
স্তন্য পান করে শিশু কোলে যে ধনীর। মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির ॥
রন্ধনশালায় রামা রন্ধনে যে ছিল। আথার উপরে হাঁড়ী রাখিয়া চলিল ॥
বেগে ধায় নাহি চায় পিছুপানে ফিরা। কেহ কহে দাঁড়া লো মাথায় লাগে কিরা ॥
একজন প্রতি আরজন বলে কই। সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখ্ ওই ॥
হেরি হেরি বদন দুখেতে অঙ্গ দহে। কুলবধূ চিত্রিত পুত্তলী যেন রহে ॥
কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি। হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি ॥
সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে। আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে ॥
রাজা লবে প্রাণ সই কোন্ মূর্খ কহে। সাধ্য নহে তার যার দেহে আত্মা রহে ॥
নিরখিয়া নরপতি এ রূপ বিচিত্র। না হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিত্র ॥
আছাড়ী পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা। ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা ॥
পতিপুত্র হীনা দীনা শুন গুণরাশি। কে কহিল তোমাকে কহিতে মোর মাসী ॥
দ্বাদশ বৎসর বাছা খেয়েছি গোঁসাই। তারপর কিছুমাত্র শোক জানি নাই ॥
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর। লোকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর ॥
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে। তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে ॥
তব মৃত্যু কথা তব শুনিলে মা বাপ। তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ ॥
বয়স্তা তব যার যার সঙ্গে আছে। ছাড়িবেক প্রাণ তারা বার্ত্তা গেলে কাছে ॥
তোমার মরণে এত লোকের মরণ। কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন ॥

দরবারে বার দিয়া বসেছে ভূপাল। হেন কালে চোর নিয়া গেল কোতোয়াল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি পুটাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

রাজার সহিত চৌরের ব্যঙ্গোক্তি

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়। তপ্ত তপনীয় তনু তারাপতি প্রায়॥
প্রমথেশ-প্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন। ভালে বিন্দু বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন॥
প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চি চয় চতুর্দ্দিকে দ্বিজ। পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মখভুজ॥
কিঙ্কর নিকরে করে চামর ব্যজন। মস্তক ধবল ছত্র কিবা সুশোভন॥
তদুপরি চন্দ্রাতপ তমঃ করে দূর। বাম ভাগে মহাপাত্র পরম চতুর॥
পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য। যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত॥
দুদিকে সোয়ার* খাড়া বুকে ধরে ঢাল। কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল॥
সেলাম করয়ে হাতী সম্মুখে মাহুত। পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যমদূত॥
চোপদার* নকীব হুজুরে খাড়া আছে। বাঘাই কোটাল চোরে নিয়া গেল কাছে॥
গরীব নেওয়াজ* বলি আদবে সেলাম। নজর দৌলত এই চোর লেয়া হাম॥
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি। সতত নির্ভয় দীপ্যমান যেন রবি॥
অপাঙ্গ লোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ। পরমপুরুষ চিত্তে জানিলা স্বরূপ॥
ধন্যা কন্যা অন্বেষণে মিলাইল পতি। বররূপে কোন দেব ভ্রমে বসুমতী।
রেবতী রমণ কিম্বা কিম্বা বৃষকেতু। কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরম্ভা হেতু॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই। রাজা বলে কাট চোর মশানে বাঘাই॥
আঁখি ঠারে আরবার করে নিবারণ। মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন॥
পর্ব্বতজা পাদপদ্ম মানসে প্রণাম। হাসি হাসি সুধাভাষা কহে গুণধাম॥
কাট রাজা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যুভয়। গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয়॥

শ্লোক:

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বল লালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদ গণিতামিব চিন্তয়ামি** ॥

অন্যার্থ

অদ্যাপি সা কনকচম্পকদাম তনু। প্রফুল্ল কমলমুখী ভুরু কামধনু॥
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদনবিহ্বল। চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কথা শুনি কাঁপে তনু কুপিত ভূপাল। কহে মশানেতে চোর কাটরে কোটাল॥
কবি কহে কিছুকাল থাক রে বাঘাই। গোটা দুই চারি কথা আরো কহা চাই॥

---

* সোয়ার—অশ্বারোহী সেনা। চোপদার—আশাশোঁটা বাহক ভৃত্য।
নেওয়াজ—নেবাজ (ফার্সী), পৃষ্ঠপোষক। ** শ্লোকটি কৃষ্ণরাম দাসে ও ভারতচন্দ্রে আছে।

শ্লোক ঃ

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং।
পশ্যামি মন্মথশরানল পীড়িতানি
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি* ॥

অস্যার্থ

অদ্যাপি সে শশিমুখী সুলভ যৌবনা। পীনপয়োধরা বাল কুরঙ্গনয়না।
তদঙ্গ পরশে অঙ্গ সদা সুশীতল। চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল ॥
কাট কাট শব্দ রাজা কহে পুনঃ পুনঃ। কবি কহে গোটা দুই কথা আরো শুন ॥

শ্লোক ঃ

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলুব্ধ
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফ[illegible]চুম্বিতগণ্ডদেশাম্।
কেশাবধূতকর পল্লব কঙ্কণানাং
তাং নোদপৈতি নিচয়ঃ সুরতং মদীয়ম্ ॥**

অস্যার্থ

অদ্যাপি মুখারবিন্দ সুগন্ধ বিশেষ। অলিকুল ব্যাকুল চুম্বিত গণ্ডদেশ ॥
কম্পিত চিকুর কর কঙ্কণ সুধ্বনি। মন মম মোহিত স্মরতিনিতম্বিনী ॥
রাজা বলে নিয়া যাও মশানে রাঘাই। কবি কহে গোটা দুই বচন শুনাই ॥

শ্লোক

অদ্যাদি বাস গৃহতো ময়ি নীয়মানে
দুর্ব্বারভীষণরবৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে
কর্ত্তুং ন পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনোমে ॥***

অস্যার্থ ঃ

অদ্যাপি আমাকে বাসগৃহ হতে চর। কেশে ধরে নিল যেন শমন কিঙ্কর ॥
কি কি চেষ্টা না পাইল মদর্থে কামিনী। কিবা কব দহে দেহ দিবসরজনী ॥
অদ্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহরতি। নিরখি মুদিলে আঁখি বিদ্যার মুরতি ॥
সুপ্ত পতি মৃতপ্রায় বাক্য নাহি মুখে। বিপরীত কাজে বিদ্যা চড়ে তার বুকে ॥
নগ্ন বিদ্যা মুক্ত কেশে দন্তে কাটে জী। নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি ॥
থরথর কাঁপে ভূপ ক্রোধভাবে চায়। রাজা বলে কাট চোরে খর খড়্গ ঘায় ॥
কবি কহে কন্যা তব পরম রূপসী। তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অসি ॥

* শ্লোকটি কৃষ্ণরাম দাসে আছে, ভারতচন্দ্রে নাই।
** শ্লোকটি কৃষ্ণরাম দাসে ও ভারতচন্দ্রে নাই।
* * শ্লোকটি ভারতচন্দ্রে ও কৃষ্ণরামে নাই।

পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া। জীয়ায় যুবতী বিম্বাধরামৃত দিয়া॥
ঘূর্ণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে। এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে॥
কবি কহে কামান বিদ্যার যোড়া ভুরু। সতত নিকটে ধরা বটি কল্পতরু॥
তাহাতে নয়নবাণ বিষম সন্ধান। শশিমুখী হাসি ভস্মরাশি করে প্রাণ॥
কি জানি কি মন্ত্র জানে বিদ্যা গুণবতী। পুনরপি প্রাণদান পাই নরপতি॥
বাক্য পীড়া মহা ব্রীড়া বীরসিংহ বলে। এ বেটাকে ফেল নিয়া করি-পদতলে॥
মনোমত্ত কুঞ্জর মাহুত পুষ্পধনু। সতত হুলায় হাতী কমলিনী অনু॥
তার তলে পড়ে রাজা প্রাণ যায় মোর। চোর চোর বলে তুমি মিছা কর সোর॥
আপনি সাক্ষাৎ যম মৃত্যুরূপা কন্যা। রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এই রূপ ধন্যা॥
মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা। বিদ্যায় ঘটায়ে কবীশ্বর কহে তা॥
রাজা বলে মিথ্যা বাক্যছলে কাজ নাই। মশানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই॥
হাসি হাসি গুণরাশি সভা সাক্ষী করে। জামাতা কহিলা সত্যবাদী নৃপবরে॥

শ্লোক

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং নিজপৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥***

অস্যার্থ

অদ্যাপিও হলাহল নমুঞ্চতি হর। অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কূর্ম্মবর॥
অদ্যাপিও বাড়বাগ্নি জলনিধি বহে। সাধু বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে॥
রাজচক্রবর্ত্তী কিন্তু রীতি কদাচার। লোক ভয়ে ধর্ম্ম ভয় না দেখি তোমার॥
মম বীর্য্যে ভূপতি যে জন্মিবে সন্তান। পরম দুর্ল্লভ সে দিবেক পিণ্ডদান॥
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল। তথাপিও সাম্য নহ একি ঠাকুরাল॥
একান্ত লজ্জিত রাজা কুমার বচনে। অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে॥
ভূপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র ধীর। তুরক্ষর বাক্য কহ নির্ভয় শরীর॥
সত্য কথা কহ চোর থাক কোন্ গ্রাম। কাহার তনয় কোন্ জাতি কিবা নাম॥
দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়। যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয়॥
কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মূঢ়। খাও হে বাপের কলা দিয়া ঝোলা গুড়॥
দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র। হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র॥
বন-পশু বুঝেছি বলিয়া যেন তুড়ি। রাঙ্গা বট যেন সার কাঁঠালের গুঁড়ি॥
ছয়মাস গতে কর্ম্ম সুধাও কি জাতি। কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি॥
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক। দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর। চাষায় পরশ পায় দুনা বাড়ে দর॥
অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান। সভাস্থ পণ্ডিতগণ হন হতজ্ঞান॥

*** শ্লোকটি ভারতচন্দ্রে ও কৃষ্ণরামে আছে।

দ্বিজগণ কহে কহ রূপগুণযুত। কোন্ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুত॥
কহে গুণরাশি হাসি শুন ধীরচয়। তোমা সবাকারে কহি নিজ পরিচয়॥
জনম মানবকুলে শম্ভুধাম ধাম। পিতামাতা শিবশিবা কালিদাস নাম॥
কোনরূপে নিতান্ত না পরিচয় মিলে। কোতোয়াল সঙ্গে রাজা বসিলা বিরলে॥
হেদে নিশানাথ সুতানাথ এই বটে। এমন সুপাত্র বহুভাগ্য হেতু ঘটে॥
বধ করা মত নহে দিব কন্যাদান। কিন্তু তুমি নিয়া যাও দক্ষিণ মশান॥
কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে যুক্তি। কৌশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি॥
পুনঃ পুনঃ কহি যত কাটিবারে চোর। রেয়াতি করিস্ বেটা ও কি বাপ তোর॥
ভূপতিভারতী শুনি কুপিল কোটাল। দুই চক্ষু ঘুবায় ঘুরায় খড়্গ ঢাল॥
চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা। কবি কহে কৃপামই কালী কোথা গেলা॥
ক্ষণমাত্র উত্তরিল দক্ষিণ মশানে। কেহ চড মারে কেহ চুল ধরে টানে॥
বর্বাশ হানিতে বুকে চাহে কেহ কেহ। কাঁপর হইল থরথর কাঁপে দেহ॥
মার্ মার্ কাট্ কাট্ করে মহাধূম। ফাঁকি ফুকি সার নাই কাটিতে হুকুম॥
কিছু কাল ছিল কবি ডরেতে নীরব। কৃতাঞ্জলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্তুতি

ক

কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি। কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি॥
কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার। কপর্দ্দি*-কামিনি কিবা করুণা তোমার॥

খ

খ* ভরে ভ্রমহ মাগো হের হের ভয়। খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয়॥
খব খড়্গ করে ধর্য্যে খল খল হাসি। খলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আসি॥

গ

গিরিবরসুতা গৌরি গণেশ-জননি। গগনবাসিনি বিদ্যা গিরীশ-গৃহিণি॥
গয়া গঙ্গা গৌতমি গোমতি গোদাবরি। গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শঙ্করি॥

ঘ

ঘনাঘন রূপা দেবি ঘননিনাদিনি। ঘেরিল কোটালঘটা ঘোর শব্দ শুনি॥
ঘৃণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ। ঘরে ঘরে ঘোষণা কুযশ তব এহ॥

চ

চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি। চতুর্দ্দলচক্রে চক্রচরবিভেদিনি॥
চঞ্চলচরণভরে চমকিত ফণী। চাঁচর চিকুর* চারু চুম্বিত ধরণী॥

---

* কপর্দ্দি—শিব। খ—আকাশ। চাঁচর চিকুর—কুঞ্চিত বেশ।

ছ

ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা। ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মাগো কিবা ॥
ছলছল চক্ষু ছাতি ফাটে গো বন্ধনে। ছটফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে ॥

জ

জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন। জাহ্নবী জকার পঞ্চ দুর্ল্লভ বচন ॥
জন্মিলাম কোথায় জীবনে হেথা মরি। জয়ঙ্করি রক্ষা কর জগত ঈশ্বরি ॥

ঝ

ঝিকিমিকি খড়্গ করে ঝেকে উঠে ঢালি। ঝাটা পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কর কালি ॥
ঝাড়া ঝাড়ে কোটালিয়া ঝাড়া লয়্যে হাতে। ঝিমাইতে মন গো ঝঞ্ঝনা পড়ে মাথে ॥

ট

টঙ্কার ধনুক শব্দ টোটাই মা বলে। টল টল কাঁপে দেহ টাঙ্গী মারে গলে ॥
টিকী ধর্য়ে টানে টনটন করে শির। টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর ॥

ঠ

ঠগগুলা ঠেসে ধরে ঠোঁটে এল প্রাণ। ঠাকুরাণি ঠাকুরালি ছাড়ি কর ত্রাণ ॥
ঠাহর না পাই ঠাট ঠাটে কত ধায়। ঠেঁটা দায় ঠেকলাম ঠাঁই দেহ পায় ॥

ড

ডুকরিয়া কান্দি ভয়ে বান্ধ্যা দুটি হাত। ডরাইয়া উঠি ডাক ছাড়ে নিশিনাথ ॥
ডিঙ্গিয়া ডাইন পায় মারা যাই প্রাণে। ডাকিনী সহিত শীঘ্র উর গো মশানে ॥

ঢ

ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে ঢেকা মারে ঢালি। ঢঙ্গ বেটা ঢেমন বলিয়া দেয় গালি ॥
ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়া ঢুলিয়া পড়ে গায়। ঢল ঢল করে আঁখি আড়ে আড়ে চায় ॥

ত

তপস্বিনি ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রি। ত্রিপুরারি-ত্রিপুরা-তারিণি জগদ্ধাত্রি ॥
তব তত্ত্ব ত্রিলোচন সবে মাত্র জ্ঞাত। তথাপি তাঁহার তরে মায়া কর কত ॥

থ

থরথর কাঁপি স্থির কর মহামায়া। স্থান দেহ স্থলপদ্মপদে শম্ভুজায়া ॥
স্থাবরজঙ্গম তোমা ভিন্ন কিছু নহে। স্থান দিলে মোরে কৃপামই নাম রহে ॥

দ

দিগম্বরি দনুজদলনি দাক্ষায়ণি। দুর্গতিহারিণি দুর্গে দুরিতমোচনি ॥
দাসে দুঃখ দেহ মা কিরূপ দয়ামই। দাসীপুত্র দাসীর দয়িত দৈবে হই ॥

ধ

ধূর্জ্জটিধামিনি ধরাধরেশকুমারি। ধীমান ধিয়ায় ধাম ধৈর্য্য মানা করি ॥
ধরণীভূষণ ধীর ধর্ম্ম কিছু নাই। ধিক্ ধিক্ ধর্য়ে বধে বলিয়া জামাই ॥

ন

নমো নিত্যে নারায়ণি নৃমুণ্ডমালিনি। নবীন-নীরদ-নীল-নিন্দিত-বরণি॥
নলিননির্জ্জিতে নেত্রকোণে চাও শিবে। নতুবা নিশ্চয় নরহত্যা মা লাগিবে॥

প

পতিতপাবনি পদ্মা পর্ব্বতনন্দিনি। প্রমথেশপ্রিয়া পাপপুঞ্জবিমর্দ্দিনি॥
পদ্মযোনি প্রভৃতি পঙ্কজপদভারে। পার নাই মহিমার পামর কি পারে॥

ফ

ফাপরে ফিরিয়া চাও ফণীন্দ্ররূপিণি। ফের দিয়া ফান্দে ফেলে বধে গো জননি॥
ফট করে কটু কহে ফিক্ ফিক্ হাসে। ফুৎকারে কোটাল মারে রক্ষ নিজ দাসে॥

ব

বিশ্ববিভুদারা গো বারেক দয়া কর। বিধির বিধাতা বট বিঘ্নরাশি হর॥
বলিতে বদন এক বাক্য কব কি। বিবেক বিদরে বুক ব্যস্ত হইয়াছি॥

ভ

ভবানি ভৈরবি ভীমা ভবের বনিতা। ভেশ ভয়ঙ্করা রাত্রি ভূধরদুহিতা॥
ভগবতি ভারতি গো ভবের ভাবিনি। ভক্তজনবৎসলা মা ভুবনপালিনি॥

ম

মহেশ্বরি মহামায়া মহেশমোহিনি। মূঢ়মতি মানব মহিমা কিবা জানি॥
মহীপতি মন্দমতি মত্ত ধনমদে। মহিষমর্দ্দিনি মাগো স্থান দেহি পদে॥

য

যোগরূপা যশস্বিনি যশোদানন্দিনি। যোগেন্দ্রযোষিতা যজ্ঞসমূলঘাতিনী॥
যুগল চরণপদ্মে যদি দেহ স্থান। যশ থাকে মা যদি করগো পরিত্রাণ॥

র

রণরসে রত রমা রুক্মিণি রোহিণি। রাক্ষসসংহারকর্ত্রি রাঘবরমণি॥
রঙ্গিণি রুদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মশানে। রাজা করে বধ রাখ আসিয়া আপনে॥

ল

লহলহ লোলজিহ্বা লোহিত বদন। লীলায় বধিলা যত দুষ্ট দৈত্যগণ॥
লক্ষিতে না পারি মাগো চরিত্র তোমার। লক্ষ্মীরূপা ক্ষম দোষ যতেক আমার॥

ব

বিধিমত বিদ্যাবতী বিচারে হারিল। বাপে না বলিয়া বিদ্যা বিরলে বরিল॥
বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিংহ রায়। বিরহিণী বিনোদিনী কি তার উপায়॥

শ

শিবে শবাসনা শবশিশু শোভে কানে। শত্রুগণে শিরে ধরি বধে শ্মশানে॥
শঙ্করি শরণ মাত্র তোমার চরণ। শীঘ্র শান্ত কর শ্যামা নিকট মরণ॥

স

সংসারসাগরে সার সবেমাত্র তুমি। স্মরণ লয়েছি সরসিজপদে আমি ॥
সবে সুখসম্পদদায়িনি সনাতনি ॥ সমর্পিলা শক্রহস্তে শিবসীমন্তিনি ॥
শঙ্করসুন্দরি সত্য তব ঠাকুরালি। সুন্দর শ্বশুরপুরে সারা হয় কালি ॥

হ

হত্যা হই হুতাশে হিংসার তুমি মূল। হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অনুকূল ॥
হাকারিয়া হান হান কাট কাট ডাকে। হুহুঙ্কারে হিয়া ফাটে পড়েছি বিপাকে ॥

ক্ষ

ক্ষীণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষমা নাহি করে। ক্ষেমঙ্করি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে মোরে ॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষুণ্ণ মন সদা। ক্ষপাদিবা* জ্ঞান নাহি ক্ষম মা শারদা ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দর প্রতি কালীর অভয়দান এবং মশানে মাধব ভট্টের আগমন

চতুস্ত্রিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কবি। দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতুষ্টা দেবী ॥
কহেন করুণাময়ী কেন ভয় পাও। নৃপতিপূজিত হৈয়া নিজ দেশে যাও ॥
ভয় নাহি ভয় নাহি বাছারে সুন্দর। কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিঙ্কর ॥
পর্ব্বত চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ। ছায়ারূপে সদা আমি থাকি তব সঙ্গ ॥
ভাবরে ভকত নর কালী কল্পতরু। তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু ॥
চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লভে একান্ত। আজ্ঞা কিন্তু আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ॥
ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে। ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে ॥
শিষ্ট কষ্ট রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেহ কহে। দ্বিতীয় ব্যক্তিতো সে সামান্য সাধ্য নহে ॥
হলাহলামৃতামৃত রস হলাহল। ক্রিয়া ক্রিয়া কলিকালে শীঘ্র ফলাফল ॥
পরম সংস্কৃত বিদ্যা গুরুরতিগম্যা। বীর্য্যবন্ত সাধকজনার মনোরম্যা ॥
সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথে। কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত ॥
কিরূপ কালীর কৃপা কহা নাহি যায়। মাধব নামেতে ভট্ট মিলিল তথায় ॥
জরির পোষাক পরা বেশ চিরা মাথে। কনকে জড়িত হীরা নবরত্ন হাতে ॥
চিকণ পাথর শিরে চকমক করে। বহুমূল্য তরুণতপনতেজো ধরে ॥
ডোরে লট্‌কা* তলোয়ার কোমরে খঞ্জর। চাঁদ মুখে চাঁপদাড়ি পরম সুন্দর ॥
বুকেতে চাপ্পানি ঢাল তুরগের পৃষ্ঠে। বাঘাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে ॥
ক্রোধেতে আরক্ত বক্ত্র দেহ স্থির নহে। কোটালের প্রতি কোপে কটু কথা কহে ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কোটালের প্রতি মাধব ভট্টের উক্তি

ভট্টভাখা। থরথর দেহ কোপযুত ঘনঘন নিরখই যামিনীনাথবয়ান।
রকত রদ* ছদ বদহি রাজন দারুণ দরপ ছোড়ল তুহ জ্ঞান ॥

---

* ক্ষপাদিবা—রাত্রিদিন। * ডোরে লটকা—দড়িতে ঝোলানো। রদ—দাঁত।

লালন স্থন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ হোয়ত রোয়ত* ভাট।
ধৃত করপর খর খঞ্জর ঝাঁকই হাঁকই বে পহেলা মুঝে কাট॥
ছুঁন্দর ছো গুণসিন্ধু কি নন্দন ক্যা কহুঁ যাকো ভয়ানী* ছহায়।*
জাকর লাগি জাগি বহু যামিনী চিরদিন পূজন পড়নি ধেয়ায়॥
পরম নরবর তুহ বি মুরখ বুঝাও হাম বাতমে ছাত মেরা আও।
রাজাকি পাছ খালাস করো যাকর স্থন্দরকো গজরাজ ঠাহরাও॥
দো আঁখিয়া ঘোমাইয়া* বের বের কোটালিয়া দেওতোর মুঝে গারি।
মট দোহাই লাগে তুঝে ভট্ট সেতাব কাঁহা চোর কোতোয়াল তোহারি॥
ভট্ট কহে কোতোয়ালের এয়ছারে গারি মত দিজিয়ে।
ঘড়ি এক বিচমে গাধি জান খোয়ায়ে গা বুঝ ছমুজ্‌কে বাত কিজিয়ে॥
জৈছন হেরবি ঐছন কবি[illegible]বি বদন বিরাজিত নিরমল চান্দ।
কহে পরসাদ যো চোর কহে ছোঁ মূঢ় কুলরমণীমনোমোহন ফান্দ॥

মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য

কহো কোতোয়ালের হুকুম কেন্নে দিয়া।
ভয়ানী ছেবক কো এন্তরে হাল* কিয়া॥
মহারাজকে বেটী বিদ্যা পূজকে মহাদেও।
স্থন্দর কো খসম* পায়া মেরে বাত লেও॥
ছবকা খয়ের* হোগা বের বের কহোঁ মেই।
মেরে বাত না শুনেগা সাজা পাওগে তেঁই॥
ছোড় দিজে কানলাল কো লেকে চল সাত।
আপকে বরাবর যাকে কহো এহি বাত॥
কোপে কহে কোতোয়াল মৌত* লাগা পাজি।
ফের এয়ছা কহেগা করোঙ্গা জুতি বাজী॥
চোরকো ছরদার তেঁই বুঝা গেয়া এহি।
রাজা কি দোহাই ভাই ছোড় মত কহি॥
কোহি কহে বেলফেয়াল মোচতো উখাড়ো।
কোহি কহে চোরকে সামিল লেকে গাড়ো॥
কোহি কহে চোরকো গাধেমে চড়াও।
এহি ওক্ত ছের মুড়ায়কে সহর ঘুমাও॥
কোহি কহে জানে দেও জি জেয়ছা হিয়া আয়া।
বুঝা গেয়া বাতমে ছাজাই তেয়ছা পায়া॥
মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোদুখে।
কাষ্ঠবৎ কায় কথা নাহি সরে মুখে॥

---

* রোয়ত—কাঁদতে লাগল। ভয়ানী=ভবানী। ছহায়—সহায়। ঘোমাইয়া—ঘুরিয়ে। এন্তরে হাল—এরূপ অবস্থা। খসম—পতি। খয়ের—শুভ। বের বের—বার বার। মৌত—মৃত্যু।

পদ্য দেখি গদ্য কথা যদ্যপিহ করে।
বৈদ্যগ্রন্থে সদ্য ফল বৈদ্যক হা করে॥
নব্যলোক ভব্য হয় সভাসঙ্গে বটে।
গুণ যেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভাটমুখে সুন্দরের বার্ত্তা শ্রবণে ভূপতির সভাশুদ্ধ মশানে গমন

কোটালিয়া কটু বলে, রাজার নিকট চলে,
ভাট কহে নির্ভয় উত্তর।
শুন শুন মহারাজ, বিপরীত তব কাজ,
যথোচিত উঠে যেয়ে কর॥
গুণসিন্ধু ধরাধিপ, খ্যাত নামে জম্বু দ্বীপ,
কলিযুগে যেন রঘুবীর।
নির্ম্মল যাহার যশ, প্রকাশিত দিগ্ দশ,
তাঁর পুত্র সুন্দর সুধীর॥
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু, কৃপান্বিত বৃষকেতু,
জামাতা মিলিল তেঁই হেন।
তুমি বিচক্ষণ ভূপ, চরিত্র এমন রূপ,
পেয়ে নিধি ঘৃণা কর কেন॥
বিদ্যা বিনোদিনী কন্যা, ধরণী মণ্ডলে ধন্যা,
শাপভ্রষ্টা জন্ম তব ঘরে।
সুন্দর সামান্য নর, না জানিও নৃপবর,
সত্য কহি তোমার গোচরে॥
জানকী জীবন রাম, কিম্বা শ্যাম কিম্বা কাম,
কিম্বা পুরন্দর কিম্বা শশী।
সন্দেহ নাহিক মাত্র, ভুবনে এমন পাত্র,
দৃষ্ট নহে শুন গুণরাশি॥
ভট্টমুখে সুধাভাষ, নৃপমুখে মৃদুহাস,
উঠে দিল প্রেম-আলিঙ্গন।
খুলিয়া অঙ্গের যোড়া, বাছিয়া তুরকি ঘোড়া,
আর দিল বহু রত্ন ধন॥
সভাশুদ্ধনিয়া সঙ্গে, ভূপতি পরম রঙ্গে,
উপস্থিত দক্ষিণ মশানে।
কালীর কিঙ্কর যেই, ভুবনবিজয়ী সেই,
মহিমা তাহার কেবা জানে॥

রাজ্যশুদ্ধ ভেকধর, সভাই সাধক নর,
মুখে কহে রাধাকৃষ্ণ বাণী।
চিত্তে বান্ধা কালপ্রিয়া, আজ্ঞামত করে ক্রিয়া,
এইরূপে কাল কাটে প্রাণী॥
বৈশ্য ক্ষত্র বৈদ্য শূদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র,
কর্ম্ম ভাল নহে যেবা কহে।
তার কিন্তু নাহি স্বর্গ, শুন কবি ধীরবর্গ,
সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে।
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জনবাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি

শীঘ্রগতি নৃপবর, ধর্য়ে জামাতার কর,
মুক্ত কৈল নিগড়বন্ধন।
গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে, নিকটে অঞ্জলিপুটে,
সবিনয় কহে সুবচন॥
যেমন গোকুলপুরী, কৌতুকে নবনী চুরি,
কৈলা প্রভু ত্রিভুনপতি।
গোপীমুখে শুনি বাণী, রজ্জু বান্ধে যুগপাণি,
তমোগুণে রাণী যশোমতী॥
অথবা অজ্ঞাতবাসে, বিরাটভূপতিপাশে,
বৎসরেক ছিলা যুধিষ্ঠির।
বিধাতা বিমুখ তাঁরে, অক্ষপাটী ফেলে মারে,
ফুট্যে ভালে পড়িল রুধির॥
শেষে পেয়ে পরিচয়, হৃদয়ে বিষম ভয়,
সকরুণে কহে গদগদ।
চিত্তে না জন্মিল রোষ, ক্ষমা কৈল তাঁর দোষ,
ধর্ম্মপুত্র শাস্ত্রবিশারদ॥
যেমত বিরাটরাজ, না জানিয়া কৈল কাজ,
আমি সেইরূপ জ্ঞানহত।
তুমি গুণসিন্ধুসুত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
মার্জ্জনা করহ দোষ যত॥
মাণিক নীচের ঠাঁই, যেন মূর্খে বুঝে নাই,
দুরদৃষ্ট হেতু জন্মে হেলা।

কিম্বা শিশু বুদ্ধিহীন, বান্ধা থাকে রাত্রিদিন,
শিলাপুত্র সঙ্গে রঙ্গে খেলা ॥
শুন শুন কল্পতরু, পর্য্যায় পরম গুরু,
বটি বাপা তোমার শ্বশুর।
অধিকন্তু কব কিবা, মনে কিছু না করিবা,
তুমি মোর বাপের ঠাকুর ॥
শ্বশুর বিনয় শুনি, মহাকবি শিরোমণি,
কহে কেন হেন ঠাকুরালি।
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ, পরে বৃথা অনুযোগ,
সকলি করেন ভদ্রকালী ॥
যেন রথচক্রাকৃতি, [illegible]রভাগ্য নরপতি,
চিরকাল সমান না যায়।
দুঃসময়ে ধীর যেবা, তারে নিন্দা করে কেবা,
উগ্রমতি মূর্খ কহি তায় ॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপামই ॥
সেই বংশসমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

কবির বিমোচন শ্রবণে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিনয়

[একাবলী ছন্দ]

বাঁচিল সুকবি সুন্দর চোর। সাধুচিত্তে নাহি সুখের ওর ॥
বিদ্যার গোচর সকলে কহে। কমলিনী কথা মিথ্যা এ নহে ॥
বাঁচিল তোমার জীবননাথ। নিকটে নৃপতি জুড়িয়া হাত ॥
সজল যুগল লোচন লোল। গদগদ কহে মধুর বোল ॥
সখীমুখে কহে সুন্দর বাণী। নন্দিনী নিকটে চলিল রাণী ॥
ধূলা ঝাড়ি তোলে কোলেতে করি। চুম্বতি বদন চিবুক ধরি ॥
বারেক বদন তুলিয়া চাও। অভাগী মায়ের মাথাটি খাও ॥

রাগে কত কটু কয়েছি তোরে। জননী জানিয়া ক্ষমহ মোরে॥
এ মহিমগুলে বটী গো ধন্যা। উদরে ধরেছি তো হেন কন্যা॥
বিনোদিনী কহে ঈষৎ হাসি। আগো মাগো আমি তোমার দাসী॥
কন্যাকে বিনয় কি হেতু কর। গুরু কেবা মোর তোমার পর॥
মন দিয়া শুন করুণামই। গোটা দুই কথা তোমারে কই॥
পুনরপি ধরাজন্ম লভিলে। তোমা হেন যেন জননী মিলে॥
হাসি হাসি কহে যতেক আলি। সকলি কেবল করেন কালি॥
কাতর শ্রীকবিরঞ্জনে কয়। তরাও তারিণী শমন ভয়॥

সুন্দরের বন্ধন মোচন সংবাদে বিদ্যার উল্লাস

স্নান করি শশিমুখী মহাহৃষ্ট মনে। ভবানী ভাবয়ে ভীমা মুদ্রিত নয়নে॥
পূজে পর্ব্বতেশ-পুত্রী পরম কৌতুকে। মেষ মহিষাদি বলি দিল মুহূর্ত্তেকে॥
বদনে রসনারব যত সীমন্তিনী শঙ্খঘণ্টাকোলাহল করে জয়ধ্বনি॥
সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশঙ্খ মালা। ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংহবালা॥
কৃতাঞ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদগদ। পরকালে পাই যেন পদকোকনদ॥
দীন দ্বিজবর্গে দিল নানা রত্ন ধন। সাবিত্রী সমানা ভব কহে বিপ্রগণ॥
করালবদনা কালী কলুষহারিণী। সংসারসাগরে ঘোরে নিস্তারকারিণী॥
তুমি কৃপাময়ী মাগো কৃপানাথ ভর্ত্তা। জগদম্বা জননী জনক বিশ্বকর্ত্তা॥
তথাপিও দুঃখরাশি না হইল দূর। সকলে করুণাময়ী এ দীনে নিষ্ঠুর॥
অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাসি। অসুর-নাশিনী আশু দয়া কর আসি॥
বদরি-কোমল পূর্ণ সুধা রস ভরা। সুবোধ কুবোধ বোধগম্য নহে ত্বরা॥
রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা। প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশতি সুধা॥
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে। গবাগণ গুপ্তে গো ভঙ্গিমা করে হাসে॥
অরসিক নিকটে রসজ্ঞ নিবেদন। ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হয় যে মরণ॥
গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে। মা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্ম তব। কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মান প্রাপ্তি

বীরসিংহ গুণনিধি, পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিধি,
তোমরা জানহ শাস্ত্রকর্ম্ম।
বিচারে পরাস্ত বালা, সুন্দরে দিলেক মালা,
এক্ষণে কিরূপ হবে কর্ম্ম॥
এক কালে বীরচয়, কহে শুন মহাশয়,
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এহ।

গন্ধর্ব্ববিবাহ পর, পুনরপি নৃপবর,
বিবাহ না করে কোথা কেহ ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কুতুহলে, রুক্মিণী হরিলা বলে,
ভাব দেখি কোথা সংস্কার।
পার্থ বীর ব্রহ্মচারী, ভজিলা সুভদ্রা নারী,
সত্যভামা যুক্ত পাত্র আর ॥
গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত, তার কিন্তু এই মত,
স্বামিটীকায় নাহি কর্ম্ম নাথে।
আদিপর্ব্বে হলায়ুধ, পরিহরি সর্ব্বক্রোধ,
পুনঃ সম্প্রদান কৈলা পার্থে ॥
কল্পভেদে মতভেদ, মুনিবাক্য বটে বেদ,
পুনরপি বিবাহে কি ফল।
বিধিলিপি থাকে যেই, সঙ্ঘটন হয় সেই,
নরনাথ না হবে বিফল ॥
স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সঙ্গে, নানা সুখভোগ রঙ্গে,
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণসুতা।
বিরহে শরীর দহে, কদাচিত সাম্য নহে,
কান্দে রামা মহাদুঃখযুতা ॥
চিত্ররেখা সঙ্গে ছিল, অনিরুদ্ধে মিলাইল,
যাবতীয় দুঃখ গেল দূর।
শেষে সেই অনিরুদ্ধ, বাণ রাজা করে রুদ্ধ,
প্রভু তার কৈল দর্প চূর ॥
আছে পূর্ব্বাপর নীত, কিবা তব অবিদিত,
কি ভাবনা কর মহীপাল।
দ্বিজে দেহ রত্নদান, জামাতার রাখ মান,
ঘুষিবেক কীর্ত্তি চিরকাল ॥
ভূপতির শুদ্ধ মন, রত্ন করে বিতরণ
অদৈন্য করিল দ্বিজবর্গ।
নরেন্দ্র নিকটে থাকি, বাহু তুলি কহে ডাকি,
নৃপতি অক্ষয় তব স্বর্গ ॥
রত্ন সিংহাসন মাঝে, বসাইল যুবরাজে,
মন্দ মন্দ চামর-সমীর।
সিফাই সাস্তিরি যারা, কুরনিস করে তারা,
আদাবেতে লোটাইয়া শির ॥
বাঘাই কোটাল কাছে, বুকে হাত খাড়া আছে,
নকীবেতে করিছে সেলাম।

নিরখি কোটালমুখ, হৃদে জন্মে লজ্জা সুখ,
ঈষৎ হাসিল গুণধাম ॥
ঘুচিল সকল দুখ, হৃদে জন্মে পুনঃ সুখ,
দম্পতি মিলিল পুনর্ব্বার।
দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম, মাণিক্যজড়িত হেম,
সেইরূপ ভাব দোঁহাকার ॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে ॥

সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্নদান

শ্বশুরবাসেতে রহে কবি যুবরাজ। ভাবেন ভুবন-মাতা ভাল এই কাজ ॥
শাপভ্রষ্ট জন্ম ধরা আমার সুন্দর। মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর ॥
কামিনী পাইয়া সুখে ভুলিলা কুমার। তবে ত আমার পূজা হবে না প্রচার।
ক্ষণমাত্রে ধরি তার জননীর বেশ। চক্ষে বহে শত ধারা বিগলিত কেশ ॥
মলিন বসন ভাতি শোকেতে ব্যাকুলা। কান্দে রাণী সকল শরীরে মাখা ধুলা ॥
নিশি অর্দ্ধযামশেষে স্বপ্নে কহে শিবা। ওরে পুত্র সুন্দর তোমারে কব কিবা ॥
এই হেতু করে লোক সন্তান কামনা। পেয়ে পিণ্ডদান খণ্ডে সকল যাতনা ॥
বৃদ্ধকালে নানাজাতি সেবা করে সুত। কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত ॥
তোমার সুখ্যাতি পুত্র শুনি ঠাঁই ঠাঁই। সুন্দর সমান ধীর ত্রিভুবনে নাই ॥
কেন নহিবেক বাছা সন্তানের কার্য্য। পিতা মাতা ছাড়িলা ছাড়িলা নিজ রাজ্য ॥
কি দোষ তোমার কলিযুগের এ ধর্ম্ম। ছাড়ান বিষম বটে রমণীর মর্ম্ম ॥
ভাল বাছা তুমি কোনরূপে ভাল থাক। জুড়াক পরাণ মুখে মা বলিয়া ডাক ॥
নিদ্রা ভঙ্গে উঠি কবি কান্দে উভরায়। কহে মাগো মোরে ছেড়ে গেলে গো কোথায় ॥
পতি করে রোদন রোদন করে সতী। কোন মতে সাম্য নহে ভূপতিসন্ততি ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি ॥

সুন্দরের স্বদেশগমনার্থ বিদ্যার নিকটে বিদায় প্রার্থনা

কান্তকরে ধরে, কহে মৃদু স্বরে, বিদ্যাবতী বিনোদিনী।
আমি তুয়া দাসী, কহ গুণরাশি, বিশেষ কারণ শুনি ॥
চিত্তে কেন দুখ, ম্লান বিধুমুখ, নয়নে সহস্র ধারা।
তুমি যুবরাজ, নাহি বাস লাজ, কান্দিছ অবলা পারা ॥
কবিবর কহে, শোকে প্রাণ দহে, মনেতে পড়েছে মাতা।
প্রভাতে যামিনী, প্রত্যুষে কামিনী, যাব যে করে বিধাতা ॥
অনুচিত কার্য্য, পরিহরি রাজ্য, চিরদিন গৌড়ে ভ্রমি ॥

গমন বিষয়, প্রেয়সীকে কয়, যাবে কি না যাবে তুমি ॥
বিষম ভারতী, শুনি কহে সতী, নাথ কি কব তোমাকে ॥
পতি পূজে যেবা, করে পতিসেবা, সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে ॥
প্রভু কিন্তু কই, বৎসরেক বই, নিতান্ত যাব সে দেশ।
কান্তাকথা রাখ, বৎসরেক থাক, পাইয়াছ বড় ক্লেশ ॥
নিকটে ললনা, সুখভোগ নানা, পরম কৌতুক কর।
যে মাসে যে গুণ, প্রভু শুন শুন, বিদগ্ধ কবিবর ॥
ভীমসীমন্তিনী, ভূধরনন্দিনী, ভুবনবন্দিনী শ্যামা।
কিঙ্কর প্রসাদে, স্থান দেহ পদে, দোষ পুঞ্জ করি ক্ষমা ॥

বিদ্যা কর্তৃক বারমাস বর্ণন

প্রথমে প্রবেশ মেষ, কান্ত যার দূরদেশ,
সদা ক্লেশ রসলেশ নাই ॥
বিষম কুসুমশর, শরে তনু জর জর,
কিবা সুখ বিমুখ গোঁসাই ॥
মলিন বদনশশী, ভাবয়ে ভুবনে বসি,
নীরে পশি নহে ভক্ষি বিষ ।
নেত্রানলে ভস্ম যেই মরে জীয়ে পুনঃ সেই,
বাণে হানে বিরূপাক্ষ ঈশ ॥
বৃষে বিষতুল্য কর, বপু দহে নিরন্তর,
নিদাঘে শরীর যায় দহি।
সুনবীন তরুছায়, সুখে শিখী নিদ্রা যায়,
তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি ॥
শুন শুন গুণরাশি, আমি তুয়া প্রিয়া দাসী,
আমার তোমার বড় কেবা ॥
মলয়জ পঙ্ক রঙ্গে, চর্চ্চিত করিব অঙ্গে,
ইচ্ছা আছে এইরূপ সেবা ॥
মিথুনে মিথুনে যেই, ধন্য পুণ্যবন্ত সেই,
অন্য কেবা সেজন সমান।
বিরহিণী কুলদারা, যারা তারা সেবে তারা,
প্রায় মরা কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
ঘন ঘন ঘন রব, অবশ শরীর সব,
মনোভব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্বকুসুম ফুটে, বনতটে মন ছুটে,
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত ॥
কর্কটে বরিষা বাড়ে, পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে,
যাতায়াত সকলে রহিত।

ঘর ছাড়া পতি যার, অভাগ্য কপাল তার,
ধীরে ধীরে বিধি বিড়ম্বিত ॥
ধরাধর গুরু গর্জ্জে, যে বুঝি মদন তর্জ্জে,
আটনি দামনি বাহু লাড়া।
দেবরাজ দগ্ধে মর্ম্ম, দেখ কি অনীত কর্ম্ম,
মড়ার উপরে হানে খাঁড়া ॥
সিংহে মহী একাকার, জল ভিন্ন স্থল আর,
তিল অর্দ্ধ নাহি দেখি মাত্র।
ভেকের পরম সুখ, কাল কোকিলের দুখ,
কামিনীর কেঁপে উঠে গাত্র ॥
কন্যায় কেবল যুক্তি, ভক্তিভাবে পূজে শক্তি,
মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে।
যে গৃহী সাধক দীন, সেই সে দিবস তিন,
মরমে মরিয়া থাকে খেদে ॥
মৃণময়ী দশভুজা করিব তাঁহার পূজা,
দাসীর বচন রাখ প্রভু ॥
যে আজ্ঞা করিবে যবে, ক্ষণেকে বিস্তর পাবে,
এ কথা অন্যথা নহে কভু ॥
তুলা তুলা আর নাই, তুলা কর এই ঠাঁই,
দ্বিজে দান দিতে পুণ্যচয়।
তুমি সুরতরুকল্প, আমি রামা অতি অল্প,
মনে বুঝি দেখ হেন নয় ॥
প্রথমত হিমাগম, বিরহি জনার যম,
নলিনীর দর্প করে চূর।
যে যুবতী নহে দুই, শুয়্যে করে হাইফুই,
কান্দে সতী পতি অতি দূর ॥
শুন প্রভু হৃদয়েশ, নিবেদন সবিশেষ,
বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ।
মাস নিজে ভগবান্, হাটে ঘাটে মাঠে ধান,
সর্ব্ব দ্রব্য দুর্ল্লভ নূতন ॥
ত্রিবিধ প্রকার লোক, নাহি দুঃখ রোগ শোক,
পার্ব্বণাদি করে চিত্তসুখে।
অগ্রে দিয়া কাকবলি, সবান্ধবে কুতূহলি
নূতন তণ্ডুল দেয় মুখে ॥
একান্ত বিষম ধনু শীতে কম্পমান্ তনু,
তরুণী তপন তুলা সার।

কিসের ভাবনা আছে, সতত থাকিব কাছে,
সেবা হেতু চরণ তোমার ॥
নিত্য উষ্ণ জলে স্নান, উচিত বটে হে প্রাণ,
উষ্ণ অন্ন ঘৃতাদি ভোজন।
দশদণ্ডমধ্যে হবে, দেশে কেন যাবে তবে,
ধীর তুমি ধৈর্য্য কর মন ॥
হেদে প্রাণনাথ কবি, মকরে প্রখর রবি,
এই মাস বিখ্যাত ভুবনে।
প্রাতঃস্নানে মহাপুণ্য, করে যেবা সেই ধন্য,
পারে লোক জিনিতে শমনে ॥
সবিশেষ কব কিবা, জপহোমে রাত্রি দিবা,
প্রভু তুমি থাকহ নিযুক্ত।
চেতনবিশিষ্ট মন্থ, জপেতে নিষ্পাপ তনু,
সংসারসাগরে হবা মুক্ত ॥
আর এক শুন বোল, কুম্ভেতে গোবিন্দদোল,
দরশনে সর্ব্বপাপ নাশে।
বিজ্ঞ বট কি না জান, দেখ হে থাকি কেমন,
কিছুকাল গৌণে যাবে বাসে ॥
পরম সুখদ মাস, শিশিরে যাতনাহ্রাস
মন্দ মন্দ মলয় পবন।
যুবক যুবতী সঙ্গে, বঞ্চে নিশি রসরঙ্গে,
উভয়ত বিদেশে মরণ ॥
মীনে মীনকেতু পাপ, দ্বিগুণ জ্বালায় তাপ,
সহচর সখা সেই মধু।
তার দৈবে নাই লাজ, কলঙ্কী সে দ্বিজরাজ,
মৃত্যুরূপা পরভৃতবধূ ॥
কহে করি প্রণিপাত, শুন শুন প্রাণনাথ,
বসন্ত দুরন্ত মন্দকারী।
রাজা মূর্খ মূর্খ পাত্র, ধর্ম্মজ্ঞান নাহি মাত্র,
বধ করে বিরহিণী নারী ॥
এ কাল বিলম্ব কর, পশ্চাতে যাইবা ঘর,
দাসীবাক্যে কান্ত হও শান্ত।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে, গমন বারণ নহে,
দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত ॥

বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ মাতৃ নিকট বিদায় প্রার্থনা

কবিবর কহে বাণী, কহ যত ভাল জানি,
চিত্তে কিন্তু প্রবোধ না মানে।
শুন শুন কুরঙ্গাক্ষি, সত্য কহি প্রাণ সাক্ষী,
যাতনা যেমন সেই জানে॥
কবি কহে প্রবোধিয়া, শুন শুন প্রাণপ্রিয়া,
মহাগুরু জনকজননী।
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা এহ, যা হতে দুর্ল্লভ দেহ,
বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি॥
শ্রেষ্ঠ পুত্র হয় যেবা, করে পিতামাতা সেবা,
লয়কালে লয় গঙ্গাতীর।
সজ্ঞানে ত্যজিলে তনু, ধন্য মানে নিজ জনু,
গয়াশ্রাদ্ধে সার্থক শরীর॥
যম সম দুষ্ট পুত্র, ধরণীমণ্ডলে কুত্র,
লোকভয় ধর্ম্মভয় নাই।
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে, শোকে দেহ ত্যাগ করে,
কুবুদ্ধি কি লওয়াল গোঁসাই॥
যদি ভাব যাব দূর, থাক নিজে পিতৃপুর,
কিছুকাল কর সুখভোগ।
হও তুমি পুত্রবতী, নিয়া যাব পরে সতী,
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি বিয়োগ॥
হৃদয়েশ ক্লেশ কথা, মরমে পরম ব্যথা,
অভিমানে উঠিল অমনি।
গোযুগে গলিত নীর, গজেন্দ্রগমন ধীর,
গতি যথা বৈসেছে জননী॥
দুহিতা দুঃখিতা দেখি, রাণী বলে বাছা একি,
নলিননয়নে কেন নীর।
কার সনে কৈলা দ্বন্দ্ব, কে কহিল কিবা মন্দ,
ফাটে বুক প্রাণ নহে স্থির॥
মায়ের মাথাটি খাও, মাগো·মুখ তুলে চাও,
মনের কি দুঃখ নাহি জানি।
বিদ্যা বলে কিবা কব, নিশ্চয় জামাতা তব,
দেশে যান মাগি গো মেলানি॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জনবাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু, অভয়চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধবচন

এ কথা কহিল যদি মুনিমনোহরা। মহীপতি-মহিলা মূর্চ্ছিত পড়ে ধরা॥
চেতন পাইয়া কহে কহ চন্দ্রমুখি। মাতৃহত্যাভয় বাছা নাহি একটুকি॥
কেমনে এমন কথা কহ তুমি ঝিয়ে। বিদেশে পাঠায়ে তোমা অভাগী কি জিয়ে॥
দশমাস গর্ব্ভে বটে দিয়াছি গো ঠাঁই। পাইয়াছি যত কষ্ট তার সীমা নাই॥
পালিলাম এতকাল নিত্য চিত্তসুখে। এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে॥
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিষ্ঠুর। শঙ্কা নাই তাই বিদ্যা যাবে এতদূর॥
হরি হরি কারে কব ললাটের লেখা। জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখা॥
বিদ্যা বলে মাগো তুমি যে কহ প্রমাণ। ধৈর্য্যাবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান॥
কার পুত্র কার কন্যা কার মাতাপিতা। সর্ব্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্রদুহিতা॥
বিষম যাঁহার মায়া সংসারব্যাপিনী। কৌতুক [illegible]খন কর্ম্মভোগ করে প্রাণী॥
বেদেতে বিদ্বান্ বেদব্যাস মহামুনি। মায়াতে ভুলিলা তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি॥
শুকদেব জন্মিলেন তাঁহার তনয়। সুখদুঃখহীন তনু জ্ঞানী মহাশয়॥
ভূমিগত হবামাত্র সকর্ম্মে প্রস্থান। ফের ফের বল্যে মুনি পাছে পাছে যান॥
কতদূরে নারীচয় করে জলক্রীড়া। নগ্ন তারা শুকে দেখি না করিল ব্রীড়া॥
কালগৌণে তথা উপস্থিত ব্যাসমুনি। সলজ্জিতা কূলে উঠে যত সীমন্তিনী॥
কাঁপে গুরু উরু চারু বসন পরিল। কৃতাঞ্জলি মুনীন্দ্র নিকটে দাঁড়াইল॥
হাসিয়া কহেন মুনি এই কোন কর্ম্ম। বুঝিতে না পারি তোমা সবাকার মর্ম্ম॥
যুবা পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া। লজ্জা না পাইলা মনে সে জনে দেখিয়া॥
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা। বসনাদি পরিলা ধরিলা পূর্ব্ব সজ্জা॥
সবিনয় কহে তারা শুনহ গোঁসাই। মহাযোগী শুকদেব বাহ্যজ্ঞান নাই॥
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয়। তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জাভয়॥
সুতস্নেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ। শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত॥
লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজ পুরে। প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দূরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্বালা। কি দোষ তোমার মাগো তুমি ত অবলা॥
নিবৃত্তি মার্গের কথা কহিলাম মাতা। প্রবৃত্তি মার্গের সৃষ্টি সৃজিলা বিধাতা॥
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ। কন্যাপুত্র জন্মিলে কেবল কর্ম্মভোগ॥
তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন। গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন॥
পরপুত্র জননি গো হয় হর্ত্তাকর্ত্তা। শাস্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্ত্তা॥
রাণী কহে চন্দ্রাননে তুমি রমাসমা। বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা॥
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্রনীত। তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত॥
জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির। ক্ষণেকে বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর॥
পুনরপি কহে বিদ্যা মন কর দড়। শোকে সর্ব্বধর্ম্মলোপ শোক পাপ বড়॥
সজলনয়নে কহে যত সহচরী। ছাড়িয়া মমতা তুমি যাবে কি সুন্দরি॥
কেন্দে কহে বিমলা কমলা ছেড়ে যাও। জন্মশোধ দেখি চাঁদমুখ তুলে চাও॥
সঙ্গে যাবে যারা তারা সহর্ষবদন। যে না যাবে কত কব তাহার যাতন॥

রাজার নিকটে রাণী কহে সবিশেষ। দুহিতা জামাতা তব অন্য যান দেশ ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি ॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশগমন

বীরসিংহ নৃপপ্রধান, শুনিল জামাতা যান,
হায় হায় রোদন বদনে।
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহি, খেদ করে রহি রহি,
বিধাতার এই ছিল মনে ॥
হৃদয়ে পরম ব্যথা, কহে কথা যাব কোথা,
কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল।
স্বপ্নরূপ কন্যাগুলী, ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা,
শোকশেল হৃদয়ে পশিল ॥
ক্ষণকাল মৌন থেকে, সুন্দর জামাতা ডেকে,
স্তব করে বাক্য সকরুণে।
বাপা এই বৃদ্ধকাল, ভাল তব ঠাকুরাল,
বিহিত করহ নিজ গুণে ॥
দিলাম সকল রাজ্য, চেষ্টা পাও রাজকার্য্য,
আনাই তোমার মাতাপিতা।
বেহাই বেহাই সুখে, যাইব উত্তর মুখে,
তুমি রাজা মহিষী দুহিতা ॥
শ্বশুরের সন্নিকটে, কবিবর কহে বটে,
স্বরূপ কহিলা মহারাজ।
কিন্তু একবার যাই, দেখি বন্ধু বাপ ভাই,
না যাওন ভাল নহে কাজ ॥
সত্য সত্য শুন শুন, আগমন শীঘ্র পুনঃ,
হবে তব রাজ্যে মহাশয়।
সম্প্রতি বিদায় মাগি, আমা দোঁহাকার লাগি,
বৃথা শোক করই হৃদয় ॥
অপরাহ্নে তরুচ্ছায়, অতি দূরতর যায়,
সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্যমত ভাব পাছে, মানস তোমার কাছে,
থাকিল গমন সেই তুল ॥
দানে রাজা কর্ণতুল্য, দিলা দ্রব্য বহুমূল্য,
ছত্র গজ রথ দাস দাসী।
হাজার সোয়ার সাথ, হামরাই নিশানাথ,
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥

কন্যা কোলে করি রাণী, কহিলা গদগদ বাণী,
তুমি রাজলক্ষ্মী ছিলা মাতা।
ছাড়িয়া চলিলা দেশ, বুঝি পরমায়ু শেষ,
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা॥
পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি, তোমা বুঝাবার শক্তি,
ভূমণ্ডলে আর কারু নাই।
কিন্তু ব্যবহার আছে, তেঁই গো তোমার কাছে,
গোটা দুই কথা বাছা কই॥
পুরে গুরুলোক যত, তাহা সবাকার মত,
হবে রবে মানায়ে সেবায়।
দয়া পরিজন প্রতি, যার [illegible]কে গুণবতী,
সেই সে গৃহিণীপদ পায়॥
জনক জননীপদ, ধরি করে সগদ্গদ,
কহে বিদ্যা সজল নয়নে।
এই তুমি জন্মদাতা, নিকটে বটেন মাতা,
দুঃখিনীরে যেন থাকে মনে॥
সুন্দর সুন্দর নাম, দেবীপুত্র গুণধাম,
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুখে।
দশদণ্ড মাত্র দিবা, দম্পতি স্মরিয়া শিবা,
রথে উঠে চলে দেশমুখে॥
গ্রামবাসী যত লোক, সকলের মহাশোক,
সখাচয় চিত্রিত পুতুলী।
শোকে বুক নাহি বান্ধে, রাজা রাণী দোঁহে কান্দে,
কলেবর ধুসরিতধূলি॥
দশ দিবসের পথ, দশ দণ্ডে যায় রথ,
ত্বরা করে গুণের গরিমা।
বিদ্যা কহে প্রভু ক্রোধ, ত্যজ দেখি জন্মশোধ,
জনকের অধিকার সীমা॥
এড়াইল দেশ নানা, দূরে স্বাধিকার থানা,
মনে মনে পরম কৌতুক।
ত্বরাতে নাহিক কাজ, সারথিরে যুবরাজ,
কহে রথ রাখ একটুক॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥

সেই বংশসমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

সুন্দরেকে আনয়নার্থ তাঁহার পিতামাতার প্রত্যুদ্গমন

অধিকারে উপনীত গুণসিন্ধুসুত। শীঘ্রগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দূত॥
দূতমুখে নরপতি শুনি শুভ ভাষ মৃত যেন পুনরপি পায় জীবন্যাস
আনন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে। অমনি উঠিয়া গেল মহিষীর কাছে॥
হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতি। পুত্রবধূ দেখ গিয়া উঠ শীঘ্রগতি।
রাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিলা কথা। সুন্দর গুণের নিধি বাছা মোর কোথা॥
আর কি এমন দিন আমার হইবে। চাঁদমুখে মা কথাটি সুন্দর কহিবে॥
পুরবাসী সহ রাজরাণী রথে উঠে। বাল বৃদ্ধ যুবা লোক পাছে পাছে ছুটে॥
সৈন্যকোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালি। কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালি॥
প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি ঘোড়া ঘোড়া। লস্করের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া॥
ঘন ঘন ডঙ্কা শঙ্কা রিপু চমকিত। উড়িছে পতাকা সিতাসিত রক্ত পীত॥
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী। ফুকারে নকিব জয় করালবদনী॥
স্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাপাত্র। উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবামাত্র॥
পথ করে পরিষ্কার চিত্তে কুতুহলী। দোধারি রোপিল চারু শ্রীরামকদলী॥
আম্রশাখাযুক্ত বারিপূর্ণ স্বর্ণঘট। শীঘ্র করে স্থাপনা শ্রীগৃহ সন্নিকট॥
পিতামাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে॥
সন্তোষসাগর মধ্যে ভাসে রাজরাণী। পুত্র কোলে করে দোঁহে প্রসারিয়া পাণি
সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে। সহস্র বদন হয় কৈতে পারে তবে॥
দ্বিগুণ উথলে প্রেম নিরখিয়া বধূ। সঘনে চুম্বতি রাণী মুখরাকাবিধু॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যাকে দর্শনার্থে পুরবাসিনী নারীগণের আগমন

মঙ্গলাচরণে কুলাচার যত ছিল। পুত্রবধূ নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল॥
গুণসিন্ধু দয়াসিন্ধু কল্পতরুরূপ। রতনভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ॥
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে। পরস্পর সকলে সকল বার্ত্তা কহে॥
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ। জনে জনে দিলা রাণী রত্নসিংহাসন॥
আসন থাকুক আগে এসে শুন রাণী। বধূ তব কেমন দেখাও দেখি আনি॥
কুতুহলী পদধূলী শিরে বান্ধে সতী। সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী॥

করে ধরে টেনে নিয়া বসায় নিকটে। হাসি হাসি কহে ঘরভরা বউ বটে॥
কোন রামা বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট। মরমে লজ্জিতা ধনী মাথা করে হেঁট॥
মুখফোঁড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল। আইবড় বাপঘরে ছিল এতকাল॥
বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণবনিতা। এ মেয়ে সামান্যা নহে পরম পণ্ডিতা॥
পণ ছিল শাস্ত্রে যেবা করে পরাভব। তারে দিবে বালা মালা সেই হবে ধব॥
নিরখিয়া নববধূ দ্বিজবধূচয়। সকলে সদনে গেলা সদয় হৃদয়॥
জগদীশ্বরীকে কৃপা কর মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
যে গাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল। নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি

নৃপ শুভক্ষণে, রত্ন সিংহাসনে, পুত্রে করে অভিষেক।
ধরে ছত্র দণ্ড, সুখী রাজ্যখণ্ড, সম্মত প্রজা যতেক॥
বামেতে মহিষী, পরম রূপসী, গৌড়াধিকার দুহিতা।
মনে বাসি হেন, রামচন্দ্র যেন, সঙ্গে শশিমুখী সীতা॥
কবিরাজ রাজা, পুত্র সম প্রজা, পালয়ে পূর্ণাভিলাষ।
ভূপ জরাগ্রস্ত, দারা সহ ত্রস্ত, কৈলা বারাণসী বাস॥
বিদ্যাবতী সতী, প্রসবে সন্ততি, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
অভেদ সুন্দর, রূপ মনোহর, যেমত শরদশশী॥
নিজ দেহ ছবি, নিরখিয়া কবি, তনয় তনু নেহালে।
মন্দ মন্দ হাসে, এই মনে বাসে, যেন দীপে দীপ জ্বালে॥
করে বিতরণ, রতন বসন, কুঞ্জর ঘোটক ধেনু।
মহা কুতূহলি, শিরে দিল তুলি, লক্ষদ্বিজপদরেণু॥
জাতদিনাবধি, কুলাচার বিধি, করে কবি গুণধাম।
ষষ্ঠ মাসে মুখে, অন্ন দিল সুখে, পদ্মনাভ রাখে নাম॥
পঞ্চম বৎসরে, কর্ণবেধ করে, বিদ্যারম্ভ শুভ দিনে।
সপ্তদিন মাত্র, লেখে তালপত্র, পঞ্চাশত বর্ণ চিনে॥
বালক ত্বরায়, ব্যাকরণ সায়, ভট্টি অভিধান গণ।
রঘুকুমারাদি, সাঙ্গ হল যদি, অলঙ্কারে দিল মন॥
কৃপান্বিতা চণ্ডী, পাঠ করে দণ্ডী, তদনু কাব্যপ্রকাশে।
ন্যায় শাস্ত্রে ঘুণ, কত কব গুণ, কবিচিত্তে মহোল্লাসে॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল, মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র।
কোন ক্ষোভ নাই, জননীর ঠাঁই, নিল একাক্ষরী মন্ত্র॥
যেমন জনক, তেমন বালক, উভয়ত মহাকবি।
কালীপদতলে, শ্রীপ্রসাদে বলে, ভবে ত্রাণ কর দেবি॥

সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন এবং শবসাধনোদ্যোগ

ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ। জনকজননীচিত্তে জন্মে মহাহর্ষ ॥
বিবাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্যা। রূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা ॥
কতকাল গৌণে মনে জন্মিল ভাবনা। পুরীমধ্যে থাকে ইষ্টদেবতা স্থাপনা ॥
গাঁথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষ্ণুপদ। চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান সন্নিকটে হ্রদ ॥
পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণা। শবারূঢ়া মুক্তকেশী বসনবিহীনা ॥
মুণ্ডমালাবিভূষণা খড়্গমুণ্ডধরা। বামে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ॥
অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ নানা বলি। কনকচম্পক দিল চরণে অঞ্জলি ॥
উপহার দ্রব্যভার সীমা কব কত। স্তূপ স্তূপ পর্ব্বত প্রমাণে শ্রদ্ধামত ॥
তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত। শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য ॥
প্রযত্নে সঙ্গতি করে চণ্ডালের শব। সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব ॥
ভৌমবারযুতা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি। শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী ॥
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত। গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত ॥
জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবা হেলা। বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা ॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই। ভঙ্গীতে সঙ্ক্ষেপে কিছু কিছু কয়ে যাই ॥
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে। আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

[শব সাধনা]

পূর্ব্ব উক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্রগতি। সামান্যার্ঘ্যে সুবিধান করে মহামতি ॥
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র। সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র ॥
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী। পূর্ব্বদিগ ক্রমে পূজে কবি শিরোমণি ॥
বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে। যে চাত্র বচন কহে মহা কুতূহলে ॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া করে প্রণিপাত। পূর্ব্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ ॥
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ। সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ ॥
ভূতশুদ্ধিন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়। জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ষু সর্ষপ ছড়ায় ॥
তিলোঽসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ। তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ ॥
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন। আছে যে প্রকার তন্ত্রসারের বচন ॥
শূলে খড়্গে বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে। যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে ॥
কিন্তু যে সে ঘায়ে মরে না লবে সে শব। বলেছেন গো-বিপ্র স্ত্রীরূপা গ্রাহ্য ভব ॥
সম্মুখ সংগ্রামমধ্যে নষ্ট যে শরীর। সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা ধীর ॥
সর্ব্বদা না লবে ভাই শব পর্য্যুষিত। শাস্ত্রমত কর্ম্ম করে যে জন পণ্ডিত ॥
মূলমন্ত্র পাঠ করে পূজাস্থানে নিল। উক্ত মন্ত্রে সুকৌতুকে জলবিন্দু দিল ॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রণাম। বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম ॥
ক্ষালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে। নববস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতূহলে ॥
ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন। সেইমত চন্দনাদি করিল লেপন ॥
রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে। শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে ॥

নিজ করে যত্নে ধরে শবকটিদেশ। পূজাস্থানে নিল মহাসুবুদ্ধি নরেশ॥
ততঃপরে কুশশয্যা করে গুণনিধি। পূর্ব্বশির রাখে শব আছে যেবা বিধি॥
এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল। তাম্বূলাদি শবমুখে দিলেক সকল॥
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ। তৎপৃষ্ঠে চন্দন লিখে চিত্তে মহাসুখ॥
বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার। চতুরস্র মধ্যে পদ্ম তাহে চতুর্দ্বার॥
দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যে পৃষ্ঠে মন্ত্র। লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র॥
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে। ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা ব্যক্ত বটে॥
উপদ্রব যদ্যপি জন্মায় যত্ন করে। নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধরে॥
তদুপরি রক্তকম্বলাদি দিব্যাসন। শীঘ্রগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন॥
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ। দশদিক্ষু পূর্ব্বমত রাখে স্থানে স্থান॥
ইন্দ্রাদি দেবতা পূজে স্বামিসম্বোধনে। বিঘ্ন নিবারণ করে মহা সাবধানে॥
চতুঃষষ্টি ডাকিনী যোগিনীগণ যত। সবাকার পূজা কৈল ভক্তিযুক্ত নত॥
মূলমন্ত্রে শবানন পূজে মহাকবি। ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি॥
স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন। শবকেশ ধরে করে যুটিকাবন্ধন॥
গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম। ষড়ঙ্গন্যাসাদি যত কৈল প্রাণায়াম॥
ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে। তদন্তে সঙ্কল্প কৈল উল্লসিত মনে॥
অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবযুটিকায়। আসন পূজিয়া পীঠ পূজা কৈল তায়॥
তদন্তরে পূজে দেবী সুখে শক্তিরূপ। শবমুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ॥
ততঃ শব তুলিলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বসোমে ভারতি মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া॥
পট্টসূত্রে বান্ধে কবি যুগল চরণ। শবপদতলে যন্ত্র লিখিল ত্রিকোণ॥
শবকরযুগ্মপার্শ্ব প্রযত্নে প্রসার্য্য। তদুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য্য॥
তদুপরি নিজ পদ নৃপতি নিধায়। পুনঃ প্রাণায়াম করে ভক্তিযুক্ত কায়॥
শিবা শিবা গুরু ভাবে হৃদি মধ্যে দেবী। মহাশঙ্খমালা জপ করে মহাকবি॥
করে অসি রূপসী মহষী প্রেমমই। কিছুদূর থাকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ॥
কহেন করুণাময়ি থাকি বিমানেতে। দেহি মে কুঞ্জর বলি আশু ধরাপতে॥
দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি। অদ্য নহে দিনান্তরে দাস্যামি জননি॥
মহামায়া মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি। বরং বৃণু বরং বৃণু সঘনে ভারতী॥
নলিননয়নে নীর নিরখিয়া ইষ্ট। প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট॥
ধরে ধরাধরপুত্রীপদ কবিবর। ধরাতলে ধরাপতি ধূলায় ধূসর॥
সুন্দর সুস্বরে কহে সুধাধিক উক্তি। দর্শনে তোমার মাগো চতুর্ব্বিধ মুক্তি॥
নাহি চাহি কুঞ্জরালী বাজিরাজি রাজ্য। জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য॥
মনোমম হংস পাদপদ্মে বিহরতু। অঙ্গীকার কৈল মাতা তথাস্তু তথাস্তু॥
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি। সবে মাত্র হবে এক বর্ণ ভবিষ্যতি॥
ব্রাহ্মণ করিবে বেদবহিষ্কৃত কর্ম্ম। অধর্ম্মণ্য রাজা হবে রাজ্য শূন্যধর্ম্ম॥
অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য। মিথ্যা কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য॥
অবলা চঞ্চলা চলা মন্দ ফলা হবে। ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে॥
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই। শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যধাম সেই॥

সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্ব কথা কহি। শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম মহি ॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর। মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর।
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল। পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল ॥
এত কহি কৈলাসশিখরে গেলা দেবী। মনে মনে আপনাকে শ্লাঘ্য মানে কবি ॥
লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণীভূষণ। পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন ॥
সেই তিন দিবসেতে আছে কত জ্বালা। সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হল কালা ॥
নিত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক। যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মূক ॥
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ। অকর্ত্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ ॥
এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর। ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর ॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা হও কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গারোহণ

চতুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে ধীর। বিরাজিত তেজোময় যেমত মিহির ॥
কুলপুরোহিত ডাকে মহাহর্ষযুক্ত। নিজরাজ্যে নিজপুত্রে করে অভিষিক্ত ॥
বিরলে বালক প্রতি কহে রাজনীত। শিশু কিন্তু সর্ব্ব কার্য্যে বটহ পণ্ডিত ॥
আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তেকারণে কহি। এইরূপে পালন করহ সুখে মহি ॥
পরস্ত্রী জননীতুল্যা থাকে যেন মনে। কদাচ না লোভ যেন হয় পরধনে ॥
একান্ত বিহিত নহে মানি মান ভঙ্গ। সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ ॥
নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য। সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য ॥
ব্রাহ্মণ মামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞা বটে। সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে ॥
ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন। ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন ॥
গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম্ম। ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম ॥
গুরু আজ্ঞা বিনা শিক্ষাগুরু করে যে। গুরু ত্যাগে যে পাপ সে পাপ লভে সে ॥
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে যায় যথা তথা। সেই মন্ত্রে কদাচ না কবে গুহ্য কথা ॥
পদ্মনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ। বুঝিতে না পারি মহাশয় তব ভাব ॥
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে। শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রুধারা বহে ॥
'পর্ব্বতের আড়ে পিতা আছি এতকাল। এত শীঘ্র ছাড়ি যাবা একি ঠাকুরাল ॥
এককালে পিতামাতা বিয়োগ যাহার। পৃথিবীতে জীয়া সুখ কি ছার তাহার ॥
পুনঃ কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ। অদ্য বাব্দশতান্তে বা নিতান্ত মরণ ॥
কার মাতা কার পিতা কার অধিকার। বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার ॥
মান্ধাতা প্রভৃতি যত ত্যজিয়াছে দেহ। ভূমণ্ডলে পুত্র চিরজীবী নহে কেহ ॥
কালক্রমে কহ কে কালের নহে বশ। জ্ঞানী তুমি খেদ কর এত বড় রস ॥
কালীপদ সার কর জপ কালী নাম। পরলোক গমন না হবে যমধাম ॥
কতমত কহে পুরাণের কথা নানা। বহুযত্নে করে কবি তনয়ে সান্ত্বনা ॥
পদ্মনাভ বিদ্যায় হইল যে যে কথা। কহা নাহি যায় তাহা মর্ম্মে লাগে ব্যথা ॥
সেই দিন রহে রাজা রাণী উপবাসী। প্রাতঃস্নান করে গুণবতী গুণরাশি ॥
দেবীপুরমধ্যে চারু বিল্ববৃক্ষ তলে। যোগাসনে দোঁহে তথা বৈসে কুতূহলে ॥

হৃদাহ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান। যোগবলে এককালে দোঁহে ত্যজে প্রাণ ॥
ধরে অপরূপ পূর্ব রূপ কলেবর। আছিল যেমন হারাবতী মালাধর ॥
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে মাতা চলিলা বিমানে। মুহূর্ত্তেকে উপনীত শিবসন্নিধানে ॥
রত্নসিংহাসনমাঝে পার্ব্বতী শঙ্কর। মালাধর হারাবতী ঢুলায় চামর ॥
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী। যার পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি ॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম। আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম ॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা। তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা ॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা ॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাগো দেহ পদধূলি ॥

ইতি জাগরণ সমাপ্ত

অষ্টমঙ্গলা

নমো বিশ্ববিভাবিনী, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী,
জনমিলা পর্ব্বতেশ ঘরে।
কার্ত্তিকেয় জন্ম হেতু, ভস্মরাশি মীনকেতু,
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে ॥
দুরন্ত মহিষাসুর, তার দর্প কৈলা চুর,
লীলায় হইলা দশভুজা।
মহিষমর্দ্দিনী নাম, সেতুবন্ধে প্রভু রাম,
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা ॥
শুম্ভ নিশুম্ভের গর্ব্ব, সম্মুখ সমরে খর্ব্ব,
শক্তি লভে সুরথ সমাধি।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জন্মজরামৃত্যুহরা,
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি ॥
বিধি হরি ত্রিলোচনে, মহাকালী দরশনে,
গতমাত্র প্রথমতঃ মায়া।
শেষ জন্মে কৃপালেশ, গত যাবতীয় ক্লেশ,
দিলা পদসরসিজচ্ছায়া ॥
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, তোমা পূজে নিত্য নিত্য,
লভিল রমণী ভানুমতী।
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা, মূঢ়মতি জানি কিবা,
কৃপাময়ি অগতির গতি ॥
মালাধর হারাবতী, শাপে জন্ম বসুমতী,
ব্রতকথা জগতে প্রচার।

কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিত্রাণ,
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার ॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপামই ॥
সেই বংশে সমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ

পদাবলী

[রাগিণী—বিভাস, তাল—ধিমা তেতালা]

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু[1] নিরখি, অতনু[2] চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শিব (শব) রূপ, বামা রণে কে ॥
শিশু শশধর ধরা, গুণধরা, সুহাস মধুরাধরা,
প্রাণ ধরা ভার, ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর কর ঝলকে ॥
রামা অগ্রগণ্যা বটে ধন্যা, কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নখে কুলা দন্ত মূলা,
এলো চূলা গায়ে ধূলা ভয় করে হে ॥
কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে ॥ ১ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল একতালা]

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী।
ভাগীরথী বিরাজিত, প্রবাহে অর্দ্ধ শশী।
উত্তর বাহিনী গঙ্গা, জল চলেছে দিবানিশি।
শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণা অসি[3]।
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি ॥
কি মহিমা অন্নপূর্ণার কেউ থাকে না উপবাসী।
ওমা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার, চরণ ধূলার অভিলাষী ॥ ২ ॥

[ঝিঝিট—ঠুংরী]

অন্ন দে গো অন্ন দে গো
অন্ন দে গো অন্নদে।
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন

১তনু তনু—কৃশ শরীর। ২অতনু—অনঙ্গ, কামদেব। ৩পাঠান্তর হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বরুণা, অসি কাশীর উভয় পার্শ্বস্থ নদীদ্বয়।

অপরাধ করিলে পাছে পদে ॥
মোক্ষ প্রসাদ দেও অম্বে
এ সুতে অবিলম্বে
জঠরের জ্বালা আর সহে না তারা
কাতরা হইও না প্রসাদে ॥ ৩ ॥

[রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা]

অপরা[1] জন্মহরা জননী।
অপারে ভব সংসারে এক তরণী ॥
অজ্ঞানেতে অন্ধজীব, ভেদ ভাবে শিবাশিব।
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা, স্বরূপিণী ॥
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া।
দীনদয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী ॥
আনন্দ-কাননে ধাম, ফলকি তারিণী নাম।
যদি জপে দেহ-অন্তে, শিব ব'লে মানি ॥
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন।
নিজগুণে তিনলোক, তারয় তারিণী ॥ ৪ ॥

[রাগিণী—গাঢ়া ভৈরবী, তাল—ঠুংরী]

অপার সংসার নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার ॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি।
তার[2] কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরি, রাখ এইবার ॥
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পূরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম, তারা তব নাম সংসারের সার ॥
কাল গেল কালী হল না সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥ ৫ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

অবোধ মন তাই তোরে বলি।
তুই অজ্ঞান পতঙ্গ হয়ে, জ্ঞান-প্রদীপটি নিবাইলি ॥
ভেবেছ যে ভদ্র হবে, ভাই বন্ধু আছে বলি।
তাদের আত্মতা জীবনাবধি, কেউ ছোঁবে না মৃত্যু হলি ॥
যদি বল এ পাপদেহ, মুক্ত হবে তীর্থে গেলি।
ঐ যে 'গঙ্গায়াং,' জ্ঞানত মোক্ষ ব্যাস লিখেছেন হস্তে তুলি ॥
প্রসাদ বলে তীর্থযাত্রী, মুক্তিযুক্তি হয় সকলি।
যদি দিনান্তে একান্ত মনে, একবার বল কালী কালী ॥৬॥

---

১ অপরা—মাতৃকা শক্তি দ্বিবিধা—পরা এবং অপরা। এদের মধ্যে পরা মাতৃকা সুষুম্নার অভ্যন্তর্বর্তিনী এবং অপরা মাতৃকা দেহাবলম্বিনী। ২ তার—ত্রাণ কর।

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

অভয় চরণ সব লুটালে।
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে ॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে, শিখেছিলে মা বাপের কুলে। (মায়ের স্থলে)
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা, তেম্নি দাতা কি আমায় হ'লে ॥
ভাঁড়ার জিম্মা[১] যার কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
সদা ভাং খেয়ে সে (শিব সদাই মত্ত) মত্ত ভোলা, তুষ্ট কেবল বিল্বদলে ॥
মা হয়ে মা জন্মে জন্মে কত দুঃখ আমায় দিলে।
(জন্ম জন্মান্তরে মা, কতই দুঃখ দিয়েছিলে।)
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাক্‌বো সর্ব্বনাশী বলে ॥ ৭ ॥

[রামপ্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি ॥
কালী নাম কল্পতরু[২], হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচেছি ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥
দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি ॥
সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥ ৮ ॥

[রামপ্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলেম যথা তথা ॥
দিবা হলো অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ।
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে, স্থান দাও গো জগন্মাতা ॥
শুনেছি শ্রীনাথের[৩] কথা বট চতুর্ব্বর্গ[৪] দাতা।
রামপ্রসাদ বলে চরণ তলে রাখ্‌বে রাখ এই কথা ॥৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আছে তোমার মা মনে কত।
কেবল সার হল ভ্রমণ পথ ॥
হয়ে তারিণী-তনয় গেল মা আলয়, হব গিয়ে কার অনুগত ॥
ছিল ভগ্ন ঘরখানি মা, দেখিতে সে শোভান্বিত।
ওমা ভূতের বাসা হল সেটা, দশদিশি সশঙ্কিত ॥

---

১ জিম্মা—আরবী জিম্মা। অধিকার। ২ কল্পতরু,—অভীষ্ট-ফলপ্রদ স্বর্গীয় বৃক্ষ।
৩ শ্রীনাথ, ইনি বোধ হয় রামপ্রসাদের গুরু ছিলেন। ৪ চতুর্ব্বর্গ ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ।

পাপ-লোনা লাগি দেওয়াল করিলেক জরাযুত।
আমার চালের বাঁধন ফেল্লে কেটে ছ'টা রুয়ে[1] অবিরত॥
প্রসাদ বলে ওমা তারা, বল কিসে হবে হিত।
আমায় ঘর বেঁধে ঘর করতে হ'লে, একাল আখেরের[2] মত॥ ১০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে আর হরষে॥
আগে ভাঙ্গাব গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে॥
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে।
রব রসাভাবে, হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে॥
ফলে ফলে সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে॥
মন কর কি, লওরে সুধা, দুজনাতে মিলে মিশে।
খাবে একই নিশ্বাসে যেন সূর্য্য তেজে সকল শোষে॥
রামপ্রসাদ লবে আমার কোষ্টি, শুদ্ধ সেই তারাবেশে
মাগী জানে না যে মন কপাটে, খিল দিয়েছি কত কসে॥১১॥

[রাগিণী সিন্ধুকাফী, তাল—একতালা]

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে॥
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে।
পরের জামিন হলে পরে, সে না দিলে আপনি ভরে॥
যখন দিনে নিড়াই[3] করে, শিকারী সব রয়না ঘরে।
জাঠা[4] বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে॥
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে।
যদি সে নিড়াতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে॥ ১২॥

[রাগিণী—টুরি জায়েনপুরী, তাল—একতালা]

আমায় ছুঁয়ো না রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোন্ রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়েছে।
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে॥

১ রুয়ে—উইপোকায়। ২ আখেরের <আ. আখীর্। অন্ত, পরিণাম।
৩ নিড়াই—শস্যক্ষেত্রের তৃণোৎপাটন। ৪ জাঠা—লৌহযষ্টি।

মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে।
ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয়জন ডিঙ্গা ছেড়ে চলে গেছে ॥
যে জোরে একঘোরে আমি, সে জোর আমার বজায় আছে।
প্রসাদ বলে বেজাত মোলে যম যেন আসে না কাছে ॥১৩॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী ॥
পদ-রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারী।[১]
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা তবু জিম্মা রাখ তাঁরি ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির্[২] তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী ॥
যদি তোমার বাপের[৩] ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের[৪] ধারা ধর তবে বটে তো মা পেতে পারি ॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥১৪॥

(খাম্বাজ—দাদরা)

আ মরি কি লাজের কথা
মিন্সের উপর মাগী।
পদে পড়িয়ে ভোলা অদ্ভুত এক যোগী ॥
এ কেমন নির্লজ্জ মেয়ে,
পতির বুকে চরণ দিয়ে
রয়েছ উলঙ্গী হয়ে রণ অনুরাগী।
নয়নে দেখ না চেয়ে,
একি সর্ব্বনাশী মেয়ে
লজ্জা সরম ত্যাগী ॥১৫॥
(অসম্পূর্ণ)

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদ পদ্ম, বাঁধা আছে শিবের কাছে ॥
ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে[৫] বা ডুবায় পাছে ॥

---

১ ত্রিপুরারী, শিব। যিনি ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণ বিনাশ করিয়াছেন। ২ জায়গির্ <ফা জাইগীর্। কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ রাজদত্ত জমি। ৩ তোমার বাপ, হিমালয় (যিনি পাষাণময়)। ৪ আমার বাপ, শিব (যিনি আশুতোষ)। ৫ টাটে—পূজার তাম্রপাত্রবিশেষ।

যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব ওপদ বাঁধা রাখিয়াছে ॥
বাপের ধনে বেটার সত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে, আমায় নিরংশী[১] করেছে ॥১৬॥

(রাগিণী—তাল জংলা, একতালা)

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলী ॥
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি, নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী ॥
বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তরে যেন পাই পাগলী।
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে।
আমি শরণ নিলাম চরণ তলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি ॥১৭॥

(রাগিণী—বেহাগ, তাল—আড়খেমটা)

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে ॥
শিশু কালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্প মতি, ভাসালে সায়েরের[২] জলে ॥
স্রোতের সেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবে না অগাধ জলে ॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণ তলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদের এই বাণী, শোন গো মা নারায়ণী।
তনু অন্তকালে আমায়, টেনে ফেল গঙ্গাজলে ॥১৮॥

(প্রসাদী সুর , তাল—একতালা)

আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে[৩], হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী ॥
মূলে[৩] পৃথ্বী ব, স, অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলায়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী ॥
স্বাধিষ্ঠানে[৪] ব, ল, অন্তরে, ষড়দলোপর বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥

১। নিরংশী—উত্তরাধিকারবঞ্চিত। ২। সায়ের, সায়র জলাশয়। ৩। সহস্রারে—ষট্‌চক্রভেদের শেষ লক্ষ্য সহস্রদল পদ্ম। ৩। মূলে, পায়ুদেশস্থিত আধার পদ্ম। আধার পদ্মের চারটি দল ও চারটি বর্ণ। এই পদ্মের মধ্যে ধরাচক্র নামে একটি চতুষ্কোণ চক্র আছে। এই পদ্মের মধ্যে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিতি করেন এবং তাঁর অমৃত-নির্গমন স্থানে মুখ লগ্ন করে ত্রিসার্ধবলয়াকারে সর্পরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন।
৪। লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান পদ্ম এর ছয়টি দল।

ত্রিকোণ মণিপুরে[১], বহ্নি বীজ ধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ॥
অনাহতে[২] ষট্‌কোণে, দ্বিষড়দল বাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ॥
বিশুদ্ধাখ্য[৩] স্বরবর্ণ, ষোড়শ দল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী ॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্র বীজে সুধা ক্ষরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী ॥১৯॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত, বলগে তোর যম রাজারে ॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীবরে ॥
সনদ আমার উরস[৪] পাটে, যেমি সনদ তেমি টাটে[৫]।
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন যে দিগম্বরে ॥
সনদ পেলাম মায়ের কাছে, এতে কি আর গলদ আছে।
প্রসাদ বলে ভয় দেখালে, যাবরে মায়ের দরবারে ॥২০॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আমার মন যদি হও মনের মত।
থাক রামপ্রসাদের অনুগত ॥
কুগ্রাম ব্যসতি ত্যজ, ত্যজ বন্ধু দারাসুত।
কালী কল্পতরু মূলে বাসা, কর এ জনমের মত ॥
কামাদি বিপক্ষ ছ'টা, তাদের কর বশীভূত।
মন জেনেছ তো সে যন্ত্রণা, জননী জঠরের যত ॥
তোমার রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিয়ে, পালাইবে রবিসুত।
তুমি পরমার্থ পাবে নিত্য, তাই তোমারে সাধি এত ॥২১॥

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় গো চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশায়, জেনেছি তোমার চাতুরি ॥
কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি ॥

১, ২, ও ৩—দ্রষ্টব্য ৭৮ পদের টীকা। ৪। উরস—বক্ষ। ৫। তাম্রপাত।

যশঃ অপযশঃ সুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরে আঁখিঠারি।
ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি ॥২২॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয়দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকবো না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র[১] ভ্রমাইল[২], চিন্তারাম[৩] চাপরাশী এসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে।
কিন্তু এমন কল করেছে কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে ॥
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাসে। আমার
সেই যে কালী, মনের কালী হলেম কালী তার বিষয় বশে ॥২৩॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ কাননে গিয়ে, নিরানন্দ নিবারিব ॥
গঙ্গাজলে বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসী জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব ॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে, নৃত্য করে গাল বাজাব ॥২৪॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতাল।

আমি কি আটাসে[৪] ছেলে।
ভয়ে ভুলবো নাকো চোখ রাঙালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে[৪] ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ,[৫] গুজরাইব[৬] মিছিল কালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়, শান্ত করে লবে কোলে ॥ ২৫ ॥

১। কুলালচক্র—কুমারের চাক। ২। ভ্রমাইল—ঘুরাইল। ৩। চিন্তারাম—চিন্তারূপ। ৪। আটাসে যে সন্তান আট মাসেই ভূমিষ্ঠ হয় অর্থাৎ দুর্বল। ৪। সওয়াল <আ. সবাল্। প্রশ্ন, জেরা। ৫। দস্তাবেজ <ফা. দস্ত্+আবেজ। দলীল। ৬। গুজরাইব <ফা. গুজর, গুজার। দাখিল করা।

(রাগিণী—জংলা, তাল—খয়রা)

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী ॥
আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন, দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা) ॥
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব (মা তারা) ॥
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেন ভব[১] (মা তারা) ॥ ২৬ ॥

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই ॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই ॥ ২৭ ॥

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা ॥
চেন না আমারে শমন, চিনলে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা ॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা[২] হাজা[৩]।
দেখ বালী চাপা সিকত[৪] নদী, তাতেও মহাল আছে তাজা ॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা ॥
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, জাননা সেই পদের মজা ॥ ২৮ ॥

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥

১। ভব—শিব। ২। শুকা—অনাবৃষ্টি হেতু অজন্মা। ৩। হাজা—অতিবৃষ্টি হেতু অজন্মা।
৪। সিকত—বালুময় ভূমি।

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী ॥
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান-ধর্ম্ম তদুপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরা পারে, যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী।
নাতোয়ানি[১] কাচ[২] কাচো[৩] মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥ ২৯ ॥

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

আমি নই পলাতক আসামি।
ওমা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ॥
বাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা, কবচ[৪] রাখি সালতামামি[৫] ॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে, আসল কসে সারে জমি।
এবার, তোমার নামের জোরে, থাক্‌ব ধরে নিষ্কর করে লব ভূমি ॥
প্রসাদ বলে খাজনা বাকী, নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ সিন্ধুমাঝে, ডুবেও পদে হব হামি ॥ ৩০ ॥

(প্রসাদীসুর—একতালা)

আমি হব না তীর্থবাসী।
মরব গলে দিয়ে তোর নামের ফাঁসি ॥
সবে করে গয়াকাশী,
আমি করি পাপ রাশি রাশি।
সে যে এমন তীর্থ নাইকো যাতে,
আমার পাপ করে নির্দ্দোষী ॥
পিতৃপুরুষ উদ্ধারিতে,
সবে করে গয়াকাশী।
করে সেই পায়েতে পিণ্ডদান,
পরে করে তার দিবসী ॥ ৩১ ॥
(অসম্পূর্ণ)

১। নাতোয়ানি<ফা. নাতুয়ান। অক্ষমতা।
২। কাচ—<সং. কক্ষ—প্রাক্‌. কচ্ছ—হি. কাছ। অভিনয়ার্থ নটনটীর বেশ, ছদ্মবেশ।
৩। কাচো—অভিনয় কর।
৪। কবচ—খাজনার রসিদ। ৫। সালতামামি—সমস্ত বৎসর।

(রাগিণী—মোহিনী, তাল—একতালা)

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একন্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আন্তে পারি হরে॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা।
তবে মানব দেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে॥
গুরু বাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে।
ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে॥ ৩২॥

(রাগিণী—মোহিনী বাহার, তাল—একতালা)

আয় দেখি মন তুমি আমি, বিরলেতে বসি রে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরুচরণে।
পদে লুকায়ে সুধা খাব, যমের বাপের কি ধার ধারিরে॥
মন বলে করিবে চুরি, ইহার সন্ধান বুঝিনে রে।
গুরু দিয়েছেন যে ধন, অভয় চরণ, কেমনে খরচ করি রে।
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলসা করিরে।
মধুপুরী যাব, মধু খাব, শ্রীগুরুর নাম হৃদয়ে ধরি রে॥ ৩৩॥

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল[1] কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে[2] বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
ওরে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মনটী হবি॥ ৩৪॥

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ[3], তীর্থ রাশি রাশি॥

১। চারিফল—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ২। হেড়ে—হাড়িকাঠ। ৩। কোকনদ—রক্তোৎপল, লাল পদ্ম।

কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
ওরে অনলে দাহন যথা, হয়রে তুলা রাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ ৩৫ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আর তোমায় না ডাকব কালী।
তুমি মেয়ে হয়ে অসি ধরে, লেংটা হয়ে রণ করিলি,
দিয়াছিলে একটা বৃত্তি তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খালি
দীন রামপ্রসাদ বলে মা, এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি ॥ ৩৬ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আর বাণিজ্যে কি বাসনা,
ওরে আমার মন বল না।
ওরে ঋণী[১] আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ[২] সেই লহনা[৩] ॥
ব্যজনে[৪] পবন বাস চালনেতে সুপ্রকাশ।
মনরে ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা ॥
কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল।
মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা ॥
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন।
মনরে ওরে শ্রীনাথ দত্ত, ধর তত্ত্ব কালের কপাট খোল না ॥
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী[৫]।
মনরে ওরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা ॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে।
মনরে ওরে সিন্দূর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা ॥ ৩৭ ॥

১। ঋণী—দায়ী। সাধনা করিলে মানবকে মুক্ত করতে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রতিশ্রুত।

২। সাধ—আদায় কর (সাধনা কর)। ৩। লহনা—বাকী। ৪। ব্যজন—বাতাস করণ।

৫। দিদিঘাতী—মনের দুই স্ত্রী, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সন্তান অবিদ্যা (অজানা) নিবৃত্তির সন্তান বিদ্যা (জ্ঞান)। জ্ঞানের সন্তান বিবেক। বিবেক জন্মিলেই প্রবৃত্তির নাশ হয়। অবিদ্যা এখানে দিদি।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আর ভুলালে ভুলব না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলব না গো ॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলব[1] না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলবো না গো ॥
ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলব[2] না গো।
আশা বায়ু গ্রস্থ হয়ে মনের কথা খুলব না গো ॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।
রামপ্রসাদ বলে, দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো ॥ ৩৮ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আর হব না গঙ্গাবাসী।
গঙ্গার সতীন পো সম্বন্ধে আসি ॥
পিতার ভালে অগ্নি জ্বলে, শিরে গঙ্গা অহর্নিশি।
জননী সংসার পালেন, কোপ করে তাঁর বুকে বসি ॥
বিমাতার চরিত্র যেমন, কত আর বলিব প্রকাশি।
তার সাক্ষী দেখ কৈকেয়ী কর্ল্লে রামকে জটা বাকলবাসী ॥
রামপ্রসাদ ভণে, এই মনে অভিলাষী।
এক স্থানে পাই তিনে যদি, যাই না তবে বারাণসী ॥ ৩৯ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

আর কেন গঙ্গাবাসী হব।
আমি ঘরে বসে মায়ের চরণ পাব ॥
আপন রাজ্য থাকিতে কেন,
পরের রাজ্যে রাজা হব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব ॥
পাদোদক থাকিতে কেন,
গঙ্গাজলে স্নান করিব।
আমি ঘরে বসে মন কষে,
মুক্তকেশীর নাম জপিব ॥
প্রসাদ বলে অন্য নয় যে,
ভুলাইলে ভুলে রব।
আমি আপন মনে ডাকি যদি,
যাঁর ছেলে তাঁর কোলে যাব ॥ ৪০॥

(এই পদটির আর একটি খণ্ডিত পদ অন্যত্র দেওয়া হল)

১। উলব—নামব। ২। বুলব—ঘুরে বেড়ানো।

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

আয় মন ব্যাপারে যাবি।
ক'রে সাধুসঙ্গে বেচাকেনা, মুনাফা দ্বিগুণ পাবি ॥
গুরুদত্ত যে ধন আছে, দেহতরী সাজিয়ে নিবি।
ওরে মূল মাস্তলে বাদাম[১] তুলে, দুর্গা বলে বেয়ে যাবি ॥
কামাদি তুফানে, হাল দমনে সতর্ক হবি।
ওরে জ্ঞান কিনারায় লাগিয়ে তরী ভক্তি ডোরে বেঁধে থুবি ॥
প্রসাদ বলে সাধু বাণিজ্যে, যে ধন ব্যাপারে পাবি।
সে ধন বিলাইলে ফুরাবে না, যখন চাবি তখন পাবি ॥ ৪১ ॥

(রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—জলদ তেতালা)

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী ॥
কেরে নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা, ভুবনমোহিতা,
একি অনুচিতা, কুলের কামিনী।
কুঞ্জরবর গতি আসবে আবেশ, লোলিত বসনা গলিত কেশ।
সুর নরে শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবে রে দনুজদলনী ॥
কেরে নব নীল কমল কলিকা বলি, অঙ্গুলী দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ করত, পূর্ণ শশধর বলি ॥
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে চাঁদ,
দোঁহে দোঁহে করতঁহি নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥
কেরে জঘন সুচারু, কদলী তরু, নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে।
তদূর্দ্ধে কটীবেড়া নর কর ছড়া, কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে ॥
করতল স্থল নিরমল অতিশয়, বামে অসি মুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়।
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥
কেরে উর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর, করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে।
অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে ॥
প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী নলকে।
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে, দম্ফে[২] কম্পে সঘনে ধরণী ॥ ৪২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ইথে কি আর আপদ আছে।
(এই যে তারার জমী আমার দেহ)
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য্য খোঁটা, ধর্ম্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥

১। বাদাম—নৌকার পাল। ২। দম্পে—দম্ভে।

দেখে শুনে ছয়টা বলদ[1] ঘর হোতে বাহির হয়েছে।
কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥
প্রেম ভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
প্রসাদ বলে কালীবৃক্ষে, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥ ৪৩ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা ॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাজের বেলা ॥
প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা ॥ ৪৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এই সংসার ধোঁকার টাটি[2]।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি ॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যেতে পাঁচ পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটী ॥
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি।
গর্ব্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটী ॥
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি।
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী ॥
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
ওমা যা ইচ্ছা তাই কর গো মা, তুমিতো পাষাণের বেটী ॥ ৪৫ ॥

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

একবার ডাকরে কালীতারা বলে, জোর করে রসনে।
ও তোর ভয় কিরে শমনে ॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্মকর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে ॥
ভজনের ছিল ভরসা, সূক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা।
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাব ভেবে মনে ॥ ৪৬ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এবার আমি করব কৃষি।
ওগো এ ভব সংসারে আসি ॥

১। ছয়টা বলদ—ষড় রিপু। ২। টাটি—বাঁশের প্রাচীর, ঝাঁপ।

তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী।
দেহ জমীর জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি।
মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হলে, আনন্দ সাগরে ভাসি॥
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত, কর গো মা মুক্তকেশী॥
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তারার, ও রাঙ্গা চরণে মিশি॥ ৪৭॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এই নিবেদন করি কালী।
কেন দুঃখের বোঝা আমায় দিলি॥
দিবানিশি মুদে আঁখি, 'কালী কালী' সদাই বলি।
ওমা তাইতে কি দীন দয়াময়ী, আমার প্রতি নিদয়া হলি॥
শুন বলি ও মা কালী, সাধ করে কি পাষাণ বলি।
ওমা আমায় ফাঁকি দিয়ে তারা, অভয় চরণ শিবকে দিলি॥
মা হয়ে মা ওমা তারা, ছেলের দশা এই করিলি।
এবার ভবে এনে রামপ্রসাদকে, জন্ম অন্ধ করে থুলি॥৪৮॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

একি লিখেছ কপাল জুড়ে।
ঐ যে দিনান্তে শ্রীদুর্গা নাম বলে না রসনা ভেড়ে॥
ভার নয় বোঝা নয় মা, কেবল ঘাটের মাটি খুঁড়ে।
তাতে বিল্বপত্র দিতে শক্তি হয় না কেনে জটের মুড়ে[১]॥
প্রসাদ বলে ওমা তারা, হয়ে আছি আদি কুড়ো[২]।
আমায় ছয়রিপু ছয় পেয়াদা হয়ে জপের মালা নিলে কেড়ে॥৪৯॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এযে বড় বিষম লেটা।
যেটা কবুলতি[৩], সেই সত্য হল, মিথ্যে করে দিলি পাটা[৪]॥
এক জনাকে জমি দিলি মা, ভাগ করিয়ে দিলি ছটা[৫]।
এবার ভবেতে ভূমিষ্ঠ হয়ে, আমায় সইতে হল খোঁটা॥
জমি জরিপ করে দিলি মা, কোণে কোণে মেপে কাঠা।
এবার কিস্তির সময় বুঝরে শম্ভু, আমি কেমন কালীর বেটা॥

১। জটের মুড়ে—শিবের মস্তকে। ২। কুড়ো—কুঁড়ে। ৩। কবুলতি<আ. কবুলিয়ত। প্রজা পাট্টার অনুরূপ সর্তে যে কাগজে লিখে জমিদারের নিকট খাজনা দিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হয় তার নাম কবুলতি। ৪। পাটা<পাট্টা। দলীল। ৫। ছটা—ষড়রিপু।

প্রসাদ বলে ওমা তারা, এবার কেমন উল্টা লেঠা।
আমি কিস্তি মত খাজনা দিলেম, তবু টাকায় সিকি বাটা[1] ॥ ৫০

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এবার আমি বুঝব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বলব এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন বিচারে ?
পিতা পুত্রে একক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বলব তারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন বিচারে ?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে, মায়ের অভয় চরণের জোরে ॥ ৫১ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি !
যে দেশেতে রজনী নাই, সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা জেনেছি ॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।
মণি মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥ ৫২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এবার কালী কুলাইব[2]
কালি কসে কালি বুঝে লব ॥
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করে, হৃদিপদ্মে নাচাইব ॥
কালী পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা[3] বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে দিব ॥
কালী ভেবে কালী হয়ে, কালী বলে, কাল কাটাব ॥
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালি দিয়ে চলে যাব ॥

১। বাটা—discount। ২। কুলাইব—উপায় বা বন্দোবস্ত করা। ৩। ছটা, ছয় রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।)

প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী বুলি না ছাড়িব ॥ ৫৩ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এবার কালী তোমায় খাব[১]।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ড যোগে জন্ম আমার
গণ্ডযোগে[২] জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব ॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা দিব ॥
হাতে কালী মুখে কালী সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥ ৫৪

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এবার বাজি ভোর হ'ল।
মন কি খেলা খেলাবি বল ॥
শতরঞ্চ[৩] প্রধান পঞ্চ[৪], পঞ্চে[৫] আমার দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে ম'ল ॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটাল।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হ'ল ॥
দুখান তরি নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে, ঘাটের তরি ঘাটে র'ল ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে, পীলের[৬] কিস্তে মাত হ'ল ॥ ৫৫ ॥

১। তোমায় খাব অর্থাৎ তোমার 'তুমিত্ব' কিংবা আমার 'আমিত্ব' যাইয়া উভয়ে এক হইব।
২। গণ্ডযোগ—"জ্যোতিষতত্ত্বে"র মতে অশ্বিনী প্রভৃতি কয়েকটি নক্ষত্রের দুষ্ট অংশকে গণ্ডযোগ বলে। এই যোগে জাত বালকের প্রায়ই মৃত্যু হয়। বেঁচে থাকলে পিতা বা মাতার মৃত্যু হয়। 'মুহূর্ত্তচিন্তামণি' ও 'পীযূষ-ধারা' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নারদের মতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের চারদণ্ড ও মূলা নক্ষত্রের প্রথম চার দণ্ড—এই আট দণ্ডকে গণ্ড বলে। এই যোগে বালক বা বালিকা জন্মালে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত অথবা ৮ বছর পর্যন্ত পিতা তার মুখ দেখবে না।
৩। শতরঞ্চ—দাবা। এখানে দাবাখেলার রূপকে ব্যর্থতার বর্ণনা।
৪। প্রধান পঞ্চ—মন্ত্রী, দুটি অশ্ব, দুটিগজ।
৫। পঞ্চে—পঞ্চেন্দ্রিয়ে।
৬। পীলের—বড়ের।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি॥
ভবের কাছে পেয়ে ভাব, ভাবিকে ভুল ভুলায়েছি।
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে, স্বত্বগুণে মন দিয়েছি॥
তারা নাম সারাৎসার, আত্ম শিক্ষায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গানামের কাচ পেয়েছি॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি॥৫৬॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এবার ভেবে হলেম সারা।
হল পাঁচ পাগলে বসত করা॥
মাতা ক্ষেপী পিতা ক্ষেপা, চেলা দুটো ক্ষেপা তারা।
মা তোর অভয়পদ চিন্তা করে, আমি হলেম পাগল পারা॥
তেমন ক্ষেপা কে দেখেছে, হৃদিপদ্মে পদধরা।
ঐ যে ত্যজ্য করে সোনার কাশী শ্মশানে বসতি করা॥
ঘরের কথা বলবো কারে, যেমন হাঁড়ি তেম্নি শরা।
ওরে এমন মেয়ে আর কে আছে, মুণ্ডমালা গলায় পরা॥
প্রসাদ বলে দেখে শুনে, আমি হলেম দিশেহারা।
মা তুই যা করিস্ তা করিস্ মেনে, গমন ভয়টি ক্ষান্ত করা॥ ৫৭॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এবার আমার বিপদ ভারি।
আমার মন ঘুমাল মায়া ঘুমে, বল মা কিসে চেতন করি॥
নবদ্বার[১] ঘর বেঁধেছিলাম মা, রেখেছিলাম ন'জন দ্বারী।
ও তার প্রধান দ্বারী রসনারে, কিছুতে বাগাতে নারি॥
লোকে বলে রামপ্রসাদ পাগল, ভাষা কবি আমি করি।
আমার এ যে ভাষা কি তামাসা, বলে না বুঝাতে পারি॥ ৫৮॥

(রাগিণী—মল্লার, তাল—খয়রা)

এলোকেশে কে শবে এলোরে বামা।
নখর নিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন তনু, মুখ হিমধামা।
কুলবালা বাহু বলে, প্রবল দনুজ দলে, ধরাতলে হতরিপু সমা॥
ভৈরব ভূত প্রমথগণ[২] ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, ববম বম বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা॥

১। নবদ্বার—দেহ। চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু, উপস্থ। ২। প্রমথগণ—শিবের অনুচর বর্গ।

ভয়ভব ভঞ্জন হেতু কবিরঞ্জন, মুঞ্চতি করম স্বনামা[১]।
তবগুণ শ্রবণে, সতত মনে মনে, ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা ॥৫৯॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

এলোকেশী দিগ্বসনা।
কালী পুরাও মোর মনবাসনা ॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি।
আমায় হবে কি না হবে দয়া, বলে দে মা ঠিক ঠিকানা ॥
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে।
এ মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে, এ বাসনা কেউ জানে না ॥৬০॥

(রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—রূপক)

এলো চিকুর নিকর, নরকর কটীতটে, হরে বিরহে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী ॥
শব শিশু ইষু, শ্রুতিতলে শোভে, বামে করে মুণ্ড অসি।
বামেতর[২] কর, যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসি ॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
সমস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা, সুরেশানুকূলা ষোড়শী ॥
প্রসাদে প্রসন্না, ভব ভবপ্রিয়া, ভবার্ণব ভয় বাসি।
জন্মুর[৩] যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা চরণে গয়া গঙ্গা কাশী ॥৬১॥

(রাগিণী—বিভাস, তাল—তিওট)

এলো চিকুর[৪] ভার, এ বামা! মার মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতিরূপ গতি,
রতিপতি মতি মোহ পায় ॥
অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়, এ জন্মের মত বিদায় ॥
কালী বলে এতকাল, এড়ালাম যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায়।
টেনে ফেল রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিব পূজার এই ফল, অশিব ঘটায় ॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়।
ভব দৈবরূপ শব, মুখে মাত্র নাহি রব, কার ভরসায় রব, হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী স্থান দিবে পায় ॥

১। মুঞ্চতি করম স্বনামা—কর্ম্ম ও স্বনাম ত্যাগ করিয়াছি। ২। বামেতর—দক্ষিণ।
৩। জন্মুর—জন্মের। ৪। চিকুর—কেশ।

স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এজন্ম কর্ম্ম সায় ॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি হয়েছে ঘটে,
এ শঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণান্তে মন লয় কর দৈত্য রায় ॥
ওহে দৈত্য রায়, ভজ এই দক্ষিণায়, আর কি কাজ আশায় ॥৬২॥

(রাগিণী—সিন্ধু, তাল—ঠুংরি)

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরা (ভরা) ॥ ৬৩ ॥

(রাগিণী—পিলুবাহার, তাল—জৎ)

এ শরীরের কাজ কিরে ভাই, দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক্ ধিক্, কালী নাম নাহি বলে ॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে।
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণ তলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ।
ওরে সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে ॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে।
ওরে না পুরে অঞ্জলি যদি, চন্দন জবা আর বিল্বদলে ॥
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা।
ওরে কালী মূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা সুখে নাহি চলে ॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার।
রামপ্রসাদ বলে বাবুই[১] গাছে, আম্র কি কখন ফলে ॥ ৬৪ ॥

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা ॥
মাগীর আপ্তবাক্যে গুপ্ত লীলা—
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটা চেলা ॥
কি রূপ, কি গুণ-ভঙ্গী, কি ভাব, কিছুই যায় না বলা।
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বালা ॥

১। বাবুই গাছ—বনতুলসী। বাবুই তুলসীর গাছ।

সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙ্গছে ঢ্যালা ॥
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী, নারাজ কেবল কাজের বেলা ॥
প্রসাদ বলে, থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা ॥ ৬৫ ॥

(রাগিণী—জয়জয়ন্তী, তাল—জৎ)

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি ॥
নাইকো জরীপ জমাবন্দী,[১] তালুক হয় না লাট-বন্দি[২] (মা)।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী ॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা,[৩] দিতে হয় না মাথট[৪] বাটা (মা)।
জয় দুর্গার নামে জমা আটা, ঐটা করি মালগুজারি[৫]।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ (মা)
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি ॥ ৬৬ ॥

(রাগিণী—ললিত, তাল—তিওট)

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥
তনু নব ধরাধর, রুধিরধারা নিকর,
কালিন্দী জলে কিংশুক ভাসিছে।
বদন বিমল শশী কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তমোরাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা কমল পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে ॥ ৬৭ ॥

(রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—ধিমা তেতালা)

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ।
বসনবিহীনা কে রে সমরে ॥
মদন মথন উরসি রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয় কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জনমনোহরা শমন সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে ॥
শস্ত্রে শাস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন নগরে ॥
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু কদম্বে[৬],
সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে ॥ ৬৮ ॥

১। জমাবন্দী—প্রজাবিলির হিসাব।
২। লাটবন্দি—বাকি খাজনার দায়ে নিলামে বিক্রয়ের জন্য তালিকাভুক্ত। ৩। লেঠা—ঝঞ্ঝাট।
৪। মাথট—মাথাপিছু চাঁদা। ৫। মালগুজারি—রাজস্ব। ৬। কদম্বে—সমূহে।

(রাগিণী—বেহাগ, তাল—একতালা)

ও কেরে মনমোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী ॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎঘটা, মণি মরকত কান্তি ছটা।
একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য দলনা, ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি[১] সপ্ত হোতি[২], সপ্তবিংশ-প্রিয় নয়নী।
শশী খণ্ড শিরসী, মহেশ উরসী, হরের রূপসী একাকিনী ॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে, বেসরে মণি।
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধারস কূপ, বদনখানি ॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ, কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা, নিকটে প্রমদা প্রমাদ গণি ॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিষাদ, পড়িল প্রমাদ স্বরূপে, মানি।
না হব জয়ী রে, ব্রহ্মময়ী রে, করুণাময়ীরে, বল জননী ॥ ৬৯ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব।
ও তুই শকার বকার বলতে পারিস, বলতে নারিস দুর্গা শিব ॥
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাজা।
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব ॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব।
রে চুরি দারি করিলে পরে উচিত মত সাজাই পাব ॥ ৭০ ॥

ও মন, তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত,
হরি-হর তোর এক হ'লো না।
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূল কথা মনে বোঝ না;
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে
ক'রে আত্ম-প্রতারণা।
অসি-বাঁশীর মর্ম্ম বুঝে
(তোমার) কর্ম্ম করা আর হ'লো না।
যমুনা আর জাহ্নবীকে
একভাবে মনে ভাব না।
প্রসাদ বলে, গণ্ডগোলে
এ যে কপট উপাসনা।
(তুমি) শ্যাম-শ্যামাকে প্রভেদ কর,
চক্ষু থাকৃতে হ'লে কানা ॥ ৭১ ॥

১। পেতি—প্রেতিনী। ২। হোতি—সাধন বিশেষ। হোত্র বা যজ্ঞবিশেষ।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ও মা শ্যামা নেবে দাঁড়া, নাচিস্‌নে আর ক্ষেপা মাগী।
মরে নাই ও বেঁচে আছে মা, মহাযোগে পরম যোগী॥
যে দেখি তোর চরণের জোর, মা নাব নইলে ওর ভাঙ্গলো পাঁজর,
(বুড়োর) বিষ খেকো হাড় নয় মা সজোর,
তাহে আবার তোর বিয়োগী।
বিষ খেয়ে যার হয় নাই মরণ, সে মর্‌বে আজ কিসের কারণ,
প্রসাদ বলে ওর কপট মরণ,
মা তোর অভয় চরণ পাবার লাগি[১] ॥ ৭২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে, রেখেছ সব পাগল করে॥
মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে।
ঐ সে এম্নি কালীর কাপ আছে যে, যেম্নি দেখে তেম্নি করে॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিকৃঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে যায় গো জ্বালা, তারা যদি চায় গো ফিরে (অনুগ্রহ করে) ॥৭৩॥

(রাগিণী—সোহিনী বাহার, তাল—আড়খেম্‌টা)

ওমা ! হর গো তারা, মনের দুখ।
(আর তো দুঃখ সহে না ॥)
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলি ওনা ওনা॥
জন্মমৃত্যু যে যন্ত্রণা, যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুমি কি জান যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না।
রামপ্রসাদ এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মায়ের চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না ॥৭৪॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ওরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম।
(আমার) এ তনু তরণী ভবসাগরে ডুবালাম॥
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
(তাতে) ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম॥
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেয়ে না বাঁধিলাম॥

১। এই পদের একটি পাঠান্তর ১৯৫ নং পদে পাওয়া যাবে।

প্রসাদ বলে মা মাগো আমি কি কার্য্য করিলাম।
(আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥৭৫॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি।
গুরুদত্ত রত্নভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥
রামপ্রসাদ বলে সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে ভাল হবে কি মহাজনকে মজাইলি ॥৭৬॥

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

ওরে মন চড়কি চরক[1] কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে ॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মনরে ওরে, কর পঞ্চ বিল্বদলে পূজিছ তাহারে ॥
ঘরেতে যুবতীর বাক, গাজনে[2] বাজিছে ঢাক।
মনরে ওরে, বৃন্দাবলী খ্যামটা ঢালি, বাজায় বারে বারে ॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে।
মনরে ওরে, এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে ॥
দীর্ঘ আশা চড়ক গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে, মায়া ডোরে বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে ॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার।
মনরে ওরে, সিঙ্গে ফুঁকে[3] শিঙ্গে পাবি, ডাক কেলে মারে ॥৭৭॥

(রাগিণী—পিলু বাহার, তাল—জৎ)

ওরে মন বলি ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফিরে মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণপটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।

১। পাঠান্তর 'ভ্রমণ'। চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক অনুষ্ঠান দেখে পদটি লেখা।
২। গাজনে—শিবের উৎসব। ৩। শিঙ্গে ফুঁকে—মৃত্যু হইলে।

কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী[১], বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ওরে, আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে ॥৭৮॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ওপদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়েছে ॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে, স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে ॥
হিসাব বাকী থাকে যদি, দিব না রে তোদের কাছে।
ওরে, রাজা থাকতে কোটালের দোহাই,
কোন্ দেশেতে কে দেখেছে ॥
শিব রাজ্যে বসতি করি, শিব আমার পাট্টা দিয়েছে।
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ॥৭৯॥

(রাগিণী—পিলু বাহার, তাল—জৎ)

ওরে সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে ॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে (মা)
আমার জ্ঞান সুরীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা (মা)।
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥৮০॥

---

১ পঞ্চাশৎ-বর্ণময়ী

অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত পঞ্চাশটি মাতৃকাবর্ণ দেবী সরস্বতীর অক্ষমালা ও দেবী কালীর মুণ্ডমালা। এই পঞ্চাশদ্বর্ণ থেকেই নবকোটি মহামন্ত্রের আবির্ভাব বা সৃষ্টি। চতুর্দলযুক্ত মূলাধারপদ্ম (বা চক্র) থেকে সহস্র-দলযুক্ত সহস্রারপদ্ম (ব্রহ্মরন্ধ্র) পর্যন্ত যিনি গীত হন এবং মাতৃকারূপে সর্বদা বিহার করেন তিনিই পঞ্চাশদ্বর্ণ-ময়ী মাতৃকা।

আধারপদ্মের চারিটি দলের চারিটি বর্ণ—বং শং ষং সং
স্বাধিষ্ঠানপদ্মের ছয়টি দলের ছয়টি বর্ণ—বং ভং মং যং রং লং
মণিপুরপদ্মের দশটি দলের দশটি বর্ণ—ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং
অনাহতপদ্মের বারটি দলের বারটি বর্ণ—কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং
বিশুদ্ধ পদ্মের ষোলটি দলের ষোলটি বর্ণ—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ
আজ্ঞাপদ্মের দুটি দলের দুটি বর্ণ—হং ক্ষং
মোট পঞ্চাশটি বর্ণ।

মাতৃকার অপর নাম বর্ণমালা। এ বর্ণমালাই মুণ্ডমালারূপে দক্ষিণাকালী, বামাকালী, তারা ও অন্যান্য কালীর গলদেশে শোভমানা। মুণ্ডমালার প্রতিটি নরমুণ্ড নিত্যবর্ণের প্রকাশক।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কও শমন কি মনে করে।
নাহি লাজ এলে সাজ করে ॥
আমি সে দয়া করেছি রফা কালী নামে কবজ পুরে ॥
আসা করে এলে যদি, খালি মুখে যাবে ফিরে।
আছে ষড়্‌রিপু করে কাবু, নে যা বাপু দেই গো ধরে ॥
জারিজুরি কর কিরে, ঘর নাই তোর অধিকারে।
আমি কালি নামে চৌহদ্দি পাটা, লয়েছি খারিজ করে ॥
প্রসাদ বলে যাও না চলে, ভয় নাহি তোর অন্তরে।
সে যে মা মোর কালী মুণ্ডমালী, আজি বলি লবেন তোরে ॥ ৮১ ॥

কত বাজি দেখবি গো মা!
আর কি বাজির বাকি আছে?
(আমি) আশি লক্ষ সং সেজেছি
ব্রহ্মময়ি! তোমার কাছে ॥
দেখাতে তোমারে বাজি, হয়েছি মা! গজবাজী
কপি, ঋক্ষ, ব্যাঘ্র সাজি,
শিখি, সেজে বেড়াই নেচে ॥
বড় মানুষের তরে, বাজিকরে বাজি করে,
কিঞ্চিদর্থ দেয় তাহারে লোকে নিন্দা করে পাছে ॥
রামপ্রসাদের বাজি করা
ভাল যদি না হয় মা তারা!
দূর করে দে, ভবদারা!
(আমার) বাজি করা যাক মা ঘুচে ॥ ৮২ ॥

কত রঙ্গ জান রণে শ্যামা।
(পাগলা মায়ী কে রে আমার কালী মায়ীকে)
এলায়ে পড়েছে বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
উন্মাদিনী, এলোকেশী মা অসি ধরেছে ॥
পরের ছেলের মুণ্ড কেটে,
পরেছ মা গলায় গেঁথে,
পদতলে ন্যাংটা জটে পড়ে রয়েছে ॥ ৮৩ ॥

রাগিণী—মুলতান ধানেশ্রী, তাল—একতালা)

করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা)
আমার এম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ ॥

কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী অশ্ব রথ চয়।
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেহ নই॥
কেহ রহে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই।
মা গো, আমি কি তোর পাকা থেতে দিয়াছিলাম মই॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নি অই।
ওমা আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥ ৮৪॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কই তারা তোর বিবেচনা।
তাই বলি গো শ্যামা ত্রিনয়না॥
যাব ভবপারে কেমন করে, কি আছে মোর সম্ভাবনা॥
অকৃতী সন্তান জননীর হয় ভাবনা।
ওমা তোমার কেন উল্টা বিচার, অধিকন্তু দাও যাতনা॥
জাননা সন্তানের স্নেহ, জননী তব ছিল না।
ওমা পাষাণ কন্যে পাষাণ হলে, মলেও ত চেয়ে দেখ না॥
নির্গুণ রামপ্রসাদ তোর, ব'লে মা সন্তান ছেড় না।
কর মা হয়ে মা বিড়ম্বনা, কলঙ্কেরি ভয় রাখ না॥ ৮৫॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥
গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিমকালে জয়দুর্গা বলে, স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥ ৮৬॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কাজ কিরে মন, যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য[১] রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ, মায়ের ও চরণ বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥ ৮৭॥

১। কৈবল্য—মোক্ষ, সংসার মুক্তি।

(রাগিণী—ইমন, তাল—একতালা)

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃতকাশী, তত্ত্বরসি বিগলিতকেশী ॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি[১] বলে তারে ঘোষি ॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী
মায়ের করুণা বরুণাধারা, অসিধারা অসি ॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশমহিষী ॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসী।
ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার কালীনামের ফাঁসি ॥ ৮৮ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কাজ হারালাম কালের বশে।
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে ॥
যখন তারা ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে ॥
এখন আমার ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি, ধর্ব্বে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডিবেশে ॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে ॥ ৮৯ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কাজ কি থেকে কালের ফাঁসে ॥
শ্যামা মায়ের চরণ, ভাব ওরে মন,
হবে শমন দমন অনায়াসে ॥
রেখে ভক্তি মায়ের পদে, তরে যাবি ঘোর বিপদে,
কেন মিছে মত্ত বিষয় মদে কিছুই ত পাবিনে শেষে। ৯০॥
(অসম্পূর্ণ)

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কাজ কি আমার মুক্তি পদে।
যদি ভক্তি থাকে দুর্গা নামে মাকে ডাকি মনের সাধে ॥

১। মণিকর্ণি—কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাট একান্ন তান্ত্রিক পীঠের একটি এখানে সতীর কাণের কুণ্ডল পড়ে।

সালোক্য[১] সাযুজ্য[২] মুক্তি, নির্ব্বাণ আদেশ শিব উক্তি।
ভক্তি মুক্তি করতলে, আদ্যাশক্তি যার হৃদে ॥
কালী নামের পেলে অন্ত, কি করবে রে সে কৃতান্ত।
শ্যামার চরণ পাব অন্তে, তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদে ॥৯১॥

(অসম্পূর্ণ)

(রাগিণী—সুরট, তাল—কাওয়ালি)

কামিনী যামিনী-বরণে রণে এলো কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি, উল্লাসিতা দানব নিধনে
পদভরে বসুমতী, সুভীতা কম্পিতা অতি।
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, তবে আর কিবা ভয়।
অনায়াসে যম জয় জীবনে মরণে রণে ॥৯২॥

(রাগিণী—মূলতান, তাল—একতালা)

কার বা চাকরী কর, (রে মন)।
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কে রে, হলিরে তুই কার নফর ॥
মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি, কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন) ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে তারার নামটি সার।
ওরে মিছে কেন দারা সুতের বেগার খেটে মর (ওরে মন) ॥৯৩॥

(রাগিণী—মূলতান, তাল—একতালা)

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে ॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে ॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে ॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে ॥৯৪॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কাল হারালাম কালের বশে।
কি হবে মা মোর অবশেষে ॥
তখন কারে ডাকবো তারা, শমন এসে ধরলে কেশে ॥

১। সালোক্য—পঞ্চপ্রকার মুক্তির অন্যতম। একলোকে ইষ্টদেবতার সঙ্গে বাসরূপ মুক্তি।
২। সাযুজ্য—পঞ্চপ্রকার মুক্তির অন্যতম। ব্রহ্মে বিলয়মুক্তি।

পুরাণে শুনেছি, আমি 'পতিত পাবনী তুমি'।
এবার তোমার ভার তারা, যেন বিপক্ষেতে নাহি হাসে ॥
প্রসাদ গতি মতি হীন কুমতি কুরতি ক্ষীণ।
কেবল মাত্র আছি কালী, অভয় চরণ পাবার আশে ॥৯৫॥

(রাগিণী—বসন্ত বাহার, তাল—একতালা)

কালী কালী বল রসনা।
কর পদ ধ্যান, নামামৃত পান, যদি পেতে ত্রাণ থাকে বাসনা ॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন ॥
দুরন্ত শমন বাঁধিবে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না ॥
দুর্গা নাম মুখে বল একবার, স্বর্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার, সকলি অসার ভেবে দেখ না ॥
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখ না কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে সব যম-যন্ত্রণা ॥৯৬॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কালী কালী বল রসনা রে।
ওমা ষট্‌চক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥
তিনটে কাছি[১] কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতার, সারথি তার, রথ চালায় দেশদেশান্তরে ॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময় শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে ॥
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করনা রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে। ওমন,
এইত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার দু অক্ষরে ॥৯৭॥

(রাগিণী—মূলতানী, তাল—একতালা)

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এতনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকূল., কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি।
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইব ধেয়ে ॥৯৮॥

১। তিনটে কাছি—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কালী গো কেন লেংটা ফের।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥
তেজে রত্নহার মা তোমার, ওকণ্ঠে শোভে নরশির।
প্রসাদ বলে ঐরূপে মা, ভয় পেয়েছেন দিগম্বর॥৯৯॥

(রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—আধ্বা)

কালী তারার নাম জপ মুখেরে।
যে নামে শমন ভয়ে যাবে দূরে রে॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে।
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি।
দ্বিজ প্রসাদের নতি, চরণতলে রেখ রে॥ ১০০ ॥

কালি ব্রহ্মময়ী গো।
বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোজ তলাসি॥
মহাকালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
এ মা অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥ ১০১ ॥

কালীপদ আকাশেতে
মন ঘুড়িখান উড়তেছিল।
কলুষ কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ি

মায়া-কন্যা হল ভারী,
ঘুড়ি আর রাখিতে নারি,
দারাপত্য মায়া দড়ি,
এরা দুজন জয়ী হল।
কাপে দন্তী ছেড়ে ছিড়ে,
ফাঁক পেয়ে তারা জিতে গেল ॥ ১০২ ॥

(অসম্পূর্ণ)

(রাগিণী—পিলু বাহার, তাল—জৎ)

কালী নাম জপ কর, সবে কালীর কাছে।
কালী ভক্ত জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে ॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু।
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্প-গাছে ॥
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী।
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে ॥
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ।
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে ॥
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়।
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক পাছে ॥ ১০৩ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা ॥
ওরে ধিক্‌রে রসনা, তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা।
নিরাকার সাকার ককার সবাকার ভিটা ॥
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম ইহার পর আর আছে কিটা ॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাততালীটা ॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জেলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল, শ্রুব[1] কর যত্ন যেটা ॥
প্রসাদ বলে হৃদি ভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণা কালীর, দেবোত্তরের দাগা চিঠা ॥ ১০৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কালীপদ মরকত আলানে[2] মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে, কর্ম্মপাশ ফেল কেটে ॥

১। শ্রুব—যজ্ঞে ঘৃত ক্ষেপনার্থ পাত্র ২। আলানে—গজ বন্ধন স্তম্ভ।

নিতান্ত বিষয়াসক্ত, মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে ॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে, শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল, বুঝনারে দুঃখ চেটে ॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়, মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম করে, ব্রহ্মরন্ধ্র যাক কেটে ॥ ১০৫ ॥

(রাগিণী—ললিত বিভাস, তাল—আড়খেম্‌টা)

কালীর নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে ॥
শোন্‌রে শমন তোরে কই, আমিতো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে।
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে, খাবে ভোগা দিয়ে ॥
কটু বলবি সাজা পাবি, মাকে দিব ক'য়ে।
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয় যেন শ্যামা গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাই, চক্ষে ধূলা দিয়ে ॥ ১০৬ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম[১] নিগম[২] শিবের বচন, মানবি কি না মানবি সেটা ॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ভুলেনা আর সিদ্ধি ঘোটা ॥
যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটীতে কৌপীন মেলে না, গায় ছাই আর মাথায় জটা ॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমায় লোহাপিটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা ॥
চাকলা[৩] জুড়ে নাম রটেছে শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এযে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা ॥ ১০৭ ॥

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে ॥
পৃথক প্রণব[৪] নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি ॥

১। আগম—তন্ত্রশাস্ত্র। শিবমুখে নির্গত তন্ত্র। আ—গতং শিবক্ত্রেভ্যোঃ, গ—তঞ্চ গিরিজা শ্রুতৌঃ, ম—তঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে। ২। নিগম—পার্বতী মুখনির্গত তন্ত্র।
৩। চাকলা—কয়েকটিপরগণার সমষ্টি। ৪। প্রণব—ঈশ্বরের গূঢ় নাম (ওঁ)

নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছে ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিতসাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু শ্যামা শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি ॥ ১০৮ ॥

কাশী যেতে কই মন সরে।
আমার হাসি পায় আর দুঃখ ধরে ॥
সবাই বলে যাব কাশী,
সে কাশীতে কি কাজ করে।
আমি যার জন্যে যাব কাশী;
সেই সর্বনাশী সঙ্গে ফিরে ॥
প্রসাদ বলে শিবের কাশী,
আমি না তায় ভালবাসি
আমার হৃদয়-কাশীর মধ্যে আসি,
সেই এলোকেশী বিরাজ করে ॥ ১০৯ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কি আর বৈদিক পূজা আছে (মা)
আমার সুযশ নাই অযশ ঘটেছে ॥
আমার নাই অবকাশ হ'ল সব কাজ, জন্ম মৃত্যু দুট অশৌচ ঘটেছে ॥
চিন্তা ভার্য্যা বন্ধ্যা ছিল, সে ভার্য্যা প্রসব করেছে ॥
কাল অনুক্রমে সুসঙ্গমে, জ্ঞান আনন্দ নামে, এক পুত্র জন্মেছে ॥
কুবুদ্ধি এক জনক ছিল, সেও আমারে ত্যাগ করেছে।
সেই পিতার লাগি হয়ে বিবাগী, মায়া নামে আমার মা মরেছে ॥
রোগ শোক দুটি ভ্রাতা, কেহ কৃপণ কেহ দাতা।
ভগ্নী দুটী ক্ষুধা তৃষ্ণা, যশ প্রসংশা নাই কারো কাছে ॥
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে, যত বিপদ গৃহবাসে।
এমন সম্বল লয়ে কৃত্তিবাসে, জয় কালী বলে বেড়াই নেচে ॥ ১১০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কি ধন দিবি আর তোর কি ধন আছে।
তোর যত ছিল ধন সম্পত্তি, শিব আগে বুকে রেখেছে ॥
যে ধন তোর ছিল তারা, সে ধন ত সব ফুরায়েছে।

শিব সেই ধনকে ব্রহ্ম জেনে, পদতলে পড়ে আছে ॥
তোমার ধনের মধ্যে অন্তে পদ, সে ত শিবের সম্পদ পদ।
ভেবে শিব সে সম্পদ, নয়ন মুদে পড়ে আছে ॥
খেয়ে ভোলা সিদ্ধি গোলা, নেশাতে ভোর হয়ে আছে।
ডাক্‌লে সাড়া দেয়না তারা, ও সে ধনের ঘড়া ধরে আছে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ বলে, সে ধনের অংশ দিতে হবে বলে।
চায়না ভোলা চক্ষু মেলে, জেগে ঘুমায়েছে ॥ ১১১ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কি গুণে মা ব'লব তোরে।
দুঃখি তাপিত তোমার নিন্দে করে।
ওমা তোমার জন্যে বাবা পাগল, বিমাতাকে মাথায় করে ॥
বোঝে না সে বুড়ো বেটা, তোমার দুর্গা নামে কেঁদে মরে।
তার কি বাপের সাধ্য আছে তারা, দশ হাতে খাওয়াতে পারে ॥
সদাই বাক্য জ্বালা তারা, দিস্ কেন তুই মোর বাপেরে।
মরে ছিলে শতবার মা, হাড় গেঁথে হর গলায় পরে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, লোকে নিন্দে করে গো মোরে।
মা যদি হয় অন্নপূর্ণা, অন্ন নাই তোর বাপের ঘরে ॥ ১১২ ॥

ষট্‌চক্রভেদ[১]

[রাগিণী—সোহিনী বাহার, তাল—আড়্‌খেম্‌টা]

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী, তারা আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে ॥
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিবশক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে ॥
ভুজঙ্গ রূপা (ভুজঙ্গপা) লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে ॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ফ, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয়-ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥

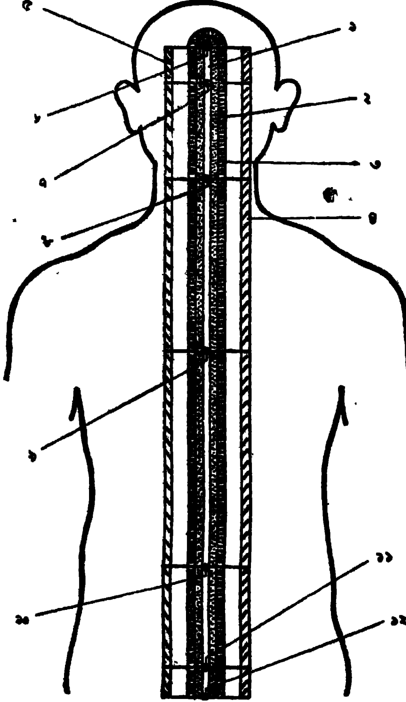
১। ষটচক্রভেদ—মেরুদণ্ডের দুদিকে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুটি নাড়ী আছে। ঐ ইড়ার দক্ষিণে এবং পিঙ্গলার বামে সুষুম্না নাড়ী মস্তক পর্যন্ত ব্যাপ্ত রয়েছে। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রাখ্যা নাড়ী ও তার

ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।
ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ,
ষং রং লং হং হৌং স্বরে ॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ, তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥
উপাসনা ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কাল পদ ভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে ॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি (আর) বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে।

অবস্থিত। শরীরের মধ্যে স্থানবিশেষে অর্থাৎ পায়ুদেশে, লিঙ্গমূলে,
অভ্যন্তরে চিত্রিণী নামে একটি নাড়ী
নাভিমূলে, হৃদয়ে, কণ্ঠদেশে, এবং ভ্রূমধ্যে যথাক্রমে আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা
নামে সুষুম্নানাড়ীতে গ্রথিত ছটি পদ্ম কল্পনা করা হয়েছে। সুষুম্না নাড়ীর শীর্ষদেশে সহস্রদল পদ্ম।
জগচ্চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মা সাধারণতঃ (ত্রিসার্ধবলয়াকারে) নিদ্রিতা থাকেন। সাধক
শক্তিসাধনায় এই কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করেন। শক্তিময়ী মাতৃকাবর্ণবীজের দ্বারা জাগ্রত করে চক্রে
চক্রে অর্থাৎ মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠানে, স্বাধিষ্ঠান থেকে মণিপুরে, মণিপুর থেকে অনাহতে, অনাহত থেকে
বিশুদ্ধে, বিশুদ্ধ থেকে আজ্ঞায় এবং আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রদল পদ্মে সে শক্তিকে উন্নীত করতে হয়, তবেই
শিবশক্তিসামরস্যসুখের অনুভূতি লাভ সম্ভব হয়। এই চক্র বা পদ্মগুলির প্রতিটি পাপড়িতে মাতৃকাবর্ণমালা
নিহিত। ঐ সকল বর্ণমালা বিচিত্র বর্ণ ও দ্যুতিযুক্ত। সাধক ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর প্রবাহ রুদ্ধ করে সুষুম্নার
মধ্য দিয়ে জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তিকে ঊর্ধে চালিত করবেন। এভাবে সহস্রারকমলে জাগ্রত পরাসম্বিদ্রূপ
শিব ও ভট্টারকের সঙ্গে কামকলাশক্তি সম্পরিষক্ত হয় এবং তখনই সে সম্পরিষক্ত মহাবিন্দু থেকে অমৃতধারার
ক্ষরণ হয়। কামকলাবিলাসতন্ত্রে মাতৃকাশক্তিরূপা কুণ্ডলিনীর উদ্বোধনের প্রক্রিয়া দেওয়া আছে।
[শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য প্রণীত ‘তন্ত্রতত্ত্ব’ ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক
সম্প্রদায়ে’র দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য]

৪। ষটপদ্ম বা ষড়চক্র—১ম মূলাধার ; ২য় স্বাধিষ্ঠান ; ৩য় মণিপুর ; ৪র্থ অনাহত ; ৫ম বিশুদ্ধাখ্য ;
৬ষ্ঠ আজ্ঞা।
১ম চারদল পদ্ম ; ২য় ছয়দল পদ্ম ; ৩য় দশদল পদ্ম ; ৪র্থ বারদল পদ্ম ; ৫ম ষোলদল পদ্ম ;
৬ষ্ঠ দুটিদল পদ্ম। এখানে এই পদ্মবন। হংস হলেন শিব এবং হংসী শক্তি।

চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশ শতদল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনে প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ ১১৩ ॥



১। চিত্রিনী নাড়ী,
২। বজ্রাখ্যা নাড়ী,
৩। সুষুম্না নাড়ী,
৪। পিঙ্গল্যানাড়ী,
৫। ইড়া নাড়ী
৬। সহস্রার বা সহস্রদল্ পদ্ম,
৭। আজ্ঞা পদ্ম,
৮। বিশুদ্ধ পদ্ম,
৯। অনাহত পদ্ম,
১০। মণিপুর পদ্ম,
১১। স্বাধিষ্ঠান পদ্ম,
১২। আধার পদ্ম । পদ্ম বা চক্র।

মেরুদণ্ডের দুদিকে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। ইড়ার দক্ষিণে ও পিঙ্গলার বামে সুষুম্না নাড়ী মস্তক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সুষুম্নার মধ্যে বজ্রাখ্যা এবং বজ্রাখ্যার মধ্যে চিত্রিণী। শরীরের মধ্যে স্থান বিশেষে সুষুম্না নাড়ীতে সাতটি পদ্ম কল্পনা করা হয়েছে—আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রদল।

সাধকে নিজগুরুর উপদেশ অনুসারে শরীরস্থ বায়ুর যোগে অগ্নির গতি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বোধিত করবে। পরে হুঁ এই বীজ উচ্চারণ করে তাঁকে চেতন করে চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যগত পথ দিয়ে মূলাধার থেকে আজ্ঞা পর্যন্ত ছয় পদ্মকে এবং মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞা এই তিন পদ্মে অবস্থিত তিন শিবকে ভেদ করবে। তারপর কুণ্ডলিনীকে সহস্রদল কমলে স্থাপন করে তত্রস্থিত পরম শিবের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। তারপর উভয়ের সংযোগ থেকে যে পরমামৃত গলিত হবে তা পান করে পূর্ব্বের কুল-পথ দিয়ে কুণ্ডলিনীকে মূলাধার পদ্মে নিয়ে আসবে।

পদ্ম বা চক্রগুলির বিবরণ:—আধার পদ্ম—পায়ুদেশের কিছু উর্ধে অবস্থিত। পদ্মের

চারটি দল এবং দলে চার বর্ণ—বং শং ষং সং। পদ্মের মধ্যে চতুষ্কোণ ধরাচক্র এবং তার আট দিকে আটটি শূল। মধ্যস্থলে পৃথিবী বীজ লং এবং কর্ণিকামধ্যে একটি ত্রিকোণ যন্ত্র চিহ্নিত রয়েছে। এই পদ্মে লিঙ্গরূপে মহাদেব অবস্থিত। তাঁর অমৃত নির্গমনস্থানে মুখ রেখে সর্পরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি বাস করেন।

স্বাধিষ্ঠান পদ্ম—লিঙ্গমূলে অবস্থিত। ছয়টি দল এবং ছয়টি দলে ছয়টি বর্ণ—বং ভং মং যং রং লং। পদ্মের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি বরুণমণ্ডল। মণ্ডলের মধ্যে অর্ধচন্দ্র তাতে বর্ণ বং। এই পদ্মের মধ্যে বারুণী শক্তি স্থিতি করেন। মণিপুর পদ্ম-নাভিমূলে অবস্থিত। দশটি দল এবং দলে বর্ণ দশটি—ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং। পদ্মের মধ্যস্থলে ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল অবস্থিত। এই ত্রিকোণের তিন পাশে স্বস্তিকাকার তিনটি ভূপুর এবং মধ্যস্থলে রং এই বর্ণটি চিহ্নিত। এই পদ্মের মধ্যে লাকিনী শক্তি অবস্থিত। অনাহত পদ্ম—হৃদয়ে অবস্থিত। দ্বাদশটি দল এবং দলে দ্বাদশটি বর্ণ—কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং। পদ্মের মধ্যে ছয় কোণ বিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল এবং তার মধ্যে যং বীজ বিদ্যমান। এই পদ্মে শিব ও কাকিনী শক্তি বাস করেন।

বিশুদ্ধ পদ্ম—কণ্ঠদেশে অবস্থিত। ষোড়শ দল এবং ষোড়শ দলে ষোড়শ বর্ণ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ। পদ্মের মধ্যস্থলে গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল এবং তার অভ্যন্তরে গোলাকৃতি নভোমণ্ডল এবং হং বীজ বর্তমান। এই পদ্মে শাকিনী শক্তি অবস্থান করেন। আজ্ঞাপদ্ম ভ্রূমধ্যে অবস্থিত। দ্বিদল পদ্ম। দুই দলে বর্ণ—হং ক্ষং এবং পদ্মের মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি ও সেই শক্তির মধ্যে শিব অবস্থান করেন। এই পদ্মে হাকিনী শক্তি অবস্থান করেন।

সহস্রদল—আজ্ঞাচক্রের কিছু উর্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা অবস্থিত। তার উপরিভাগে চন্দ্রবিন্দু, তার ওপরে শঙ্খিনী নাড়ী এবং সর্বোপরি সহস্রদল পদ্ম। তার পঞ্চাশৎ দলে অকারাদি ক্ষকার পর্যন্ত সবিন্দু পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্রমণ্ডল, তন্মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র এবং সর্বমধ্যে শিবস্থানে পরমশিব অবস্থিত।

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

কে জানে শ্যামা তুমি কেমন।*
তুমি কখন হাসাও, কখন কাঁদাও,
যেরূপ রাখ মা যখন॥
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আপন।
তুমি রাখ মার দুদিক পার,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
কারু দেও ইন্দ্রত্বপদ মা,
কারু কর দুঃখের ভাজন।

---

* এই পদের অংশবিশেষের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ ত্রিপুরার দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর সংগ্রহেও পাওয়া যায়।

কারু স্বর্ণ অলঙ্কার সাজাও,
কারু হরণ কর জীর্ণ বসন ॥
দুঃখের কথা বলবো কারে,
মায়েপুতে ব্যবহার যেমন।
আমি সে সব ছেড়ে আছি পড়ে,
ভেবে দুটি অভয় চরণ ॥
প্রসাদ বলে হতো যদি মা,
আর কিছুতে শমন দমন।
এমন হতভাগা কে আছে যে,
তায় করিত এখন তখন ॥ ১১৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই।
থাক্‌লে আসি দেখা দিত, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥
শ্মশানে মশানে কত, পীঠ স্থান ছিল যত।
খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, মিছে কেন যন্ত্রণা পাই ॥
বিমাতার[১] তীরে গিয়ে, কুশপুত্তল দাহাইয়ে[২]।
অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে, মায়ের জন্যে ভাবনা কেনে।
মা গেছে নাম ব্রহ্ম আছে, তরিবার আর ভাবনা নাই ॥ ১১৫ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস।
দনুজদলনা ললনা, সমরে শবে, বিগলিত কেশ ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সময় বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
রঙ্গিণীবর সঙ্গিনী, নগনা সমান বেশ ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটীদেশ ॥
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥ ১১৬ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।

১। বিমাতা—গঙ্গা। ২। দাহাইয়ে—দাহ করিয়া।

তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন ॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাসে লোক হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধর্ব্বে শশী হয়ে বামন ॥ ১১৭ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব ॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কত শত, গয়া গঙ্গা দেখতে পাব ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে নিদানকালে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব ॥ ১১৮ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রল ॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছল।
ওমা! মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেল ॥
মা খেলবে বলে খেলালে মাগো, আশা না পূরিল ॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হল।
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চল ॥ ১১৯ ॥

(প্রসাদী সুর , তাল—একতালা)

কেবা বুকের কেবা পিঠের, বল দেখি মা তাই শুনি।
কেহ সারা দিনে পায় না খেতে, কেহ দুধে খায় সাঁচা চিনি ॥
কেহ শুয়ে তেতালাতে, পালঙ্গে মশারি টানি।
আমরা মরি শুড় শুড়য়ে, ভাঙ্গা ঘরে নাইক ছা'নি ॥
কেহ পরে শাল দোশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া ছালা।
অনুভবে বুঝি তারা, তেলা মাথায় তেল ঢালনি ॥ ১২০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কেমন করে ছাড়ায়ে যাবা;
(দেখবো এবার, অধম বলে)।
ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ॥
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা।

বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা ॥
প্রসাদ বলে ফাঁকিজুঁকি, (মাগো) দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা ॥ ১২১ ॥

(রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—একতালা)

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম রূপসী,
বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী।
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয় বাম করে মুণ্ড অসি ॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেক আকাশে উঠে,
গিলে রথরথী গজবাজী রাশি রাশি ॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার,
চৈতন্যরূপিনী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী ॥ ১২২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কে রে বামা কার কামিনী।
বসে কমলে ঐ একাকিনী ॥
বামা হাসিছে বদনে, নয়ন কোণে, নির্গত হয় সৌদামিনী ॥
এ জনমে এমন কন্যে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, যোড়শী নবযৌবনী ॥ ১২৩ ॥

(রাগিণী—ইমনকল্যাণ, তাল—একতালা)

কে রে কাল কামিনী, বাস পরিহারিণী।
চরণ তরুণ অরুণ নিকর, নখর নিভাতী নিন্দি নিশাকর।
উরু তরু রম্ভা নাভি সরোবর নৃকর কটিতে কিঙ্কিনী ;
পীযুষ পূর্ণিত পীন পয়োধর, পানে পুলকিত সুরাসুর নর।
করে শোভে অসি মুণ্ড বরাভয়, বামা নরমুণ্ডমালিনী ॥
তড়িত জিনি হাস্য কমলবদন, খঞ্জন গঞ্জিনী যুগল নয়ন।
ইন্দু শিশু সব সুশোভিত কর্ণে, বামা আধ শশী ভালিনী ॥

আহা কিবা কান্তি এলোকুন্তলে, কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে।
বামা গঙ্গাধর হৃদি জাল, শোভে যেন নীল নলিনী ॥ ১২৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

কে রে রজনী-রূপিণী রণ করে।
ঘোর চিকুর অন্ধকার আলু থালু দেখে মরি মা ডরে ॥
যত দেবগণ ধরেছে তাল, নাচিছে বামা সমরে বিশাল।
বব্‌ম বব্‌ম বাজিছে গাল, নর-শির হার কণ্ঠে দোলে ॥
রামপ্রসাদ বলে কেন হে ভূপ, ঐ দেখ মায়ের অপরূপ রূপ।
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র রূপিণী, যোড়শীকে স্তুতি করে অমরে ॥ ১২৫ ॥

(রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—ঝিঁঝিট)

কে হরহৃদি বিহরে।
তনুরুচি রুচি সজল ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে ॥
নীল কমলদল শ্রীমুখ মণ্ডল, শ্রমজল গলে শরীরে।
মরকত মুকুরে মঞ্জু মুকুতা ফল, রচিত কিবা শোভা মরি রে ॥
গলিত চিকুর ঘটা নব জলধরছটা, ঝাঁপাল দশদিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর কমঠ ভুজবর, কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে ॥
ঘোর বিষয়ে মজি কালীপদ না ভজি সুধা ত্যজি বিষপান করি রে
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন দৈববিড়ম্বন, বিফলে মানব দেহ ধরি রে ॥ ১২৬ ॥

(রাগিণী—সুরাট, তাল—কাওয়ালি)

গেল না গেল না দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না ;
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী[1] হলো কাল ॥
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তায় দেয় নানা দুঃখ,
মাসীর মায়া জালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস।
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস ॥
পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হ'ল কালা।
তোলা দুধে ছেলে, বাঁচে কত কাল ॥ ১২৭ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ঘর সামলা বিষম লেঠা।
ঘরের কর্ত্তা সে যে নয়কো আঁটা ॥

১। মাসী—অবিদ্যা

যার ইচ্ছে সেই তা করে,
আপনা আপনি দেখে ঘোটা।
এ ঘর নয় ঘোরে পুড়ে,
কর্‌লে আমায় লাটাপাটা॥
ঘরের গিন্নি পড়ে ঘুমায়,
দিবারাত্রে নাইকো উঠা।
সে মাগী কি সাধে ঘুমায়,
মিন্সের সঙ্গে আছে ঘোটা॥
প্রসাদ বলে না নড়ালে,
সে ঘুমেতে জাগায় কেটা।
মাগী একবার জাগলে পরে,
ত্রাসে সবাই হবে কাঁটা॥ ১২৮॥

(রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—তিওট)

চিক্কণ কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে।
অরুণ কমল দল, বিকল চরণ তল, হিমাকর নিকর রাজিত নখরে॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে।
ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা, কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরষিত শর খর, কত কত শত শত শত রে॥
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবি ভাবি নয়ন ঝরে।
ও-পদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু, মামক[১] মানস আশ ধরে॥১২৯॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি।
নামে জগচ্চিন্তা-হরা মা, ব্যাভারে কি তেমন দেখি॥
প্রভাতে দাও অর্থ চিন্তা, মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তা।
সায়াহ্নে দাও অলস চিন্তা, বল মা তোরে কখন ডাকি॥
দিয়াছ এক মায়া চিন্তে, ওমা সদাই করি তাই চিন্তে।
না পারিলাম তোমার চিন্তে, মা চিন্তাকূপে ডুবে থাকি॥
ওমা তুই গো পাষাণের মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে।
রইলি গো পাষাণী হয়ে, রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাঁকি॥১৩০॥

১। মামক—মদীয়, আমার।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ছি ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জাননা, মাননা, শুননা কথা॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কর শোভা।
যদি দুই সতীনে পীরিত হয়, তবে শ্যামা মা'রে পাবা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান, করিলে কৈবল্য পাবা॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে মায়াসূত্র, ভেদসূত্র, তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা॥
আত্মারামের অন্নভোগ, দুটো সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে ব্রহ্ম রসে মিশাইবা॥১৩১॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে, বিষয় বিষে হলি রাজি॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীতি পাঁজি॥
অহঙ্কার মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেকবে যখন শিখবে তখন, কর্ব্বে কালে পাপোস বাজি॥
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা, ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।
পড়ে চেরের কোঠায় মন টুটায়, যে ভজে সে মত্ত গাঁজি॥
কুতুহলে প্রসাদ বলে, জরা এলে আস্‌বে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজি॥১৩২॥

(রাগিণী—গৌরী, তাল—একতালা।

জগতজননী তরাও ওগো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগৎ ছাড়া গো তারা॥
দিবা অবসানে রজনীকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে।
মম জীর্ণ তরী আছে কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা।
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা, মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া।
কোথা গিয়েছিলে, একর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা॥১৩৩॥

শব সাধনা

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল ॥
ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পার্শ্ব শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটা জাল ॥
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল ॥
যে জন সাধক বটে, তারে কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করাল বদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল ॥ ১৩৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

জননী তাই ভাবছি বসি।
শমন বারে বারে করে আমায় দোষী ॥
আবাদ করি যেমন করে,
বল দেখি মা মুক্তকেশী।
ওমা, ছজন পেয়াদা করে কায়দা,
মসীল[১] আছে দিবানিশি ॥
প্রসাদ বলে ধন্য ধন্য পুণ্যহীনের জন্য কাশী।
ঘুমাই দুরন্ত এই ভ্রান্ত জ্বালা,
দে মা স্থান বারাণসী ॥ ১৩৫ ॥

(রাগিণী—মূলতানী, তাল—একতালা)

জননী পদ পঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে, কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপনতনয় ভয় চয় বারিণী ॥

১। মসীল—অত্যাচার, উৎপীড়ন।

প্রণব রূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা, ভব পারাবার তরণী।
সগুণা নির্গুণা, স্থূলা, সূক্ষ্মা মূলা, হীন মূলা,
মূলাধার অমল কমল কমল বাসিনী ॥
আগম নিগমাতীতা অখিলমাতা, পুরুষপ্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে[1] সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা কারিণী ॥
সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্যধাম, অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার, বিষফল জানি ॥ ১৩৬ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)
জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে বল্‌বে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল ॥
কালীনামের খড়্গ তুলে, মায়া মোহ কেটে ফেল।
করে মিছে মায়ায় টানাটানি, রামপ্রসাদের প্রমাদ হল ॥ ১৩৭ ॥

(রাগিণী—ঝংলা, তাল—একতালা)
জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেওনারে ভোলা মন, ঘুমেতে হারাবে ধন ॥
নব দ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে, হইব যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সিঁধ, হরে লবে সব রতন ॥১৩৮॥

(রাগিণী—খটভৈরবী, তাল—পোস্তা)
জানিগো জানিগো তারা, তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত কারু গেঁটে সোনা ॥
কেহ যায় মা পাল্‌কি চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা ॥ ১৩৯ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)
জানি না মা কি বলে ডাকি তোরে (শ্যামা মা)
কখন শঙ্কর বামে, কভু হর হৃদিপরে,
কখন বিশ্বরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী।
কভু শ্যাম মোহিনী,
কভু রাধার পায়ে ধরে।

১। হংসরূপে—পরমাত্মারূপে। হংস হল তন্ত্রমতে অজপা বর্ণ। এই মন্ত্র জপ কালে নিঃশ্বাসের সময় 'হং' শব্দ করে বায়ু বহির্গত হয় এবং 'সঃ' শব্দ করে পুনরায় শরীরে প্রবেশ করে। জীবে এই মন্ত্র নিরন্তর জপ করে।

কখন বিশ্ব জননী, পঞ্চভূত নিবাসিনী,
কভু কুলকুণ্ডলিনী
চতুর্দ্দল বিম্বোপরে।
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি মা বলে মা মা,
ঐ অভয় চরণ পাবার তরে ॥ ১৪০ ॥

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে ॥
আরজবেগী[১] আর শিবে, সে দরবারে ভাস্ত কিবে।
দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথায় রে ॥
লাখ উকিল করেছি খাড়া[২], সাধ্য কি মা ইহার বাড়া।
তোমার তারা ডাকে আমি ডাকি, কাণ নাই বুঝি মার রে ॥
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হয়েছ কালী।
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী করিল আমার রে ॥ ১৪১ ॥

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
(ভবে আমার কি হইবে গো মা) ॥
অগম্য জলেতে মীনের শ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়।
ও সে যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে ॥
পালাবার পথ নাইকো জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে ॥
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে ॥ ১৪২ ॥

(রাগিণী—ভৈরবী, তাল—একতালা)
(মতান্তরে ঝিঁঝিট খাম্বাজ আড়ঠেকা)

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজী।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতেই তুমি হও মা রাজী ॥
মগে বলে, 'ফরাতারা' 'গড্' বলে ফিরিঙ্গী যারা মা।
'খোদা' বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী ॥
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা।
গৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকা জী ॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা।
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি ॥

১। আরজবেগী—বিচারকের নিকট যে আবেদন পত্র দেয়। ২। লাখ উকিল করেছি খাড়া—কবির এই মন্তব্য থেকে অনেকে তাঁকে লক্ষ কবিতার রচয়িতা বলে অনুমান করেন।

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালী জেনো এ সব জনে।
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজী ॥ [১] ॥ ১৪৩ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ডাকরে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুল না মন সময় কালে ॥
এসব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ ॥
ওরে ওপদ পঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে ॥
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে।
ওরে পারবে মা এড়াইয়ে যেতে, কাল ফাঁসি লাগবে গলে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালের বশে কাজ হারালে।
ওরে এখন যদি না ভজিলে, আম্‌সী খাবে আম ফুরালে ॥ ১৪৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্য এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবের যুক্তি মতন নিলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হল্‌দি গায় মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে ॥ ১৪৫ ॥

(রাগিণী—খাম্বাজ,তাল—ঢিমা তেতালা)

ঢল ঢল জলদ বরণী এ কার রমণীরে।
নিরখ হে ভূপ ঈশ [২] শবরূপ, উরসী রাজে চরণ ॥
নখরাজী উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ।
একি! চতুরানন হরি কলয়তি [৩] শঙ্করী, সম্বরণ কর রণ ॥
মগনা রণ মদে, সচলা ধরা পদে, চরণে অচল চালন।
ফণীরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত, প্রলয়ের এই কি কারণ ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে, চিত্তমে মত্ত বারণ।
সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে, কদাচ না মানে বারণ ॥ ১৪৬ ॥

১। পদটি সম্ভবত রামপ্রসাদের রচনা নয়। এটি রামদুলাল নন্দীর ভণিতাতেও পাওয়া যায়।
২। ঈশ—মহাদেব। ৩। কলয়তি—বলিতেছেন।

(রাগিণী—রামকেলী, তাল—আড়া)

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব-দলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে ॥
কেরে কালীর শরীরে রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে
কিংশুক ভাসে।
কেরে নীল কমল শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥
কেরে নীলকান্তমণি নিতান্ত, নখরনিকর তিমির নাশে।
কেরে রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে।
দীতিসুতচয় সবার হৃদয়, থর থর থর কাঁপে হুতাশে।
মাগো, কোপ কর দূর চল নিজ পুর, নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে ॥ ১৪৭ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

তাই কাল রূপ ভালবাসি।
জগন্মোহিনী মা এলোকেশী ॥
কালর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেব ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালরূপ তার হৃদয়বাসী ॥
কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি ॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর, বিরাজে পূর্ণিমা শশী ॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক, মন করো না দ্বেষাদ্বেষী ॥ ১৪৮ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

তাই ডাকি শ্রীদুর্গা বলে।
আছে চরণ-তরী ভবের কূলে ॥
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধ মা, মন্ত্রে মন্ত্রী বিশ্বমূলে।
এবার ভবে এসে কর্ম্মদোষে রয়েছি মা স্থূলে ভুলে ॥
ত্রিধারা যাঁর শিরে ধরা, সে পড়ে তোর পদতলে।
রামপ্রসাদ বলে অন্তিমকালে, দেখা দিও মা অন্তর্জলে ॥ ১৪৯ ॥

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

তাই কালোরূপ ভালোবাসি।
করে শমন দমন ধ'রে অসি ॥
দলবল আট রমণী, তারা সব এক বয়েসী।
তার মাঝে মাঝে থাকেন যেমন, তারাগণ মধ্যে শশী ॥

পদতলে ত্রিপুরারি পড়ে আছেন দিবানিশি।
শ্যামা ব্রহ্মময়ী, রণজয়ী, উমামুখে মৃদু হাসি ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মা আদি, ধ্যানে না পায় যোগী ঋষি।
আমি মুদে আঁখি, হৃদে দেখি, মা মোর বামা এলোকেশী ॥১৫০॥

তার মা তারা এ সঙ্কটে।
পেঁচে পড়েছি এসে ভবের হাটে ॥
বেচা কেনা ফুরাইল মা
সন্ধ্যে হলে এলাম ঘাটে।
এখন ভাবছি বসে নদীর তীরে
তপনও বসিল পাটে ॥
মায়া-নদীর বিষম বেগ মা,
তারা রয়েছে মোহান ছুটে!
মা তোর আসান পেলে ভাসান দিয়ে
পার হয়ে যাই সাঁতার কেটে ॥
শিবের কথা অন্যথা নয়
দিয়েছ শিব জটে রটে।
সে শিব মিথ্যাবাদী হবে যদি
তবে রামপ্রসাদের বিপদ ঘটে ॥১৫১॥

(প্রসাদীসুর—একতালা)

তারা বলে হব সারা।
এবার দেখবো বাদী ছজন যারা ॥
হৃদকমলোপরে দোলে,
শব শিবে আলো করা।
তারা নামের মর্ম্ম পরম ব্রহ্ম,
সুধারসে বদন ভরা ॥১৫২॥
(অসম্পূর্ণ)

(রাগিণী—বিভাস, তাল—ঝাপ)

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল চোর।
কালী নামের অসি ধরা, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করিতে পারে জোর ॥
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা শোর।
ওরে, শ্রীদুর্গা বলিয়া রজনী কর ভোর ॥
কালী যদি না তরাবে কালে মহাঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর ॥১৫৩॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হ্যাদে গো জননী শিবে॥
তুমি লবে লবে বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে॥
থাক থাক যায় যাক্, এ প্রাণ যায় যাবে ।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো, কাজ কি আমার ভবে॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর, কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি, তুফানে ডরাবে॥
আপনি যদি আপন তরী, ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব, তবু অভয় পদে ডুবে॥
গিয়েছি না যেতে যাছি, আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে।
প্রসাদ বলে আমি গেলে, তুমি তো মা রবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে॥১৫৪॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় রে চল বেয়ে।
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরা দেরে কেটে॥
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া বেড়ী কেটে॥১৫৫॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেম্নি সুখ কি পাছে।
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি।
মাগো ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে[১]॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই।
মাগো ওমা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড়।
মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে[২]॥১৫৬॥

১। পুরুষের দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন, শুভ লক্ষণ সূচক। ২। পদটি কবির তিরোধানের ঠিক পূর্ব্বে রচিত বলে কথিত আছে।

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা সেটাও নিত্য নয়॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা, তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনি তো দেখায়॥
যে জন গৃহ স্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়।
ওমা, তুমিতো অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয়॥
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরু তলে রয়।
ওমা, তার তনয়ের ভিটেয় টেঁকা, এ বড় সংশয়॥
প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে, ভাই বন্ধু থেকো না রামপ্রসাদের আশায়॥১৫৭॥

(রাগিণী—ললিত খাম্বাজ, তাল—একতালা)

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, বদন ভরে মাকে ডাকিরে।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কিনা এসেন দেখিরে॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কিরে।
তবে তারা নামের কবচমালা, বৃথা আমি গলায় রাখিরে॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা।
আমি কখন নাতান[১] কখন সাতান[২] বাকীর দায়ে না ঠেকিরে॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন[৩] না পেল তত্ত্ব, আমি অন্ত পাব কিরে॥১৫৮॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

তুই যারে কি করবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি॥
এমনি করেছি কায়দা, পালাইলে নাইকো ফায়দা।
হামেশ[৪] রুজ্জু ভক্তি প্যায়াদা, দুনয়ন দ্বারয়ান দিয়েছি॥
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক্ করেছি।
তাই সর্ব্বজ্বর হর-লৌহ, গুরুতত্ত্ব পান করেছি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে, যাত্রা করে বসে আছি॥ ১৫৯॥

১। নাতান—দরিদ্র। ২। সাতান—ধনশালী। ৩। ত্রিলোচন—মহাদেব (তাঁহার তিনটি নয়ন)।
৪। হামেশ—সর্বদা।

(রাগিণী—সোহিনীবাহার, তাল—একতালা)

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর
হোক দিলে দিলে বাজী
তাতেও আছি রাজি, এবার এবাজী ভোর গো ॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলো না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো ॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥
এমা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, কি কাজ তোর কঠোর।
আমার একুল ওকুল, দুকুল গেল, সুধা না পেলে চকোর গো ॥
এমা, আমি টানি কুলে মন প্রতিকূলে, দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে দুটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥১৬০॥

(রাগিণী—জয়জয়ন্তী, তাল—একতালা)

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখি।
আমারি অন্তরে থেকে, আমারে দিতেছ ফাঁকি ॥
কালী নাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে।
মন, ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি সুখে হইলে সুখী ॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম মন।
ও তোর, জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বলরে দেখি ॥১৬১॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

তোমার কে মা বুঝবে লীলে।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে ॥
তুমি দিয়ে নিচ্চো তুমি, বাছা রাখনা সাঁঝ সকালে।
তোমার অসীম কার্য্য অনিবার্য্য, মাপাও যেমন যার কপালে ॥
তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দী ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে ॥
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, জলেই তুমি ভাসাও শিলে ॥
তোমার জারি জুরি আমার কাছে, খাটবে না মা কোন কালে।
ওসব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে ॥ ১৬২ ॥

(রাগিণী—খটভৈরবী, তাল—একতালা)

তোমার সাথে কেরে, ও মন।
তুমি কার আশায় বসেছ, রে মন ॥
তনুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে।
যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে, বেয়ে চলে যারে ॥
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সোজা হয়ে চল রে।
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁৎ, যোগে লেগেছে রে ॥ ১৬৩॥

(রাগিণী—বসন্তবাহার, তাল—একতালা)

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন।
বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রাভঙ্গ ॥
অন্ধ স্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে।
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে।
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা তোমাতে জন্মিল সেটা।
অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ১৬৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে ॥ ১৬৫ ॥

(রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—একতালা)

দিবানিশি ভাবরে মন, অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা ॥
মূলাধারে সহস্রারে, বিহরে সে মন জাননা।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে, আনন্দ রসে মগনা ॥
আনন্দ আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখনা ॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পুরাইতে [illegible]
সাকারে সাযুজ্য হবে, [illegible]

দিস্ মা কালী ফলার খেতে।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ মেলে যাতে ॥
ধর্মলাভ হয় নিমন্ত্রণে, বুঝে দেখ মনে মনে,
অর্থলাভ তার পরক্ষণে, দক্ষিণাটি হলে হাতে।
কাম মোক্ষ নাই গো করে,
যখন এসে ঘুমাই ঘরে,
রামপ্রসাদ বলে ফলার পেলে,
ভয় থাকে না সংসারেতে ॥ ১৬৭ ॥

দিন তো থাকবে না গো মা কেবল কথা রবে।
কথা রবে কথা রবে গো জগতে কলঙ্ক রবে ॥
ভাল কিবা মন্দ কালী অবশ্য একা দাড়া হবে।
সাগর যার বিছানা মা শিশিরে তার কি করিবে ॥
দুঃখে দুঃখে জর জর আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গা নাম শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে ॥ ১৬৮ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ, তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে ॥
এ ঘাটে তরণী নাইক, কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গানামে কলঙ্ক রবে, মা নইলে খালাস কর তবে ॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন, পিতৃধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে, শরণ নিবার কাজ কি তবে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, মোর ক্ষতি কিছু না হবে। মা তোর
কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম, জগজ্জনে আর নাহি লবে ॥ ১৬৯ ॥

(প্রসাদী সুর তাল—একতালা)

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা[১] ॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাজের ধারা।
ওমা পাঁচের[২] আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা ॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিতে, সার হলো গো দুঃখের ভরা ॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যেজন, স্থির নহে মন, দুজনেতে কল্লে সারা ॥ ১৭০ ॥

১। পরাৎপরা—পরমেশ্বরী (যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ)। ২। পাঁচের—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের।

দুখ কই গো পাষাণের মায়া মনের দুখ তোমারে কই
দারুণ পেটের জ্বালায় পরের বোঝা মাথায় করে বই।
.... কোন কোন দিন উপবাসী রই
আমরা কি তোমার পাকা ধানে দিয়েছিলাম মই।
কারে দিলে রাজ-দেয়ানি তার সুখের (সীমা) নাই
তারা কি তোমার বাপের ঠাকুর আমরা কি কেউ নই।
পুত্র সুপুত্র আমি যে হই সে হই
জন্মাবধি মোর (কপালে) লিখ নাই দুখ বই।
প্রসাদ বলে গুরুর বচন শুন ব্রহ্মময়ী
এ ভবেতে কবার এলাম কবার গেলাম এই তোরে * ॥ ১৭১ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

দুটো দুঃখের কথা কই।
দুঃখের কথা কই গো তারা মনের কথা কই।
কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী ॥
কারেও দিলে ধন জন মা হয়[১] হস্তীরথী জয়ী।
আর কারো ভাগ্যে মজুরখাটা শাকে অন্ন মিলে কই ॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমার ইচ্ছা তেম্নি রই।
ওমা, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি কেউ নই ॥
কারো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই।
আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালী ধানে ভরা খই ॥
কেউবা বেড়ায় পালকী চড়ে আমি বোঝা বই।
মাগো আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়াছি গো মই ॥
প্রসাদ বলে তোমায় ভুলে আমি জ্বালা সই।
ওমা, আমার ইচ্ছা অভয়পদে চরণ ধূলা হই ॥ ১৭২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

দূর হয়ে যা যমের ভটা[২]।
ওরে, আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা ॥
বল্‌গে যা তোর যম রাজারে, আমার মতন নেছে কটা।
আমি যমের যম হতে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা ॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সাম্‌লায়ে বলিস বেটা।
কালী নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা ॥ ১৭৩ ॥

* পরিচিত পদের পাঠান্তর। [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, অপরার্ধ (দ্বি. সং) ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৪৯৪]।
১। হয়—অশ্ব। ২। ভটা—চর, দূত।

(রাগিণী—বিভাস, তাল—তিওট)

নব নীল নীরদ তনু রুচি কে, ঐ মনোমোহিনী রে ॥
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ।
কোটী চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখ মণ্ডল, নিন্দি সুধামৃত ভাষ ॥
অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি, গলিত কুন্তল পাশ।
গলে সুন্দর বরণ, সুহার লম্বিত, সতত জঘনে নিবাস ॥
বামার বাম করপর, খড়্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস ॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষচয়ে কর নাশ।
তব নামি বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভবে এ কথা আভাষ ॥ ১৭৪ ॥

(রাগিণী—ললিত, তাল—রূপক)

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুর ঘটা, গমনে বরটা[1], বিবসনা শবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা, ললাটে বালার্ক বিধু,
শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু, মনোজ্ঞা মধুরমুখী, মধুর লালসা ॥
সোমমৌলি[2] প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্ম্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা[3] হরিহর ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বসা ॥ ১৭৫ ॥

(রাগিণী—মূলতানী,তাল—একতালা)

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে।
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো ॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়।
ওমা, তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো ॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে।
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥ ১৭৬ ॥

১। বরটা—রাজহংসী। ২। সোমমৌলি—শিব (যাঁহার কপালে চন্দ্র)।
৩। হরিমধ্যা—সিংহের ন্যায় ক্ষীণ কটিযুক্তা।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি নারে মনের ঠেঁটা ॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোটা।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, মন কোথা রবে খুড়া জেঠা ॥
মরণ সময় দিবে তোমায়, ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চেঠা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে, আছে রে যে জাবদা আটা ॥
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়বে সংসারের লেঠা ॥ ১৭৭ ॥

(ভৈরবী)

ন্যাংটা মেয়ে কালী।
দোষ করিলে রোষ করে না তারেই ত মা বলি ॥
আপন মায়ে যেমন করে যতন জানত সকলি।
পাগলের মন যখন যেমন তখনই যায় ভুলি ॥
ডাকিনী যোগিনী কত ভূতের হুলাহুলি।
যত দেবের প্রধান বিষ্ণু ঈশান তারাও কৃতাঞ্জলি ॥
প্রসাদ বলে নির্জ্জালে যদি যাবি চলে।
সকল ছেড়ে হৃদ্‌মাঝারে ভাব রে মুণ্ডমালী ॥ ১৭৮ ॥

(ভৈরবী—যৎ)

নেংটা মেয়ের এত আদর
জটে বেটাই ত বাড়ালে।
নইলে কেন ডাকতে হবে
দিবানিশি মা মা বলে ॥
শ্রীরাম জগতের গুরু জটে বেটা তার গুরু।
আপনি বেটা বুঝলে না কে
রইলো শ্যামার চরণ তলে ॥ ১৭৯ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

পতিতপাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নাম সারা ॥
ঐ যে তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা।
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল।
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা।
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য কারণ তোমার নাই।
ওয়ায় সর ত্তর রয়, সেইরূপ বর্ণপারা ॥

দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা।
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥
পাগল বেটার কথায় মজে, এতকাল মলেম ভজে।
দিয়াছি গোলামি খৎ, এখন কি আর আছে চারা ॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ।
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা
বসতি ষোড়শদলে, ব্যক্ত হবে ভূমণ্ডলে।
প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা ॥ ১৮০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

পতিত পাবনী পরা
পরামৃত ফলদায়িনী ॥
স্বদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া।
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তারকারিণী ॥
কৃত পাপ হীন পুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য।
তারারূপে তারয় মাং নিখিল জননী ॥
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণী তব।
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিণী ॥ ১৮১ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

পূর্‌লনাকো মনের আশা।
মনের দুঃখ রৈল মনে ॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালাম, সুখের আর কিবা ভরসা।
আমি বলব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাইনা দিশা।
অভয় পদে শরণ নিয়ে, ঘট্‌ল আমার উল্‌টে দশা ॥ ১৮২ ॥

পিতৃধনের আশা মিছে।
পিতার দলীলদস্ত ধন সমস্ত
আগে বেনামী করেছে ॥
সে সকল ধন কুবেরকে দিয়ে,
নিজে ক্ষেপা সেজে বসে আছে।
আশা ছিল মাতৃপদ, পিতা তাও দখল করেছে,
কেউ লবে বলে যত্ন করে
আগেতে বুকে রেখেছে ॥
পিতা ম'লে পুত্রে পায় ধন,

সর্বশাস্ত্রে এই লিখেছে।
কিন্তু সে নয় মরবার পিতা
মৃত্যুকে জয় করেছে ॥ ১৮৩ ॥
(অসম্পূর্ণ)

ফাঁকি দিবে কি আমারে, ওমা ভেবেছে কি তুমি ?
আমি সিদ্ধ-সেবায় বদ্ধ আছি, অসিদ্ধ কে করে ?
জান ভাল সারতে পরে, না জান মা আপ্ত সারে।
আমি মূল ধ'রে টান দিব যখন, থাকবে কেমন করে ?
ঐ পদে জোর ক'রে ফিরি, থাকি জোরে জোরে।
জানি মুক্ত হওয়া সহজ কথা, আর কি দিবে মোরে।
প্রসাদ বলে, হৃদ্-কমলে বেঁধেছি তোমারে।
তুমি ছাড়াও দেখি, পার কেমন রামপ্রসাদের গিরে ॥ ১৮৪ ॥

(খাম্বাজ—খেম্‌টা)

বব বম্ বম্ ভোলা।
মাগী যেমন, মিন্সে তেমন
তেম্নি দুটি চেলা ॥
আরোহণ বৃষোপরে,
শিঙ্গে ডমরু করে,
মুখে বলে হরে রুদ্রাক্ষমালা।
জটাতে কুল কুল ধ্বনি,
বিরাজিতা স্বরধুনী,
মস্তকেতে মণি-ফণী অর্দ্ধ চন্দ্র ভালা ॥১৮৫॥
(অসম্পূর্ণ)

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

বাঁচিতে সাধ আর নাই মা তারা।
আমি 'তারা তারা তারা' বলে ধনে প্রাণে হলেম সারা ॥
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী ত্রিজগদুদরে ধরা।
ওমা আমি কি তোর ধর্ম্মছেলে, আকাশ ফোঁড়া মোফৎ খোরা ॥
যদি বল দোষী পুত্র, দোষাদোষের তুমি সূত্র।
আমি উপলক্ষ মাত্র, মায়াপাশে আছি ঘেরা।
নামে কালের ভয় থাকে না, শিবের বচন আছে ধরা ॥
এমন কালগুণে সে কালের কথা, ভুলে হলি ভয়ঙ্করা ॥
প্রসাদ বলে তোমার লীলা (মা), সাধ্য কিষে বুঝতে পারা।
ঐ যে রাখা মারা স্বভাব তোমার,কেবল আমায় কল্লে জীয়ন্তে মরা ॥১৮৬॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

বল মন মলে কোথায় যাবি।
আমার মনের সঙ্গে মন মেলেনা তাইতে
আকাশ-পাতাল ভাবি ॥
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মন,
কতইবার আসবি যাবি।
এবার আসা যাওয়ায় ক্ষান্ত হয়ে
কবে ভবে মরতে পাবি ॥
পড়ে শুনে বিদ্যারত্ন, ভিক্ষারত্ন উপজীবী।
তোমার জ্ঞানরত্নে যে অযত্ন, নিত্যরত্ন কিসে পাবি ॥
কালীপদ সুধাহ্রদে সুধাপানে শুদ্ধ হবি।
রামপ্রসাদ বলে মৃত্যুকালে, মুক্তি-পদে মিশাইবি ॥১৮৭॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

বলগো মা উপায় কি করি।
আমি এবার বুঝি প্রাণে মরি ॥
পতিত জমি দিয়ে আমায় মা, রাখলে আমায় পতিত করি।
জমি আবাদ করতে গেলে হয় মা, ভূতের সঙ্গে মারামারি ॥
মহামন্ত্র বীজ করি মা যদি জমি আবাদ করি।
রিপু ছ'জন জুটে, খায় মা লুটে, হয় না তাহে চারাচুরি ॥
মন আখেরী হলেগো মা, শমন করবে শমন জারি।
জমি নাইকো হাসিল, করলে তশিল, কিসে হবে মালগুজারি ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মা এই নিবেদন তোমায় করি।
আমার মৃত্যুকালে চরণতলে স্থান দিও মা শঙ্করী ॥১৮৮॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

বড়াই কর কিসে গো মা।
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে ॥
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, থাক ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা তুমি কোন্ পুরুষে ॥
মাগী মিন্সে ঝগড়া করে, রৈতে নার আপন বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে ফিরে দেশে দেশে ॥
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, কেবল তোমার বাপের দোষে।
মাগো, আমার বাপের নাম লইলে, বিরাজ করে কৈলাসে ॥ ১৮৯ ॥

(রাগিণী—পিলু বাহার, তাল—জৎ)

বল ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল (গ্রহণে কালীর নাম)।
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল ॥

একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়।
কালী নামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল ঢল ঢল ॥
কালী ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি।
শিব শিরে গঙ্গা তারি, প্রবাহ নির্ম্মল ॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু।
গঙ্গা যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল ॥
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই।
বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল ॥ ১৯০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি।
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে ॥
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে ॥
এক ঘরেতে বাস করেছি, পঞ্চ জনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে ॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥১৯১॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বলে, চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানা রঙ্গে, দূর করিব মনের ব্যথা ॥
তুমি গো পাষাণের সুতা, আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে, গুরু তত্ত্ব রাখ গাঁথা ॥১৯২॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা ॥
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা সেথা ॥
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা। ওমা যেজন
তোমার নাম করে, তার হাড় মালা আর ঝুলি কাঁথা ॥১৯৩॥

(রাগিণী—ললিত, তাল—আড়খেমটা)

বসন পর মা বসন পর তুমি।
রাঙ্গা চন্দনে মাখিয়া জবা, পদে দিব মা আমি ॥
খড়্গ হস্তে, রুধির ধারা, এ মা মুণ্ডমালা গলে।
একবার হেঁট নয়নে চেয়ে দেখ, মা পতি পদতলে, গো মা ॥
সবে বলে পাগল পাগল, ওমা আরও পাগল আছে।
রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে ॥১৯৪॥

(রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—ধিমা তেতালা)

বামা ওকে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে ॥
কি সুখে হাসিছে লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর সমরে মগনা হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা আবেশে ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া, ধর রে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারী রে চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে ছিন্নবেশে ॥
কারে আর ভজরে, ও পদে মজরে,
রূপে আলো করেছে দিগ দেশে।
কি করি রণে রে, হয়েছে মনে রে,
প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে ॥১৯৫॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

বাজ্‌বে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিস্‌নে ক্ষেপা মাগি।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছেন মহাযোগী ॥
যে দেখি তোর চরণের জোর, নাচতে শিবের ভাঙ্গবে পাঁজর।
বিষ খেকো নয়গো সজোর, তোর লেগে ওর মন বিবাগী।
খেয়ে গরল হয় নাই মরণ, শিব ছল করে মুঁদেছেন নয়ন।
ফাঁকির মরণ কর্‌ছেন সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি ॥
ভাঙ্গ খেয়ে ভাঙ্গরের মতি, শিব হয়েআছেন শবাকৃতি,
দীন রামপ্রসাদ কয় এই মিনতি,
নেবে নাচ মা শিব সোহাগী[১] ॥১৯৬॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

বাসনাতে দাও আগুণ জ্বেলে স্বভাব হবে পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই মনের ময়লা ফেল কাটি ॥
কালীদহের কূলে চল, সে জলে ধোপ ধর্ব্বে ভাল।
পাপ কাষ্ঠের আগুণ জ্বাল, চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি[২] ॥১৯৭॥

১। এই পদের পাঠান্তর ৭২ নং পদ। সে পদটির ভনিতায় শুধু 'প্রসাদ' পাওয়া যায়।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবে না জননীর জঠরে॥
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদ শাস্ত্রে নাইক সীমা।
তারার মহিমা আপনি মাত্র, জেনেছেন শিব শঙ্করে॥
আমার মায়ের নামে গান করে, কত পাপী গেল তরে।
কৈলাস গিরি দিব্য পুরী, দেখাও এবার মা আমারে॥১৯৮॥

(রাগিণী—পিলুবাহার, তাল—জৎ)

ভবে এসে খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি[১] পলো॥
পো-বার[২] আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচে-বার[৩] পেয়ে মাগো, পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো॥
ছ দুই আট ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হইল॥
হদ্দ হলো চোদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায়না যাওয়া।
রামপ্রসাদের বুদ্ধি দোষে, পেকেও ফিরে কেঁচে এলো॥১৯৯॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কেন কালরূপ হল॥
কাল রূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কাল।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পরে, হৃদয়পদ্ম করে আলো॥
রূপে কালী নামে কালী, কাল হইতে অধিক কাল।
ওরূপ যে দেখেছে সে মজেছে, অন্যরূপ লাগে না ভাল॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখিলাম শুনে কাণে, মন গিয়া তায় লিপ্ত হল॥ ২০০॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা॥

১। পঞ্জুড়ি—পাঁচ বা বে-পরতা চাল। ২। পো-বার বা ১+৫+৬=১২ পড়বে খেলা আরম্ভ হবে।
৩। কচে-বার—অর্থাৎ পোয়াবার। পাশার চালের গুটি তিন লম্বা ধরণের চৌকো গুটি। এর এক এক পিঠে যথাক্রমে ১, ২, ৫, ৬ লেখা। গুটি জোড়ায় জোড়ায় চলে। অর্থাৎ দশ পড়লে পাঁচ ঘর যায়।

বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা ॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা ॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর।
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভুর,[১] আগুন বেঁধে কে রাখিবা ॥ ২০১ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাক্‌বে আমার, মন কেন কুপথে চলে ॥
হেদে গো মা দশভূজা, আমার ভরে তনু হইল বোঝা।
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ব গঙ্গাজলে ॥
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী।
যখন শমন ধরিবে আসি, ডাক্‌ব কালী কালী বলে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে।
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে ॥ ২০২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানবতরী কারণ জলে ॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে।
ওরে কেউ করিল দুন ব্যাপার, কেউ হারাল লাভে মূলে ॥
ক্ষিত্যপতেজঃমরুৎব্যোম, বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গুরোয় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিলে ॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥ ২০৩॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ভাল মা ভাল এ মন্ত্রণা।
যারে খেদাইলে তার উঠল চষি, করেছ কি এই বাসনা।
সাধের ঘরে বাদ সেধেছে দিয়ে ছয়টা বাদী সেনা।
তারা আপন আপন পক্ষ টানে, নিমকের সর্ত্ত মানে না।
এক হাটে দুই দর করেছ, এই কি মা তোর বিবেচনা।
কারু শাকে দেও বালি, কারু দুগ্ধেতে দেও চিনির পানা।
প্রসাদ বলে বলবো কি মা, বল্‌তে কিছু চায় রসনা।
ঐ যে জোরকা লাঠি শির কা উপর, আমার মন বুঝেছে প্রাণ
বুঝেনা ॥ ২০৪ ॥

১। ভুর—ভুল।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল্ আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত॥
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।
ওমা, ষড়রিপু সাহায্য তায়, হল ভূতের অনুগত॥
আসিয়া ভব সংসারে দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা, যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত॥
চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচল না সে মুখের তিত।
কেন ভিষক প্রসাদ মনে বিষাদ, হয়ে কালীর শরণাগত॥ ২০৫ ॥

(রাগিণী—গাড়া ভৈরবী, তাল—জৎ)

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী গোবর ছড়া দিবে, অমঙ্গল হবে বলে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী বলে, কি করিতে পার্‌বে কালে॥ ২০৬ ॥

(রাগিণী—মুলতানী, তাল—একতালা)

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী[১] পদে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত পুরী গমনে॥২০৭॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন করনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হয়ে ধর্ম্মতনয়[২] ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা॥

১ পঞ্চক্রোশী—কাশী পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপী। ২। ধর্ম্মতনয়—যুধিষ্ঠির।

হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তবু শিবের দৈন্য দশা।
সে যে দুঃখে দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা ॥
হরিষে বিষাদ আছে মন, কর না একথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া, এড়াবে না রতি মাসা ॥
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা ॥২০৮॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন কর্ না দ্বেষা দ্বেষি।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোজ তল্লাসি।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে আসি ॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, আযোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে একবয়সী।
যেমন অনুজ ধানকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দোঁতার হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী[১] ॥২০৯॥

(রাগিনী—মূলতান, তাল—একতালা)

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা, ওরে ওমন কেন ভোল ॥
কিঞ্চিৎ কর না ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল ॥
যা হবার তা হল ভাল, কাল গেল মন্ কালী বল।
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূলা, ভব পারাবারে চল ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ভুল না মন নিদান কালে।
ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হল ॥২১০॥

১। এই পদের একটি পাঠান্তর ১০১ নং পদে লক্ষ্য করা যায়। মূল পার্থক্য পদটির সূচনায়। ১০১ নং পদটি দয়াল ঘোষ সংগৃহীত।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে ॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে ॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোটার ভিতর চোরকুটারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে।
ষড়দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌ব হাঁড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে[১] ॥২১১॥

(রাগিণী—জঙ্গলা মুলতানী, তাল—একতালা)

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষ, অজপার[২] শেষ,
ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরায়ে ॥
হং বর্ণ পূরকে হয়, সংবর্ণ রেচকে বয়।
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে ॥
অজপা হইলে সাঙ্গ কোথা তব রবে রঙ্গ।
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে ॥
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়।
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়, ততোধিক সঙ্গম সময়ে ॥২১২॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া ॥
নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী, শেষে দিবে গোবর ছড়া ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসি, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥

১। পদটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক ১২৬০ এর ১লা মাঘের সংবাদপ্রভাকরে রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসীর চিঠিতে উদ্ধৃত। রামপ্রসাদকে একেশ্বরবাদী প্রমাণের জন্য পত্রলেখক পদটি ব্যবহার করেছেন।
২। অজপার বা অজপামন্ত্রের। হংস বা 'হং' আর 'স' মন্ত্রে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়া এই মন্ত্রে বিধৃত।

অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চার কোণা মাঝখানে ফাঁড়া ॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া[১] ॥ ২১৩ ॥

(রাগিণী— জঙ্গলা, তাল—একতালা)

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেনরে পেয়েছ এত ভয় ॥
তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়।
দুর্গা নাম তরণী করে, বেয়ে গেলে হয় ॥
পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয় ॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে, করেছি বিক্রয় ॥ ২১৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন কেনরে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥
ভবে এসে ভাবছ বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত ॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত ॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলিরে পাগলের মত।
অমন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ॥
মিছে কেন ভাব দুঃখ, দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি হবেরে তোর তেম্নি মত ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কররে মনের মত।
এখন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত[২] ॥ ২১৫ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকুলি ধূলা ধূলি।
আমি কালী নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি।

১ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল, এ পদটিতে তাদের একটির প্রমাণ মেলে। ঘরের বেড়া দেওয়ার কাজে রত থাকার সময় কন্যার সাময়িক অনুপস্থিতিকালে দেবী স্বয়ং রামপ্রসাদকে সাহায্য করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

২। রবিসুত—যম। সূর্য্যের ঔরসে এবং সংজ্ঞার গর্ভে জন্ম হয়।

ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি, গলে দিলে কাঁথা ঝুলি[১] ॥ ২১৬ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে ॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র, সে সুতার কাটনা কেটেছে। ওমা
সেই মায়া সূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥ ২১৭ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন জান না কি ঘটবে লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে, পথে তোমার দিবে কাঁটা ॥
আমি দিন থাকতে উপায় বলি, দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আঁটা ॥
পিঞ্জরে পোষেছ পাখী, আটক করিবে কেটা।
ওরে, জানানা যে তার ভিতরে, দুয়ার রয়েছ নটা[২] ॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা ॥
প্রসাদ বলে মন জানতো, মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ী, বুঝাইব সেটা ॥ ২১৮ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে ॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্‌নারে বসে বসে ॥
মনের মত মন যদি হও, থাকরে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে ॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কসে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয় চরণ পাবার আশে ॥ ২১৯ ॥

১। পদটি দাণ্ডাগুলি খেলার রূপকে লেখা। ষড় রিপুর কুপ্রভাব খেলার মাধ্যমে প্রকাশিত।
২। নটা,—নবদ্বার (দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, প্রস্রাবদ্বার, মলদ্বার।)

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তুমি দেখরে ভেবে।
ওরে, আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে ॥
ভবঘোরে হয়ে রে মন, ভাবলিনে ভবানী ভবে।
সদা ভাব সেই ভবানী পদ, যদি ভব পারে যাবে ॥ ২২০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
(ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ)
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ ॥
রংয়ের বেলা রাঙ্গায় কড়ি, সোনার দরে তা কিনেছ।
ও মন, দুঃখের বেলা রতন মাণিক, মাটীর দরে তা বেচেছ ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজায়েছ।
যখন সে রূপে বিরূপ হবে, সে রূপের কিরূপ ভেবেছ ॥ ২২১ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না ॥
ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি মন তাই জান না ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজনা ॥
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মাত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখান কর্ব্বে পূজা, মাতো আমার ঘুষ খাবে না ॥ ২২২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তোমার ভ্রম গেল না।
তুমি কালী কে তা চিনলে না ॥
মা আমার জগৎময়ী, জগতে তাঁর নাই তুলনা।
তুমি মাটীর মূর্ত্তি গড়ে কি চাও, কর্ত্তে মায়ের উপাসনা ॥
জীব মাত্র মায়ের ছেলে, কেহ নয় তাঁর পর ভাবনা।
তুমি খুসি কত্তে চাও কি মাকে, কেটে একটা ছাগল ছানা ॥
প্রসাদ বলে রে মূঢ় মন, ভক্তি মাত্র উপাসনা।
কল্লে লোক দেখান কালীপূজা, মা তো তোমার ঘুষ খাবে না ॥ ২২৩ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে ॥
জাঁক জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে ॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥
আলো চাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর সে আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে ॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে, দেওনা জ্বলুক নিশিদিনে ॥
মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, বলি দেও ষড়রিপুগণে ॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোলে, কাজ কি রে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥ ২২৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলিয়ে গেলি ॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে, শমনেরে সঁপে দিলি ॥
গুরুদত্ত মহাসুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়ালি কেবল মাত্র, কতকগুলো গালাগালি ॥
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম, করে দিলি মেজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালী ॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জাননা কি হৃদে গেঁথে, রেখেছি দক্ষিণা কালী ॥ ২২৫ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন রে ভালবাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধু পারে তারে ॥
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য আমার সংসারে ॥
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্বকথা।
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে ॥
সংসার কেবল কাচ কুহুকে নাচায় নাচ।
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে

অহঙ্কার দ্বেষ রাগ অনুকূলে অনুরাগ।
দেহ রাজ্য দিল ভাগ বল কি বিচারে ॥
যা করেছ চারা কিবা প্রায় অবসান দিবা ॥
মণিদ্বীপে ভাব শিবা, সদা শিবাগারে ॥
প্রসাদ বলে দুর্গা নাম সুধাময় মোক্ষধাম।
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে ॥ ২২৬ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন কেন হও কর্ম্মদোষী।
এই অসার সংসারে আসি ॥
রিপু ছয় তুরশিয়, দুগ্ধ কলা দিয়া পুষি।
তুমি তাদের বশে যা কর, শেষে বিষে দগ্ধ ভস্মরাশি ॥
রবিসুত দূত, দণ্ড হাতে সে যে আছে শিয়রে বসি।
তারে সাধিলে না করে দয়া, বাঁধে গলায় রশা-রাশি ॥
ধন-জন পরিবার, যাদের পেয়ে বড় খুসি।
তারা সময় কালে কেউ কারো নয় একা যাই আর একা আসি ॥
প্রসাদ বলে ভাবতে গেলে, নিশির স্বপন কান্নাহাসি।
যদি সকল দোষে মুক্ত হবে, ভাবশ্যামা এলোকেশী ॥ ২২৭ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন চাইরে মনের মত।
এমন আছে যোগী কত শত ॥
বাঁধিয়ে মাথায় জটা, করে কোঁটা ঋষির মত।
তারা বলে এক করে আর, আছে বট বৃক্ষ মত ॥
পাষাণ পূজে হর যদি পায়, শুনরে অজ্ঞান যত।
তবে আমি দিবানিশি, বসি বসি, পাহাড় পূজি অবিরত ॥
যদি বল নয়ন মুদে থাকলে পাব গুরুপদ।
তবে পায় না কেন আপন ধনে, অন্ধ আছে পড়ে কত ॥
প্রসাদ বলে মাকে বলরে মন দিবে তোরে মনের মত।
তারে সাধিলে হইবে সিদ্ধি বাধ্য হবে রিপু যত ॥ ২২৮ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন কি যাবি জগন্নাথে।
খাবি আনন্দবাজারে ভাত ভক্তি রেখে আপন মাথে ॥
জগন্নাথ আত্মারাম, হৃদিপদ্মে তাঁর ধাম।
পূর্ণ হবে মনস্কাম ভজলে তাঁরে অন্তরেতে ॥

ঘরে আছে পরম রত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন।
ওরে মিছে কেন ভ্রমণ করা, ভ্রান্তি সেত সাথে সাথে ॥
গুরুবাক্য শিরে ধর, আত্মতত্ত্ব তত্ত্ব কর।
বিদ্যাতত্ত্ব, রাখ নিয়ে পাতে পাতে ॥
প্রসাদ বলে যাব কোথা, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।
ওরে এযেন রাত কানার কথা, উড়ে বেড়ায় বাতে বাতে ॥ ২২৯ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল— একতালা)

মা আমার অন্তরে ছিলে।
বুঝি দোষ দেখে অন্তরে গেলে ॥
ও কথা কি বলবার কথা, কথা সই জননী বলে।
যদি দোষী তুমি নির্দোষী তুমি তবে আমার কি দোষ পেলে ॥
উন্মাতে হও উগ্রচণ্ডা, উচিত কথা কইতে গেলে।
আছে শিবের কথা যে কথা মা সে কথা শিকেয় থুলে ॥
তুটি আখি ছল ছল, সভয়ে রামপ্রসাদ বলে।
আমায় যেমন রাখ তেমনি থাকি, তবে আমার কি দোষ পেলে ॥২৩০ ॥

(প্রসাদী সুর , তাল—একতালা)

মন আমার কি ভাবছো বল।
মুখে জয়দুর্গা শ্রীদুর্গা বল ॥

*　　　　*　　　　*

এই ভবের চড়ায় তনুর জাহাজ ডুবে বুঝি প্রায় গরভ হল ॥
চড়া কেটে যদি পাবে উপায় বলি শুন তবে।
ও মন মহামন্ত্র দমকলেতে গঙ্গাজলে সেচে ফেল ॥ ২৩১ ॥ (অসম্পূর্ণ)

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তোরে বুঝাব কি বলে।
যেমন ভোজের বাজি কারসাজি
তেম্নি ফাঁকি শ্যামার লীলে ॥
শবকে কোরে শিবের আকার,
রাখলে আপন পদতলে।
লোকে দেখলে বল্‌বে সতী হয়ে,
পতির বুকে চরণ দিলে ॥
আপনি হয়ে কালের স্বরূপ,
দাঁড়িয়ে মুক্তিপথ আগুলে।
তাঁরে ভক্তি করে পূজলে পরে,
মায়ের মত কর্‌বে কোলে ॥

আপনি মৎস্য আপনি ধীবর মা,
আপনি খেলা করেন জলে।
রামপ্রসাদ বলে সাধ কোরে কি,
শ্যামার মায়ায় জগৎ ভুলে ॥ ২৩২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন ভুলনা কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে ॥
সুরাপান করিনেরে, সুধা খাই যে কুতূহলে!
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে ॥
অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণ তলে।
নৈলে ধরবে নেশা ঘুচবে দিশা, বিষম বিষয় মদ খাইলে ॥
যন্ত্র ভরা মন্ত্র সোঁড়া, অণ্ড ভাসে যেই জলে।
সে যে অকুল তারণ কুলের কারণ, কুল ছেড় না পরের বোলে ॥
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে।
সত্ত্বে ধর্ম্ম তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে ॥
মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে, পতিত হবে কুল ছাড়িলে[১] ॥ ২৩৩ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদ-পদ্ম-সুধা ত্যজি, কূপে পড়ে আপন খাবে ॥
ভব জরা পাপ রোগ লীলাচলে নানা ভোগ।
ওরে জরে কাশী সর্ব্বনাশী, ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে ॥
কালী নাম মহৌষধি, ভক্তি ভাবে পান বিধি।
ওরে গান কর পান কর, আত্মরামের আত্ম্য হবে ॥
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত।
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে, পরমাত্মায় মিশাইবে ॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া ছাড়ি কল্পতরু ছায়া।
ওরে, কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে, মৃত্যু ভয়টা কি এড়াবে ॥ ২৩৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত পটল সত্ত্ব, মধ্যে মধ্যে এটি চাবা ॥

১। এই পদটি এবং ৮০ সংখ্যক পদটি রামপ্রসাদের মদ্যপানে আসক্তির পরিচয় দেয় বলে প্রসিদ্ধি সাধারণ লোকের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের প্রতিবাদে ভক্ততান্ত্রিক কবি পদ দুটি রচনা করেন।

সৌভাগ্য কররে দূরে, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন, ভব রোগে মুক্ত হবা॥ ২৩৫॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুন্‌লে দুধি ভাতি।
ওরে জাননা কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনার কর গতি॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চার ফলের স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন শোন্ যুকতি।
ঘরে বসে মুখে কালী বলে, গাছনাড়া দেও নিতি নিতি॥ ২৩৬॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মনরে আমার ভুলা মামা।
ও তুই জানিস্ নারে খরচ জমা॥
যখন ভবে জমা হলি ; তখন হতে খরচ গেলি।
ওরে জমা খরচ ঠিক্ করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা॥
বাদে হলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবিল বাকী।
তলবিল বাকী বড় ফাঁকি, হবে না তোর লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে দেখরে বুঝে, কিসের খরচ কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব মন, কালী তারা উমা শ্যামা॥ ২৩৭॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রৈলো পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোণা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
(মনরে আমার)
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা বাজেআপ্ত হবে জাননা।
(মনরে আমার)
আছে একতারে মন এই বেলা, তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরু বীজ রোপণ করে বীজ, ভক্তিবারি তায় সেঁচনা।

(মনরে আমার)
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা[১] ॥ ২৩৮ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মনরে তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাকরে, ওরে ও মন, তিনি ভবপারের তরি ॥
কালী নামটা বড় মিঠা, বলরে দিবা সর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরী ॥
তিনি তনয় বলে দয়া করে, তরাবেন এ ভব বারি ॥ ২৩৯ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মনরে তোর বুদ্ধি একি।
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে তালাস করে বেড়াস ফাঁকি ॥
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে।
মনরে, ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে নাকি ॥
জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে কর না হেলা।
মনরে, যখন বলবে বাপে সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী ॥
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায়, তার চেয়ে কে অবোধ ধরায়।
প্রসাদ বলে হারাব না, সময় থাকতে শিখে রাখি ॥ ২৪০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ ॥
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক ॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় করে জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক ॥ ২৪১ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া ॥

---

১ বিভিন্ন পাঠান্তর—
(১) মন তুমি কৃষি কাজ জান না। (২) মন তোমার কৃষি কাজ এসে না। (৩) এখন আপন-ভাবে তিন করে। (৪) গুরুদত্ত বীজ বপন করে। (৫) ডেকে নেনা।

চাকি[১] কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাঁচমূলে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়া॥
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধরবে মন্ত্র সোঢ়া॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন, পাঁচ, শোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া॥ ২৪২॥

প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তোমারে করি মানা।
তুমি পরের আশা আর করো না॥
তুমি বা কার কেবা তোমার ভেবে মর কার ভাবনা।
ওরে তোর ভাবনা কেউ ভাবেনা, ভাব দেখে কি যায় না জানা॥
সুখের ভাগী অনেকে হয়, দুঃখের ভাগী কেউ হবে না।
যখন শমন এসে ধরবে কেশে তখন কেবল ত্রিনয়না॥
সুদিন দেখে অধীন জনে করবে কত উপাসনা।
যেদিন কুদিন হবে প্রসাদ বলে, সেদিন অধীন কেউ রয়না॥ ২৪৩॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তোমার একি বিবেচনা।
তোমায় বুঝাইলে তো বুঝ না।
কর গৃহ সুবিস্তার, গৃহে রত্ন অগণনা।
আছে মহাগ্রহ রবিসুত, সে গ্রহ শান্তি কর না॥
গৃহে তব গৃহভেদী, আছে গ্রহ যে ছ'জনা।
তারা নিজ গৃহ থেকে করে গৃহদাহ কুমন্ত্রণা॥
তারা পদ গৃহ কর, ত্যজ গ্রহ সে দু'জনা।
রামপ্রসাদ বলে সকল গ্রহের গৃহ শ্যামা ত্রিনয়না॥ ২৪৪॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন তোমার একি বাসনা।
কেন অহরহ কর কুবাসনা॥
ষড়রিপু বলে বাস, অবাসনা উপাসনা।
যদি স্ববলে না বাস কর কিসে পাবে শবাসনা॥
ভাই বন্ধু দারা সুত ভালবাস সে বাসনা।
যেদিন রবিসুত বশে বাস, এবাসে বাস হবে না॥
ষড়্ ঐশ্বর্য্যে বাস, কোটি রত্নে বিভূষণা।
রামপ্রসাদ বলে শূন্য বাস যে বাসে নাই বিবসনা॥ ২৪৫॥

১ চাকি—টাকা।

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মর্‌লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে ॥
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কার কথা কেও শুনে না, দিন তো আমার কেটে
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেম্নি মত ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে ॥ ২৪৬ ॥

(রাগিণী—বিভাস, তাল—ঢিমা তেতালা)

মরি ! ও রমণী কি রণ করে !
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদ ভরে,
রথ রথী সাথী তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে ॥
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসী শশী খসি পড়ে তরাসে।
নিরূপমা রূপ ছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম কটা,
প্রবল দনুজ ঘটা গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ-বধু, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু মৃদু মৃদু হাসে ॥
সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা বাসা,
জীবনে নিরাশা ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে ॥ ২৪৭ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মরি গো এই মন দুঃখে।
(ওমা, মা বিনে দুঃখ বলব কাকে) ॥
একি অসম্ভব কথা, শুনে বা কি বলবে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে ॥

সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখহে যারে পরম সুখে।
ওমা, আমি কত অপরাধী, নুন মেলে না আমার শাকে ॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে, পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ওমা, মায়ের মত কাজ করেছ, ঘোষিবে জগতের লোকে ॥ ২৪৮ ॥

(প্রসাদী সুর তাল—একতালা)

মা আমায় ঘুরাবি কত।
যেন নাক ফোঁড়া বলদের মত ॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি, পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভ ধারণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত ॥
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়।
রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমার, তাড়ায়ে দেও জনমের মত ॥ ২৪৯ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত ॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি, পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভ ধারণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত ॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে মা চোকের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয় পদ ॥
কুপুত্র হয় অনেক গো মা, কুমাতা নয় কখনও।
প্রসাদ যে কুপুত্র তোমার, করে রেখো পদানত ॥ ২৫০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মা আমার খেলান হল।
(খেলা হল গো আনন্দময়ী) ॥
ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলা খেলা।
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো ॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেল ॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্ত কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে, মুক্তি জলে টেনে ফেল ॥ ২৫১ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া, কতই মা কাচাও গো কাচ।
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূৰ্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ॥
বুঝে ভার দেয় না সে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নিৰ্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥ ২৫২॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের যত, বকেয়া বাকীর জের টেনেছে।
যার যেম্নি কৰ্ম্ম তেম্নি ফল, কৰ্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমায় কমি খরচ বেশী, তবুব কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে, (কেবল) কালীনাম ভরসা আছে॥ ২৫৩॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে, বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা, যার এই জমী।
তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী॥
আমি মোলে এ মহলে, আর নাই হামি।
মাগো এখন ভাল না রাখত, থাকুক রাম রামি॥
গঙ্গা যদি গৰ্ভে টেনে, লইল এই ভূমি।
কেবল কথা রবে কোথা রব, কোথা রবে তুমি॥ ২৫৪॥

(রাগিণী খাম্বাজ, তাল—রূপক)

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ বিগলিত কেশ, বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গো রণে॥
সদ্য-হত দিতি-তনয় মস্তকহার লম্বিত সুজঘনে।
কত রাজিত কটীতটে, নরকরনিকর, কুনপশিশু শ্রবণে॥
অধর সুললিত বিম্ব বিনিন্দিত, কুণ্ড বিকশিত সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে॥

সজল-জলধর কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ॥ ২৫৫ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মাগো আমার কপাল দোষী।
(দোষী বটে গো আনন্দময়ী)
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥
অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি ॥
না করিলাম ধর্ম্মকর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥
জনমি ভারতভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাব্‌তে নারি দিবানিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে, দুর্গা নামে দিব ফাঁসি ॥ ২৫৬ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারি ॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছটারে, গরল খাইয়ে প্রাণে মারি ॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি[১], তারে দিলি জমিদারী ॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছে রাজকুমারী ॥
হুজুরে উকীল যে জন, ডিস্‌মিস্ তাঁর আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি সওয়াল বন্দী, যে রূপেতে আমি হারি ॥
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়াছে ত্রিপুরারি ॥ ২৫৭ ॥

এই পদটির একটি ত্রিপুরা সংস্করণ এখানে দেওয়া হল—

মাগো তারা সুরেশ্বরি।
কেন অবিচারে আমার তরে করেন দুক্ষের ডিগিরিজারি ॥
একা আমি ছটি পেদা বল্ মা কিসে সমাই করি।
আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয়জনারে প্রাণে মারি ॥

১ কৃষ্ণচন্দ্র পান্তি পরে কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী রাণাঘাটের বিখ্যাত পালচৌধুরী জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পান বিক্রয়ের সামান্য ব্যবসা থেকে পরে বিরাট ধনী হন।

সদরে ওকিল জে জনা টিসমিসে তার আশ ভারি।
সে জে বিসম সন্ধি মহাল বন্ধি কোন রূপে আমি হারি॥
সদরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব ইষ্টাম্বরি।
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গা২ বলে মরি॥

(কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৫)

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মা আর কি দেখ্‌ছ বসে।

যদি তারা থাকৃতে নিবে বাতি মা, শুনিলে বিপক্ষ হাসে॥
তেল থাকৃতে নিবায় বাতি মা, ছটা গোবরে পোকা এসে।
এদের এক এক পোকার এক এক গুণ মা,
এক এক জনে লাগায় দিশে॥
প্রসাদ বলে আলোয় আছি মা, আলো লয়ে যাব দেশে॥
যখন মুঁদব তারা, দেখ্‌বে তারা অন্ধকার বিনাশে॥ ২৫৮॥

(রাগিণী—লগ্নী, তাল—আড়খেমটা)

মা বসন পর!

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো॥
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নববলি গো॥
কার বাড়ী গিয়াছিলে, মাগো কে করেছে সেযা।
শিরে দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জবা গো॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড, করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুণ্ডমালা।
হেট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে।
ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো॥ ২৫৯॥

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

মা তোমারে বারে বারে, জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখনীরে, স্রোতের সেহলার মত॥

আমার যে মা মূল বাঁধা নাই, কোথায় যেতে কোথায় দাঁড়াই।
ছয় দিকেতে ছয় রিপুর টান, মাঝে পড়ে হলাম হত ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে।
দাঁড়াও একবার হৃদ্‌কমলে*, দেখে যাই জনমের মত ॥ ২৬০ ॥

(রাগিণী—পিলুবাহার, তাল—জৎ)

মা বলে ডাকিস্ নারে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন করে।
ওরে অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই ॥ ২৬১ ॥

(রাগিণী—গৌরীলঙ্কার, তাল—একতালা)

মা মা বলে আর ডাকবনা।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ছিলাম গৃহবাসী করিলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারেবারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিগ্যমানে এদুঃখ সন্তানে, মা মলে কি আর ছেলে বাঁচেনা।
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র, মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি আর কি করিবি, দিবি দিবি পুন জঠর যন্ত্রণা ॥ ২৬২ ॥

মা চেয়ে ভাল বিমাতা।
মায়ের আমার মায়া কোথা ॥
মায়ের যেটি ভাল ছেলে,
তার প্রতি স্নেহ-মমতা।
অকৃত সন্তানের প্রতি
মা চায় না ফিরে, কয় না কথা ॥
বিমাতার নাই ভাল মন্দ,
দুঃখী তাপী সব সমতা।
ও তার ঘৃণা নাই পাতকী বলে,
মা কোলে লয়, যে যায় গো তথা ॥ ২৬৩ ॥
(অসম্পূর্ণ)

মা যদি ধরে তোল তবে তরি এ অকূল।
আমার একূল ওকূল দুকূল পাথার
মধ্যে সাঁতার বিষম হইল ॥

* "হৃদ্‌কমলের" পাঠান্তর "দ্বিজমন্দিরে" [দয়াল ঘোষ]

সঙ্গী গুলা হইল ছাই
(আমি) তাদের সঙ্গে ভেসে যাই ;
কারে ধরতে গেলে আমায় ধরে
ডুবায় গো মা প্রাণটা গেল।
মনে ছিল যে ভরসা
না পূরিল সেই আশা ;
আমায় ভুলালে যখন ডুবালে তখন
এখন কি মা করি বল।
শ্রীরামপ্রসাদের ভার
মা বিনে কে লবে আর,
আমায় মরণ কালে চরণ-দিয়ে
সঙ্গে নিয়ে কাশী চল ॥ ২৬৪ ॥

মা তোদের ক্ষেপার হাট বাজার।
গুণের কথা কইব কার ?
তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে
কেউ মাথায় চড়িস্ তাঁর ॥
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার,
চাকলা ছাড়া চেলা দুটো সঙ্গে অনিবার ॥
গজ বিনে গো-আরোহণে ফিরিস্ কি আচার,
মণিমুক্তা ছেড়ে পরিস্ গলে নর-শির হার ॥
শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কার
কার বা ধারিস্ ধার,
রামপ্রসাদকে ভবার্ণবে কর্ত্তে হবে পার ॥ ২৬৫ ॥

মা দাঁড়ায়ে শিবের বুকে।
নাচছে বেটী থেকে থেকে ॥
মা দাঁড়ায়ে শিবের বুকে
এ সব কথা বল্ব কাকে।
অন্য কেহ হ'লে পরে
হাততালি যে দিত লোকে ॥
উহু উহু মরি মরি, মা হয়েছে দিগম্বরী।
তাতে রুষ্ট নয় ভব তুষ্ট হয়ে
চরণপদ্ম হৃৎপদ্মে রাখে ॥ ২৬৬ ॥
(অসম্পূর্ণ)

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
বিরাজে গো ব্রহ্মময়ী অংশরূপা
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে ॥
কশ্চিৎ পদ্মিনী নামা, কশ্চিৎ চিত্রাণি বামা,
শঙ্খিনী হস্তিনীরূপে কটাক্ষেতে মন হরে।
কশ্চিৎ যুবতী নারী, কশ্চিৎ বা সুকুমারী,
বালা প্রৌঢ়া নানা মূর্ত্তি, বিশ্বজনে মুগ্ধ করে ॥
বিলসিত মাতা পূর্ণা, হেমবর্ণা কৃষ্ণবর্ণা,
দীর্ঘকেশী কুরঙ্গাক্ষি, গতি নিন্দী গজেশ্বরে।
এক বাহং গজৎসর্ব্বে, দ্বিতীয় কামনাপরে ॥
নিরাকারে নিরাকার, সাকার ভাবনা যার,
সে লভে সাযুজ্য ভার, নির্ব্বাণ কি তার মনে ধরে।
নারী মাত্রে ভাব শক্তি, শুদ্ধ মনে কর ভক্তি,
প্রসাদ বলে এই যুক্তি, ভৈরব ভাবিবে নরে ॥ ২৬৭ ॥

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

মায়ের এ পরম কৌতুকে।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধ জনে লুটে সুখ ॥
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক ॥
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছে ভাব দুখ সুখ ॥
দীপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখেরে একটুক্ ॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ,
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে, দেখরে আপন মুখ ॥ ২৬৮ ॥

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যেজন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে ॥
হুজুরেতে আরজি দিয়া মা, দাঁড়াইয়া আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ শঙ্কটে ॥
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে ॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে ॥ ২৬৯ ॥

(রাগিণী—মূলতান, তাল—একতালা)

মায়ের নামে লইতে অলস হইও না ;
(রসনায় যা হবার তাই হবে)
দুঃখ পেয়েছ (আমার মনরে), না আরো পাবে ॥
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ?
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতনে থেক (মনরে আমার), কালী বলে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥ ২৭০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মায়ের চরণ তলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব ॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব ॥
প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইক যাব।
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে, চরণতলে প্রাণ ত্যজিব ॥ ২৭১ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব করে হয়না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥
দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না, এল পুত্র গেল কোথা ॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা ॥ ২৭২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কতদিনে কাটবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি ॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে, হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে, পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥ ২৭৩ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মোরে তরা বলে কেন না ডাকিলাম।
(আমার) এ তনু তরণী ভব সাগরে ডুবাইলাম ॥
ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
(তাতে) ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পূরাইলাম ॥
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ॥
প্রসাদ বলে মাগো আমি কি কার্য্য করিলাম।
(আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥ ২৭৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মাগো আমার এই ভাবনা।
(আমি) কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম,
কোথায় যাব নাইকো জানা ॥
দেহের মধ্যে ছজন রিপু,
তারা দেয় মা কুমন্ত্রণা,
আমার মনকে বলি ভজ কালী,
তারা কেউ কথা শুনে না ॥ ২৭৫ ॥
(অসম্পূর্ণ)

(প্রসাদীসুর, তাল—একতালা)

মাগো বলেছে বুড়া।
যে ও চরণে প্রাণ সঁপেছে সে সবাকার মাথার চূড়া ॥
যেখানে আছে এ ভোগ, সেখানে নাহিক রোগ।
ওর ভজনে এই হয়, গাছের পাড়া তলার কুড়া ॥
ওর ভজনে স্বেচ্ছাচারী, কেহ নয় মা ব্রহ্মচারী।
ওগো নানা তীর্থ পর্য্যটনে, শেষে করে মাথামুড়া ॥
কৌতুকে প্রসাদ ভণে বাসনা আমার মনে।
আমায় লোকে বলুক রামপ্রসাদ, তোমার মুখে দেই গো নুড়া ॥ ২৭৬ ॥

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টী কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে ?
শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে ?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন ;
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে ?

অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি ?
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে ॥ রামপ্রসাদ ॥ ২৭৭ ॥

মহাকালের মনোমোহিনী সদানন্দময়ী কালী ॥
তুমি আপনি নাচ আপন সুখে
আপনি দাও মা করতালি ॥
আদিরূপা সনাতনী প্রকৃতি পরমা কালী।
মা গো! ব্রহ্মাণ্ড না ছিল যখন
মুণ্ড মালা কোথায় পালি ॥
ব্রজেতে বালিকা হয়ে যশোদাকে মা বলিলি।
আবার কৃষ্ণ হয়ে মাটি খেয়ে
মুখে ত্রিভুবন দেখালি ॥
মনের সাধে রামপ্রসাদে দেখে দিচ্ছে গালাগালি।
ওলো সর্ব্বনাশী ধরে অসি
ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটা খালি ॥ ২৭৮ ॥

(রাগিণী—মল্লার, তাল—খয়রা)

মোহিনী আশা বাসা, ঘোর তমোনাশা বামা কে।
ঘোর ঘটা কান্তি ছটা, ব্রহ্ম কটা ঠেকেছে ॥
রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী;
মুখ ঝালা সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে ॥
দ্রুত চলে আস্ত টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা কব কিবা দিবানিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, তুষ্ট চিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীরবাদে, কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥ ২৭৯ ॥

(রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—একতালা)

যদি ডুব্‌ল না ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে।
মন হাল ছেড়না ভরসা বাঁধ, পারবি যেতে বেয়ে ॥
মন চক্ষু দাঁড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে ॥
মন, শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালীনামের, যাওরে সারি গেয়ে ॥ ২৮০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥
পাপপুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি ॥

শমন দমন শ্রীনাথ চরণ সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী ॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী ॥ ২৮১ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

যাও গো জননী, জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামদি করে ॥
মা মা বলে পাছু পাছু, যেজন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে, দাখিল করিস্ যমের ঘরে ॥
অল্পে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যেজন শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে ॥
চোকে আঙ্গুল না দিলে পর, দেখ্‌বি না মা বিচার করে।
ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে ॥
যে দুকথা শোনাতে পারে, সে জনা হেতের ধরে।
তার হয়ে আশ্রিত সদা, থাকিস্ মা পরাণের ডরে ॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা জোরে।
সাধরে শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হরে ॥ ২৮২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

যদি যাবি মন ভবনদী পারে।
একবার ডাক দেখি শ্যামামারে ॥
যুগল চরণ তরি সহায় করি,
মনকে মাঝির স্বরূপ করে ॥
দাঁড়ি রিপু ছ'জন
করবে দমন,
নইলে ঘটবে বিপদ ঘোর পাথারে।
আগে যদি যুক্তি করে দেখ
শেষে সময় মিলবেনা ক
প্রসাদ বলে ঘোর তরঙ্গে ডুবাবে তোরে ঐ ছজনায় যুক্তি করে ॥ ২৮৩ ॥

যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি ;
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ?
একবার নাচ গো শ্যামা,—
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা প'রে,
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে,
গজমতি নাসায় দুলুক ;

যশোদার সাজানো বেশে, অলকা-আবৃত মুখে,
অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হোক ;
যেমন করে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি,
হৃদি-বৃন্দাবন-মাঝে, ললিত ত্রিভঙ্গ-ধামে ;
চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন-ভুলানো বেশে,
তেমনি তেমনি তেমনি করে ;
(দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে ;
তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজত গিরি)
একবার বাজা গো মা—সেই মোহন বেণু,
যে বেণু-রবে ধেনু ফিরাতিস্,
যে বেণু-রবে যমুনায় উজান ধরিত ;
বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে।
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা ;
তা থেইয়া তা থেইয়া, তা তা থেই থেই বাজত নূপুর-ধ্বনি।
শুনতে পেয়ে, আসতো ধেয়ে ব্রজের রমণী ॥
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত ;
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী।
এলাইয়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী[১] ॥ ২৮৪ ॥

(ভৈরবী—যৎ)

যে হয় পাষাণের মেয়ে
তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়া হীনা না হলে কি
লাথি মারে নাথের বুকে ॥
দয়াময়ী নাম জগতে
দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা,
পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি,
শুনেও ত মা শুন নাকি,
প্রসাদ এম্নি নাথি খেগো
তবু দুর্গা বলে ডাকে ॥ ২৮৫ ॥

(প্রসাদী সুর তাল—একতালা)

রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজে কমলদলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয় রসে ॥

১। পদটি "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" সংগৃহীত ২২১ সংখ্যক পদ। এতে কবির ভণিতা নাই।

শক্তি-কুলকুণ্ডলিনী, তারেও ত মন জাগালি নে।
হেবে গুড়ের কলস হলি অলস, এমন অবশ হলি কিসে ॥
এ দেহ পাঁচ ফুলের সাজি, তুই হলিনে কাজের কাজী।
প্রসাদ বলে রত্ন ত্যজি, ঘুরে মর কর্ম্ম দোষে ॥ ২৮৬ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে।
সুরা পান করিনে রে সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে ॥
খালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম, জানে কেবল সেই পাগলে ॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ ২৮৭ ॥[১]

(রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা)

রসনে কালী নাম রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে ॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজতেছে ঘট পটরে ॥
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস।
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্রের পাত্র বটরে ॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্যধাম।
করে জপনা কালীর নাম, কি তব উৎকটরে ॥
শ্রুতি রাখ সত্ত্ব গুণে, দ্বি-অক্ষরে কর মনে।
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী বলে কাল কাটরে ॥ ২৮৮ ॥

(রাগিণী—ললিত, তিওট)

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল ॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে, করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস, উর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল ॥
নিগম সারিগম, গণ, গণ, গণ, ববরব যন্ত্রমণ্ডল ভাল।
তা তা থেই থেই দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি, ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল ॥

১। এই পদটি ৮০ ও ২৩৩ সংখ্যক পদের সঙ্গে তুলনীয়। এখানেও মদ্যপানের প্রতি কটাক্ষের প্রত্যুত্তর।

প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি, রক্ষ মম পরকাল।
দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপা লেশ, বারয় কাল করাল ॥ ২৮৯ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

শমন আশার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে ॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে।
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে ॥
সহস্রদলকমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে।
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা, চৌকিদারী ভার লয়েছে ॥
সে শক্তির জোরে চেতন করে, তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরু মাঝে ॥
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকী আছে ॥
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্রসূর্যের উদয় আছে।
ওরে তমো নাশ করি তারা, হৃদ্-মন্দিরে বিরাজিছে ॥২৯০॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে ॥
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ, কি করে তার মরণ ভয়ে ॥২৯১॥
(এই গানের শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই)

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

শমন তোমায় ভয় কি রে ॥
তোমার ভয় রাখিনে শ্যামা মায়ের জোরে ॥
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডের রাজা,
তোর অধিকার কি আছে রে।
আমি শুনেছি পুরাণের কথা,
চরণতরী ভবের পারে ॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব পদ,
যে পদে ব্রহ্মাণ্ড ধরে।
ওরে বল্‌বো কি সে পদের মজা
পাগল করে পাগলেরে ॥
চন্দনে চর্চ্চিত জবা,
সে পদে যে দিতে পারে।
ওরে তার কি আছে যমের ভয়,
সে যমকে পাঠায় যমের ঘরে ॥

ভেবেছ কি ভোগা দিয়ে,
ভুলাবে রামপ্রসাদেরে।
আমি আর কি ভুলি,
অভয়পদে জন্মের মত ডুবেছি রে ॥ ২৯২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

শমন আমি কি তোর খাজনা ধারি।
শ্যামা ত্রিভুবনের কর্ত্রী, তুমি কেবল পাটোয়ারী ॥
তুমি যেমন আমি তেমন, তোমায় আমায় ভায়াচারী।
শোন্‌রে শমন দুরাচার, করোনা আর জোর জবরী ॥
দুর্গা নামের সাল্‌তা কবচ বৃথা কি আমি হৃদয়ে ধরি ॥ ২৯৩ ॥
(খণ্ডিত)

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

শমন কি ভয় দেখাও আসি।
আমি যাব কাশীনাথের কাশী ॥
শেষে 'বম্ বম্ বম্ শিব' মুখে বলে হব সন্ন্যাসী।
বারাণসী থাকবো বসি, দূরে যাবে পাপরাশি ॥
আমি কালী বলে কাটিব কাল, কাল বেড়ায় কি আমায় শাসি ॥
মহাকাল সে রাজ্যের রাজা, পঞ্চাননের পঞ্চক্রোশী।
নাহি কালের ভয় তথা আছে, মা মোর কালী কাল বিনাশী ॥
হালিসহর পরগণায় বসত, কুমারহট্ট গ্রামবাসী।
সে যে রামপ্রসাদ কিঙ্কর, ভদ্রকালী পদ অভিলাষী[১] ॥ ২৯৪ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

শমনজয়ী হুকুম পেয়েছি।
শ্যামা মায়ের হুজুর থেকে, (আমি) ॥
মা দিয়েছেন ব্রহ্ম অস্ত্র, হৃদয় তূণে রেখেছি।
আমি করে যতন পুরশ্চরণ, তীক্ষ্ণ খর শান করেছি ॥
ঘরভেদী যে ছ'জন ছিল, তাদের পরাজয় করেছি।
এবার যমকে মেরে যাব চলে, সেইটা মনে সার ভেবেছি ॥
রাম করেছেন লঙ্কা জয়, নীলকমলে চরণ পূজি।
আমি শতদল দিয়ে সে পদে, ডঙ্কা মেরে বসে আছি ॥
প্রসাদ বলে সাধ করে কি, সে অভয় পদে ডুবেছি।
যাতে মরণ হয়না শরণ নিলে, তাই সে পদে প্রাণ সঁপেছি ॥ ২৯৫ ॥

১। স্বগ্রাম উল্লেখের জন্য পদটি বিশেষ মূল্যবান্। একমাত্র এই পদটিতেই কবির বাসস্থানের পরিচয় মেলে।

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা (মা)
সুধাপানে ঢল ঢল তবু চ'লে পড়ো না ॥
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগল পরা,
(দেখে) লজ্জা ভয় আর থাকে না ॥ ২৯৬ ॥
(অসম্পূর্ণ)

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে ॥
সুর-সঙ্কট নাশিতে, অসুরগণ বধিতে,
এর মূল কথা মার্কণ্ডমুনি,
চণ্ডীতে লিখেছে খুলে।
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পদস্পর্শে দানব-দেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে ॥
সতী হয়ে পতির বুকে
পা দিয়েছে কোন্ কালে।
না হয় দাস বলে দাও অভয়পদ
রামপ্রসাদের হৃৎকমলে ॥ ২৯৭ ॥

(রাগিণী—বিভাস, তাল—ঢিমা তেতালা)

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতা শবে ॥
গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে ॥
তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে, অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম. ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে ॥২৯৮॥

(রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—আড়া)

শ্যামা বামা কে ?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে ॥
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে ॥

বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথরথী গজবাজী বয়ানে পূরে।
মম দল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥
প্রচণ্ড প্রতাপরাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু পদে, এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর, ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে ॥
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপা লেশ জননী কালীকে ॥ ২৯৯ ॥

(রাগিণী—বেহাগ, তাল—তিওট)

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসি।
বিহরে বামা স্মরহরে ॥
সুরী কি অসুরী, কি নাগী কি পন্নগী, কি মানুষী ॥
নাসে মুকুতাফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
একি করে! করে করী ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা স্তনবীণা বস্ত্রহীনা ষোড়শী ॥
নীলকমল দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবল চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥
দিতিসুতচয়, সমর প্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখরাশি ॥
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী ॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ,
হৃদয়কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে, জয়ীকালে তুচ্ছবাসি,
কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥ ৩০০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভব সংসার বাজারের মাঝে)
ঐ যে, মন ঘুড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি ॥
কাক গণ্ডী মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।

ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাতচাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ॥ ৩০১ ॥

শ্যামা মারে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে ভেবে দেখ ॥
পরি হরি ধন মদ ভজ পদ কোকনদ।
কালের নৈরাশ কর কথা রাখ ॥
কালী কৃপাময়ী নাম পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম সুখে থাক।
রামপ্রসাদ দাস কয় রিপু চয় করি জয়
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা দূরে হাঁক ॥ ৩০২ ॥

(রাগিণী—মল্লার, তাল—খয়রা)

সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী।
শোভিত শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী ॥
একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্ত্তিমতী মনোভব, ভবভামিনী।
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশীরাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকতজনে, দিবস রজনী ॥ ৩০৩ ॥

(রাগিণী—টোরি জায়নপুরী, তাল—একতালা)

সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে, মাগো জগতে কলঙ্ক রবে ॥
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে ॥
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গানাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে ॥ ৩০৪ ॥

(রাগিণী—ঝিঁ ঝিট, তাল—আড়া)

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী ॥
ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু, বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল, নূতন জলধর বরণী ॥
শব শিব শিরে হৃদয় মন্দাকিনী, রাজত, ঢল ঢল উজ্জ্বল ধরণী ॥

তদুপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর নিকর, সুধা ধামিনী ॥
কলয়তি কবিরঞ্জন করুণাময়ী, করুণাংকুরু হর-মোহিনী।
গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে মমজীবন ধন জননী ॥ ৩০৫ ॥

সকলি জানিস্ তারা আগাগোড়া আমার যত।
তবে কেনে অধম জনে অকাজে মা করিস্ রত ॥
এ সকল ত' তোরই মায়া,
বাজিকরের বাজির মত।
তুই দিয়েছিস মা মনের পায়ে,
মস্ত বেড়ী দারা সুত ॥
দিনে দিনে দিন গেল মা,
সুপথ খুঁজে পেলাম না ত।
ঘোর নিশা যে আস্‌ছে তারা,
অপথে আর ঘুরি কত ॥ ৩০৬ ॥

(অসম্পূর্ণ)

(রাগিণী—ছায়ানট, তাল—খয়রা)

সমরে কেরে কালকামিনী ?
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা (অপরী) কুসুমাপরাজিতা বরণী, কে রণে রমণী।
সুধাংশু-সুধা কি শ্রমজ বিন্দু শ্রীমুখ না একি শারদ ইন্দু,
কমল বন্ধু, বহ্নি, সিন্ধুতনয় এ তিন নয়নী ॥
আ মরি আ মরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষবাসিনী।
ফণী ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দশ্রেণী ॥
কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ, অপরূপ শব-শ্রবণে সাজ।
না করে লাজ, কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী ॥
আ মরি আ মরি চণ্ডমুণ্ডমাল, করে কপাল একি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ডধারিণী।
ক্ষীণ কটীপর, নৃকর নিকর, আবৃত কত কিঙ্কিণী ॥
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত শোণিত বৃন্তে, কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে।
চরণোপান্তে, মনতুরন্তে, রাখ কৃতান্ত দলনী ॥
আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল,
হাসে খল খল টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি ॥
প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ (বিষাদ)।
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, বিষাদ নাশিনী ॥ ৩০৭ ॥

(রাগিণী—যোগীয়া, তাল—একতালা)

(আমার) সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ ডাকি মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥
পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসে না,
এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না।
যেথা আছে শুধু ভালোবাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥
বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি।
অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না,
আমার বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা ॥ ৩০৮ ॥
(অসম্পূর্ণ)

[রামপ্রসাদের নামে পরিচিত পদ বলে উধৃত হল। কিন্তু পদটি রামপ্রসাদের রচনা কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না]

[সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ]

সাধে কি করুণাময়ী করি মা তোর উপাসনা,
কাল-ভয় না থাকিলে,
কেউ তোমারে সাধিত না।
কোথা গো মা আদ্যাশক্তি,
তব নামে জীব মুক্তি,
কার হেন আছে শক্তি,
বিনা তুমি ত্রিনয়না............॥ ৩০৯ ॥
(অসম্পূর্ণ)

সাবাস্ মা দক্ষিণা কালী, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি,
(তোর) ভেল্কির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি।
এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখ্‌লি বাবারে পাগল সাজায়ে,
নিজে গুণময়ী হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি ? — তুইও বুঝি পাগল হলি। ॥ ৩১০ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা ॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥

আশার চাদর দিয়াছ গায়ে, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচ না।
[পাঠান্তর—জ্ঞান রজক দিয়ে তা কাচ না]
খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালী বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমিয়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, ডাকলে আর চেতন পাবে না ॥৩১১॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

সামাল্ সামাল্ ডুব্‌ল তরী।
আমার মনরে ভোলা গেল বেলা, ভজলে না হরসুন্দরী॥
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি করে ভরা কৈলে ভারি।
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে, সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হল ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, মায়েরে (শ্রীনাথেরে) কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়ে ভারি, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন, প্রসাদ মায়ের আজ্ঞাকারী ॥ ৩১২ ॥

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারি, বাইতে নারী ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারী॥
এনেছিলি বসে খেলি, মন মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব (করে) দিতে হবে (মন) তখন তহবিল হবে হারি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায়রে চুরি ॥ ৩১৩ ॥

[রাগিণী—জংলা, তাল একতালা]

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষ হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে, উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব, যাঁহার চরণে লুটায়ে॥
প্রসাদ বলে রণে চলে, রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥ ৩১৪ ॥

(প্রসাদী স্থর, তাল—একতালা)

সে কি স্থধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি॥
ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলে করে স্থিতি॥
নেংটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে, বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে, সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি॥ ৩১৫॥

(প্রসাদী স্থর, তাল—একতালা)

হয়েছি (মা) জোর ফরিয়াদী।
(এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা)
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী, নেচে উঠে ছটা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইত, পুর হতে দূর করে দি।
বিমাতা মরেন শোকে, ছটায় যদি আমল না দি॥
স্থখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হয়ে যাই ভবনদী (আশানদী)।
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী বাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ও মা, তোমার পুতে সতীন স্থতে, জোর করে কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে, বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী॥
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥৩১৬॥

(প্রসাদী স্থর, তাল—একতালা)

হও রে মন কাশীবাসী।
দেখ্ হৃদ্‌কমলে বারাণসী॥
উত্তরে ইড়া বরুণা, দক্ষিণে পিঙ্গলা অসি।
স্থষুম্না মণিকর্ণি, পূর্ব্বে গঙ্গা অর্দ্ধশশী॥
ব্রহ্মচারী ভাব বিচারি, নিবাস সন্তোষপুরী।
বিশ্বেশ্বর রাজ্যবাসী, বিশ্বেশ্বর রাজমহিষী॥
প্রসাদ ভণে, ও চরণে জবা দেও রাশিরাশি।
মায়ের চরণতলে পড়ে ভোলা,
গয়া গঙ্গা বারাণসী॥ ৩১৭॥

(রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—ঢিমা তেতালা)

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥
তপন দহন শশী ত্রিনয়নী ও রূপসী, কুবলয়দল তনুশ্যামা ॥
বিবসনা এ তরুণী কেশ পড়িছে ধরণী, সমর নিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার, যমজয়ী বাজাইয়া দামা ॥ ৩১৮ ॥

(রাগিণী—কালেংড়া, তাল—ঠুংরি)

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কেরে, হর-হৃদি-হ্রদ পরে দিগ্বাসে ॥
কেরে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী।
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেমডোরে,
রাখি হৃদি সরোবরে হিল্লোলে ভাসে ॥
কেরে, নিন্দিত রামকদলী তরু, হেরি উরু, দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে, অতি রোষবলে,
ভুজঙ্গম দলে, নাভি-পদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে ॥
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখশতদলে অলি,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকসিত সিতাম্বুজ বনরোহায় (মৃণাল বন-জল)
কিবা ওষ্ঠ শোভা অতি, লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা,
যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে ॥
কেরে কুন্তলজাল আবৃত মুখমণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, সিঁথি মূল (মুছ) দোলে'
কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।
কত ডুম্বা ডুম্বী, নাচিছে ভৈরবী,
হি হি হি হি করিছে যোগিনী, কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায় অমনি।
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শবছলে আশুতোষ ॥ ৩১৯ ॥

(রাগিণী— গাড়া ভৈরবী, তাল—আড়া)

হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী ও মা ॥
ইড়া পিঙ্গল নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা ॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা ॥

যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই, ঢোলমারা বাণী ও মা ॥ ৩২০ ॥

হৃদি-শ্মশান-মন্দিরে কে গো বামা এলোকেশী।
অষ্ট শত মুণ্ড গলে, বাম করে ধরা অসি ॥
কেন দেখি এমন ধারা,
লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করা।
সর্ব্বাঙ্গে রুধিরে ঘেরা,
মুখে অট্ট অট্ট হাসি ॥ ৩২১ ॥
(অসম্পূর্ণ)

আগমনী

(রাগিণী—মালশ্রী)
আজ শুভনিশি পোহাল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে ॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে ॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে ॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এরে ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাসরে ॥ ১ ॥

(রাগিণী—মালশ্রী)

ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো ॥
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমার, অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে আর গো ॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে, একি কথা মার গো ॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে, এমন শুভ দিন আর কার গো ॥ ২ ॥

(রাগিণী—পিলুবাহার, তাল—যৎ)

গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কার কথা শুনব না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌ব ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥ ৩ ॥

(প্রসাদী সুর—একতালা)

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি, তোমারি কুমারী তা নয় তা নয় ॥
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি,
কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ
উমা তাদের মস্তকে রয় ॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য-বদনে কথা কয়।
ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ,
যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥
প্রসাদ ভণে মুনি গণে,
যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা,
পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ॥ ৪ ॥

বিজয়া

(রাগিণী—ললিত)

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বারে বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এদেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হল বিদার ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না মানে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সুধার ॥ ৫ ॥

ও কার রমণী সমরে নাচিছে / ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ [১৩০] ও কেরে মনমোহিনী / ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব / ও মন, তোর ভ্রম গেল না [১৩১] ও মা শ্যামা নেবে দাঁড়া, নাচিস্‌নে আর ক্ষেপা মাগী / ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে / ওমা ! হর গো তারা, মনের দুখ / ওরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম [১৩২] ওরে মন কি ব্যাপারে এলি / ওরে মন চড়কি চরক কর, এ ঘোর সংসারে / ওরে মন বলি ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে [১৩৩] ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে / ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে [১৩৪]

ক ও শমন কি মনে করে / কত বাজি দেখবি গো মা / কত রঙ্গ জান রণে শ্যামা / করুণাময়ি ! কে বলে তোরে দয়াময়ী [১৩৫] কই তারা তোর বিবেচনা / কাজ কি মা সামান্য ধনে / কাজ কি রে মন, যেয়ে কাশী [১৩৬] কাজ কি আমার কাশী / কাজ হারালাম কালের বশে / কাজ কি থেকে কালের ফাঁসে / কাজ কি আমার মুক্তিপদে [১৩৭] কামিনী-যামিনী-বরণে রণে এলো কে / কার বা চাকরী কর, (রে মন) / কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে / কাল হারালাম কালের বশে [১৩৮] কালী কালী বল রসনা / কালী কালী বল রসনারে / কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে [১৩৯] কালী গো কেন লেংটা ফের / কালী তারার নাম জপরে মুখে / কালি ব্রহ্মময়ী গো / কালীপদ আকাশেতে [১৪০] কালী নাম জপ কর, সবে কালীর কাছে / কালীর নাম বড় মিঠা / কালীপদ মরকত আলানে মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে [১৪১] কালীর নাম গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে / কালী সব ঘুচালে লেটা / কালী হলি মা রাসবিহারী [১৪২] কাশী যেতে কই মন সরে / কি আর বৈদিক পূজা আছে (মা) / কি ধন দিবি আর তোর কি ধন আছে [১৪৩] কি গুণে মা ব'লব তোরে / কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী, তারা আছ গো অন্তরে [১৪৪] কে জানে শ্যামা তুমি কেমন [১৪৭] কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই / কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস / কে জানে গো কালী কেমন [১৪৮] কেন গঙ্গাবাসী হব / কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হল / কেবা বুকের কেবা পিঠের, বল দেখি মা তাই শুনি / কেমন করে ছাড়ায়ে যাবা [১৪৯] কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম রূপসী / কে রে বামা কার কামিনী / কে রে কাল কামিনী, বাস পরিহারিণী [১৫০] কে রে রজনী-রূপিণী রণ করে / কে হরহৃদি বিহরে [১৫১]

গেল না গেল না দুঃখের কপাল [১৫১]

ঘর সামালা বিষম লেঠা [১৫১]

পতিত পাবনী তারা [১৬৭] পতিত পাবনী পরা / পূর্‌ল নাকো মনের আশা / পিতৃধনের আশা মিছে [১৬৮]

ফাঁকি দিবে কি আমারে, ওমা ভেবেছ কি তুমি ? [১৬৯]

বম বম্ বম্ ভোলা / বাঁচিতে সাধ আর নাই মা তারা [১৬৯] বল মন মলে কোথায় যাবি / বল গো মা উপায় কি করি / বড়াই কর কিসে গো মা / বল ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল (গ্রহণে কালীর নাম) [১৭০] বল দেখি ভাই কি হয় মোলে / বল মা আমি দাঁড়াই কোথা / বল মা তারা দাঁড়াই কোথা [১৭১] বসন পর মা বসন পর তুমি / বামা ওকে এলো বেশে / বাজবে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিসনে ক্ষেপা মাগি / বাসনাতে দাও আগুণ জ্বেলে স্বভাব হবে পরিপাটী [১৭২]

ভবে আর জন্ম হবে না / ভবে এসে খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল / ভাব কি ভেবে পরাণ গেল / ভাবনা কালী ভাবনা কিবা [১৭৩] ভাল নাই মোর কোন কালে / ভাল ব্যাপার মন কর্তে এলে / ভাল মা ভাল এ মন্ত্রণা [১৭৪] ভূতের বেগার খাটবি কত / ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে [১৭৫]

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে / মন করনা সুখের আশা [১৭৫] মন করনা দ্বেষাদ্বেষি / মন কালী কালী বল [১৭৬] মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে / মন কি কর ভবে আসিয়ে / মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া [১৭৭] মন কেনরে পেয়েছ এত ভয়/ মন কেনরে ভাবিস্ এত / মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি [১৭৮] মন গরিবের কি দোষ আছে / মন জাননা কি ঘটবে লেঠা / মন তুই কাঙ্গালী কিসে [১৭৯] মন তুমি দেখরে ভেবে / মন তুমি কি রঙ্গে আছ / মন তোমার এই ভ্রম গেল না / মন তোমার ভ্রম গেল না [১৮০] মন তোর এত ভাবনা কেনে / মন তোরে তাই বলি বলি / মন রে ভালবাস তাঁরে [১৮১] মন কেন হও কর্মদোষী / মন চাইরে মনের মত / মন কি যাবে জগন্নাথে [১৮২] মা আমার অন্তরে ছিলে / মন আমার কি ভাবছো বল / মন তোরে বুঝাব কি বলে [১৮৩] মন ভুলনা কথার ছলে / মন ভেবেছ তীর্থে যাবে / মন যদি মোর ঔষধ খাবা [১৮৪] মনরে আমার এই মিনতি / মনরে আমার ভুলা মামা / মনরে কৃষি কাজ জাননা / মনরে তোর চরণ ধরি [১৮৫] মনরে তোর বুদ্ধি একি / মনরে শ্যামা মাকে ডাক / মন হারালি কাজের গোড়া [১৮৬] মন তোমারে করি মানা / মন তোমার একি বিবেচনা / মন তোমার এ কি বাসনা [১৮৭] মরলেম ভূতের বেগার খেটে / মরি ! ও রমণী কি রণ করে / মরি গো মন এই দুঃখে [১৮৮] মা আমায় ঘুরাবি কত / মা আমায় ঘুরাবে কত / মা আমার খেলান হল [১৮৯] মা আমার অন্তরে আছ / মা আমার বড় ভয় হয়েছে / মা আমার পাপের

আসামী / মা কত নাচ গো রণে [১৯০] মাগো আমার কপাল দোষী / মাগো তারা ও শঙ্করী [১৯১] মা আর কি দেখ্ছ বসে / মা বসন পর / মা তোমারে বারে বারে জানার আর দুঃখ কত [১৯২] মা বলে ডাকিস্ নারে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই / মা মা বলে আর ডাকব না / মা চেয়ে ভাল বিমাতা / মা যদি ধরেতোল তবে তরী এ অকূল [১৯৩] মা তোদের ক্ষেপার হাট বাজার / মা দাঁড়ায়ে শিবের বুকে [১৯৪] মা বিরাজে ঘরে ঘরে / মায়ের এ পরম কৌতুকে / মায়ের এম্নি বিচার বটে [১৯৫] মায়ের নামে লইতে অলস হইও না / মায়ের চরণ তলে স্থান লব / মা হওয়া কি মুখের কথা / মুক্ত কর মা মুক্তকেশী [১৯৬] মোরে তরা বলে কেন না ডাকিলাম / মাগো আমার এই ভাবনা / মাগো বলেছে বুড়া / মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে [১৯৭] মহাকালের মনোমোহিনী সদানন্দময়ী কালী / মোহিনী আশা বাসা, ঘোর তমোনাশা শ্যামা কে [১৯৮]

যদি ডুব্ল না ডুবায়ে বাওরে মন নেয়ে / যারে শমন যারে ফিরি [১৯৮] যাও গো জননী জানি তোরে / যদি যাবি মন ভব নদী পারে / যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি [১৯৯] যে হয় পাষাণে মেয়ে [২০০]

রইলি না মন আমার বশে [২০০] রসনায় কালী কালী বলে / রসনে কালী নাম রটরে [২০১]

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তল জাল [২০১] শমন আসার পথ ঘুচেছে / শমন হে আছি দাঁড়ায়ে / শমন তোমায় ভয় কিরে [২০২] শমন আমি কি তোর খাজনা ধারি / শমন কি ভয় দেখাও আসি / শমন জয়ী হুকুম পেয়েছি [২০৩] শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা (মা) / শিব নয় মায়ের পদতলে / শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে / শ্যামা বামা কে ? [২০৪] শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসি / শ্যামা উড়াচ্ছে ঘুড়ি [২০৫] শ্যামা মারে ডাক [২০৬]

সদাশিব সবে আরোহিণী কামিনী / সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল মাত্র কথা রবে / সমর করে ও কে রমণী [২০৬] সকলি জানিস্ তারা আগোগোড়া আমার যত / সমরে কেরে কাল কামিনী ? [২০৭] (আমার) সাধনা মিটিল, আশা না পূরিল / সাধে কি করুণাময়ী করি মা তোর উপাসনা / সাবাস মা দক্ষিণা কালী, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি / সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গেনা [২০৮] সামাল্ সামাল্ ডুব্ল তরী / সামাল ভবে ডুবে তরী / সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে [২০৯] সেকি শুধু শিবের সতী [২১০]

হয়েছি (মা) জোর ফরিয়াদী / হও রে মন কাশীবাসী [২১০] হুঙ্কারে সংগ্রামে ওকে বিরাজে বামা / হের কার রমণী নাচে ভয়ঙ্করা বেশে / হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা [২১১] হৃদি-শ্মশান-মন্দিরে কে গো বামা এলোকেশী [২১২]

আগমনী আজ শুভনিশি পোহাল তোমার [২১২] ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল / গিরি এবার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না / আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয় [২১৩] **বিজয়া** ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার [২১৪]